দ্বিতীয় খণ্ড

ডল বুক হাউস ॥ ৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪
প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১. মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯
মুদ্রক
শ্রীরনজিৎ কুমার মণ্ডল
লক্ষ্মীজনার্দ্দন প্রেস
৬ শিবু বিশ্বাস লেন
কলকাতা-৬।

আমার মহান উর্ধ্বতন সপ্তপুরুষকে

রাজা

দোলগোবিন্দ ঘোষাল

|

পণ্ডিত

রঘুদেব ঘোষাল

|

রাজা

রামশঙ্কর ঘোষাল

|

কুমার

রাধাকান্ত ঘোষাল

|

দেওয়ান

নবকৃষ্ণ ঘোষাল

প্রাণকৃষ্ণ ঘোষাল

ত্রিলোকী সুন্দরী দেবী

|

রায় বাহাদুর

কমলাপতি ঘোষাল

[১৮২০ — ১৯০৯]

জগত্তারিনী দেবী

|

রায় সাহেব

কালিসদয় ঘোষাল

আশুতোষ ঘোষাল

প্রথম অধ্যায়

পুস্তকের প্রথম খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশ পর্যন্ত পুলিশী সংগঠনের ইতিবৃত্ত। এই খণ্ডে বর্ণিত হবে বিংশ শতাব্দীর সুরু থেকে পুলিশী ব্যবস্থার কাহিনী। কিন্তু—এ-দুয়ের মধ্যবর্তীকালে শহর-সমূহে পুলিশী-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকলেও গ্রামাঞ্চলগুলি কিছুকাল ব্রিটিশ পুলিশের প্রভাব-মুক্ত ছিল।

ক্লাইভ বাংলার জমিদার শাসকদের সেনাবাহিনীর অবলুপ্তি ঘটান। লর্ড হেস্টিংস সাহেব তাঁদের বিচার-ব্যবস্থা বিলুপ্ত করেন। কর্ণওয়ালিশ অতঃপর রদ করলেন বাংলার জাতীয় পুলিশ। কিন্তু তার জায়গায় জমিনদারী পুলিশের মতো গ্রামভিত্তিক কোন পুলিশী ব্যবস্থা থাকে নি। ফলে বহুকাল গ্রামাঞ্চলে ব্রিটিশ পুলিশের কোন প্রভাব ছিল না। সুসংগঠিত জমিনদারী পুলিশের মতো গ্রাম রক্ষার কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। অন্য দিকে সূর্যাস্ত-আইনের দৌলতে প্রাচীন জমিদার বংশগুলি মৃতপ্রায় হয়েছে। তদস্থলে শহরাগত ব্যবসায়ী জমিনদাররা গ্রাম সম্পর্কে নিস্পৃহ। এতে মধ্যবর্তীকালে গ্রামাঞ্চলে বর্ধিষ্ণু পরিবারগুলির নেতৃত্বে একপ্রকার রক্ষণব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সেই সঙ্গে শিক্ষা, পূর্তকার্য প্রভৃতি জনহিতকর কাজ গ্রামের লোক নিজেরা করেছে।

এই পরিচ্ছেদের বর্ণনীয় বিষয় মধ্যবর্তীকালে গ্রামের পুলিশ-বিহীন অবস্থার নিখুঁত ঘটনাবলী। রাষ্ট্রিয় ব্যবস্থার অদল-বদলে গ্রামীণ সমাজে কিছু বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। এর অন্যতম কারণ শহরমুখী হয়ে শিক্ষিত ধনীদের দলে দলে গ্রাম পরিত্যাগ।

জনগণের ক্ষমতার অতিরিক্ত ক্ষমতা পুলিশের নেই। একমাত্র অসাধু পুলিশকর্মীরাই অতিরিক্ত ক্ষমতা দাবী করে। জনগণের করণীয় কার্যই পুলিশ সম্পন্ন করে থাকে। জনসাধারণের কর্মব্যস্ততা ও সময়াভাবের জন্য একটি বেতনভুক লোককে উপস্থাপিত করে পুলিশী দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাদিও তাদের দেওয়া হয়ে থাকে। [অবশ্য মানব-মনে 'বিবেক'ই প্রথম পুলিশের কাজ করে।] গৃহতল্লাসী প্রভৃতি কয়েকটি দায়িত্ব ছাড়া পুলিশের সকল ক্ষমতাই জনগণের আছে। কোন অপরাধ সম্মুখে ঘটলে রক্ষীদের মতো জনগণও অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম। আদালতের করণীয় কার্য স্বহস্তে গ্রহণ করলে [illegible] মামলায় পুলিশকেও দণ্ড পেতে হয়। ধৃত অপরাধীকে তৎক্ষণাৎ থানায়

পাঠাতে হয়। কিন্তু, পুলিশ প্রয়োজনবোধে অপরাধীকে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত নিজেদের হেফাজতে রাখতে পারে।

পুলিশ স্বীয় দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে জনগণ প্রাইভেট পুলিশ সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়। কারণ, পৃথিবীতে ভ্যাকুয়াম বা শূন্যস্থান বলে কিছু নেই। পুলিশ নিষ্ক্রিয় হ'লে এরূপ-ঘটনা বারে বারে ঘটেছে। যথার্থ শিক্ষার অভাবে এ-সব ক্ষেত্রে জনগণের বহু ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে এবং কখনো কখনো এতে সমাজ-বিরোধীদের অনুপ্রবেশ হয়েছে।

বাঙালীর জাতীয় পুলিশের বিলুপ্তি ঘটালেও ব্রিটিশ রাজশক্তি গ্রামাঞ্চলে অনুরূপ দক্ষ পুলিশ তৈরী করতে পারে নি। জমিনদারী থানাগুলির এলাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিল। চৌকিদার, দফাদার, ঘাটীয়াল এবং থানার নায়ক নায়েব ও পাইকদের দ্বারা গ্রামগুলি পরিবেষ্টিত থাকতো। ফলে ওদের অভাবে গ্রামের মানুষ স্বীয় সমাজ-ব্যবস্থা ও মানসিকতার আমূল পরিবর্তন ঘটায়। তাতে গ্রামবাসীরা নিরাপত্তার ব্যাপারে রাষ্ট্রিয় পুলিশের সহায়তার কিছুমাত্র প্রয়োজন অনুভব করে নি। উহার প্রমাণ স্বরূপ আমার শৈশব-স্মৃতি থেকে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

"মাতুলালয় থেকে পিতৃগৃহে ফিরছি। তিরিশ মাইল পথ গরুর গাড়িতে করে যেতে হবে। গাড়িতে বসে আছি মার কোল ঘেঁষে। দিদিমা গরুর গাড়ির পিছন পিছন হাঁটছেন। গ্রামের সীমান্তে এসে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। চলমান গাড়ির ফোকরে দিদিমার মুখাবয়ব ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হতে থাকে। তারপর এক সময় পথের বাঁকে অদৃশ্য হলেন তিনি। আমি 'দিদিমা-গো' বলে মার কোলে মুখ লুকোলাম। উঁচু-নিচু কর্দমাক্ত মেটে রাস্তায় তখন গরুর গাড়ি ওঠানামা করছে। গাড়োয়ান এজাহার আলি সন্ধ্যার আগে আমাদের বাড়ি পৌছবে। পথে চোর-ডাকাত আর ঠেঙাড়ের ভয়। গাড়ির সামনে দেনার্লী ও মমতাজ মিঞা। আর দুপাশে লম্বা লাল লাঠি হাতে মহীন্দ্র বাগ্দী ও ফকির দুলে। ভাবতে বেশ অবাক লাগে বাড়ির লোকেদের মুস্লিম প্রজাদের প্রতি কি অগাধ বিশ্বাস ছিল। সালঙ্কারা বধূদের রক্ষার ভার সেই কালে ওদের ওপরই নিশ্চিন্তে দেওয়া যেত।

[বিঃ দ্রঃ—সামাজিক প্রথানুসারে তৎকালে বধূরা প্রতিবৎসর কিছু কালের জন্য পিত্রালয়ে বাস করতেন। মাঝে মাঝে স্বামী-স্ত্রীর পৃথকভাবে থাকার বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনীয়তা সমাজ-কর্তৃক স্বীকৃত ছিল। তাই আমাকেও কিছুকাল মার সঙ্গে মাতুলালয়ে থাকতে হতো। ঐ-সময় পিতৃগৃহে বাঙালী বধূরা তাঁদের পূর্ণ স্বাধীনতা ফিরে পেতেন।]

বেলা দ্বিপ্রহরে দুইটী বলবান বলদ গাড়ি নিয়ে মাঠের পথে চলেছে। হঠাৎ একদল

ঝাঁকড়াচুলো লোক পথ আগ্‌লেবলে উঠলো—'কেডা যায় রে!' মা সভয়ে অস্ফুট কণ্ঠে তখন আমাকে বললেন, 'খোকা' ওরা বোধহয় ডাকাত।' মার গায়ে মূল্যবান জহরত ও স্বর্ণালঙ্কার। গাড়োয়ান এজাহার আলি গাড়ির বিচুলির গদির তলা থেকে একটা ধারালো কাতান বের করল। দেনালী মিঞা তখন ওদের সকলের নেতা। সে গাড়ির ছই'এর ভেতর মুখ বাড়িয়ে সে মাকে বললে, : 'মা, এখানে আমরা চার ভাই। দেনালী, মমতাজ, মহীন্দ্র ও ফাকির। তোমার এই চার বেটা জান কবুল করবে। তবে আগে জিজ্ঞেস করি, ওরা কোন্ দলের। এজাহারআলি রইল আমাদের পাহারায়।' অন্য পক্ষ ওদিকে হুঙ্কার দিয়ে উঠল। দুই পক্ষ তখন পরস্পরের মুখোমুখি। জাত জমিদারের রক্ত আমার ধমনীতে। আমি যুদ্ধ দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হলাম। ওদের মধ্যে কি কথা হ'ল শুনতে পেলাম না। একটু পরে সামনে ঝাঁক্‌ড়চুলো কপালে সিঁদুর লোকটা এগিয়ে এসে নত হয়ে মাকে বললো, 'মা' ভয় নেই, আমরা তোমাদেরই প্রজা।' সে মার পায়ে একটা রৌপ্যমুদ্রা রেখে প্রণাম করল। ডাকাতগুলোর ওপর খুব রাগ হচ্ছিল আমার। মাঝখান থেকে আমার যুদ্ধটা দেখা হ'ল না।

[আশ্চর্য,—সেই মেটে পথ এখন বাস-চলা পিচের রাস্তা। দুধারে ইলেকট্রিক পোস্ট। মাঝে মাঝে টিউব ওয়েল। কৃষকদের পর্ণকুটিরের বদলে সর্বত্র টিনের ছাউনি।] রাত আটটায় আমরা পিতৃগৃহে পৌছলাম। কালী পুজোর অমা রাত্রি। সব মহল আলো ঝল্‌মল্। ঘরে ঘরে ঝাড়লণ্ঠন। দেয়ালে দেয়ালে দেয়াল-গিরি বাতি। সুউচ্চ ঠাকুর দালানে সুবিশাল মৃন্ময়ী নীলবর্ণের কালীমূর্তি। ওদিকে আমি মাতৃক্রোড়চ্যুত হয়ে ক্রোড় থেকে ক্রোড়ান্তরে ঝাঁপিয়ে পড়ছি। ততক্ষণে সেই নতুন পরিবেশে আমি দিদিমার কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছি।

[বিঃ দ্রঃ-–জমিনদারী পুলিশের আমলে ঐ সব সংযোগ রক্ষাকারী রাজপথগুলি ঘাটিয়ালি পুলিশের রক্ষণাধীনে ছিল। ১ম খণ্ড দ্রঃ। তারা ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে থেকে ঐ সমস্ত পথে টহল দিত। লর্ড কর্ণওয়ালিস জমিনদারী পুলিশ রাষ্ট্রায়ত্ত করে ঘাটিয়ালি পুলিশ-ও-থানাদারী পুলিশ বাতিল করেন। কিন্তু ব্রিটিশ থানাদারী বা অন্য পুলিশ দিয়ে ওগুলির কোন রক্ষণ ব্যবস্থা করা হয় নি।]

সমস্ত ঘটনা অবগত হয়ে অশীতিপর পিতামহী দেনালী মিঞাকে ডাকলেন ও কাছে বসালেন। তাদের মুড়ি-গুড় ও মিঠাই খেতে দিয়ে হুকুম দিলেন, ওদের প্রত্যেককে যেন গোলা থেকে চার মন করে ধান দেওয়া হয়। তারপর উনি ওদের একজনকে ডেকে বললেন, 'বটে, ওটা গোপীনাথের দল! গোপীনাথকে কাল ডেকে আনবি। ওকে আমি নিজে ধম্‌কে দেব।'

আশ্চর্যের বিষয়, এতো বড়ো একটা ঘটনা জিলা হাকিম বা পুলিশকে কেউ জানাবার প্রয়োজনে মনে করলো না। অন্তঃপুরচারিণী পিতামহী বাড়িতে বসেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন।

[তৎকালীন গভর্ণমেণ্ট পুলিশের মতো প্রাইভেট পুলিশদেরও পুরস্কার ও তিরস্কারের ব্যবস্থা ছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার, পিতামহীর মতো অতি বৃদ্ধাও এই কার্যে সুদক্ষা ছিলেন। গভর্ণমেণ্ট ও প্রাইভেট পুলিশের কার্যধারা প্রায় একই প্রকারের ছিল। তার ওপর প্রাইভেট পুলিশের এলাকা সম্পর্কিত কোন বাছবিচার না থাকায় পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা ছিল। জনগণের যে-কোনও অংশ প্রয়োজনে প্রাইভেট পুলিশের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

আন্তঃজিলা ও আন্তঃপ্রদেশ সড়কগুলি পূর্বে বিভিন্ন জমিনদারী পুলিশ পরস্পরের সহযোগিতায় রক্ষা করতো। জমিনদারী পুলিশ বাতিল হওয়ার পর ঐগুলি রক্ষার ভার কারও ওপর ন্যস্ত হয় নি। ফলে তীর্থযাত্রী ও বণিকদের পক্ষে ঐ পথ বিপদসংকুল হয়ে ওঠে। ঐ সময় তীর্থযাত্রীরা যাত্রার পূর্বে উইল করে পথে বেরুতেন। শুনেছি, পিতামহী একবার তীর্থে বেরুলে বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে যায়। উনি তাঁর যাবতীয় অলংকার বধূদের মধ্যে ভাগ করে দেন। ভবিষ্যৎ শরিকী বিবাদ এড়াতে পুত্রদের মধ্যে বিষয়-সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়া হোল। সেকালে তীর্থে গেলে লোকে প্রায়ই জীবিতাবস্থায় ফিরে আসত না। কিন্তু পিতামহী সুস্থ শরীরেই গ্রামে ফিরে এসেছিলেন। তাঁর দুজনে বলিষ্ঠ লাঠিয়াল প্রজা তাঁর নিরাপত্তার জন্য তাঁর সাথে নিযুক্ত ছিল। যারা রক্ষা করে তাদেরই রক্ষী তথা পুলিশ বলা হতো।

কিছুক্ষণ একটা কক্ষে একটা পালঙ্কে ঘুমিয়েছিলাম আমি। হঠাৎ বাজনার তীব্র শব্দে ঘুম ভাঙল। অন্যদের সঙ্গে ছুটে গেলাম ঠাকুর দালানে। একটু পরেই বলিদান হবে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে। বিশাল যূপকাষ্ঠের চতুষ্পার্শ্বে মশালের উজ্জ্বল আলো। চতুর্দিকে অপেক্ষমাণ ভগবত বিশ্বাস জনতা। একটা মহিষ-শিশুকে টানতে টানতে সেখানে আনা হোল। কিছুতে বাগ মানানো যাচ্ছে না পশুটাকে। দুবার দড়ি ছিঁড়ে পালাল—দুবারই তাকে ধরে আনা হোল। শেষ পর্যন্ত বাঁশ দিয়ে ওর ঘাড় চেপে গলাটা রাখা হোল যূপকাষ্ঠে। আমি মশালের আলোয় স্পষ্টই দেখতে পেলাম নির্বাক ঐ মহিষ-শিশুর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। আমার খুব রাগ হচ্ছিল। মা-কালী খাঁড়া নিয়ে ওদেরকে তাড়া করছেন না কেন! ঠাকুর দালানের উঁচু রোয়াকে দাঁড়িয়ে সবাই তারস্বরে মা-মা ডাকছে। সেই প্রার্থনার উদ্দেশ্য যাতে বলিদানে কোন বাধা না পড়ে। হঠাৎ জল্লাদের খাঁড়া জল্ জল্ করে ওপরে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও মেঝেতে পড়ে জ্ঞান হারালাম।

তখন আর মাতৃপূজার দিকে কারও মন রইল না। আমি বাড়ির জ্যেষ্ঠ পৌত্র। সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল আমাকে নিয়ে। ঠাকুমার হুকুমে পর বৎসর থেকে মহিষ-বলি বন্ধ। এরপর থেকে ঠাকুমা অন্দরমহলে ঠাকুর ঘরে নিরামিষাশী দেবতা নারায়ণের সেবাতে মন দিলেন।

[কিন্তু—ঐ কালী পূজার বলি বন্ধ কারও পছন্দ নয়। পারিবারিক পূজায় গ্রামের আবাল-বৃদ্ধবনিতা ও বাইরের গ্রামের বহু ব্যক্তিও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু গণ-বিক্ষোভ দমনে ব্রিটিশ পুলিশ ডাকা হয় নি। ঠাকুমা নিজেই ওদের ধমকে ও বুঝিয়ে সংযত করলেন।]

শহরে হলে এইরূপ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় পুলিশের পাহারা থাকতো। কিন্তু গ্রামে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পুলিশ হওয়াতে তার কোন প্রয়োজন ছিল না। তখনো গ্রামে সমঝোতাবোধ, আনুগত্য ও লোকবলের অভাব মনে হয় নি। আমাদের বিপুলায়তন গৃহের চারপাশে দৌহিত্র সন্তান ও পুরোহিত বংশের বসবাস। গ্রামের সীমানা বরাবর অসংখ্য কৃষক ও লড়াকু প্রজাদের বসতি। সমগ্র গ্রামটাই যেন একটা দুর্ভেদ্য দুর্গ। এক ডাকে যৌথ পরিবারগুলি থেকে এবং প্রজাদের মধ্য থেকে বহুলোক বয়োবৃদ্ধদের আদেশ পালনে তৎপর হয়। সেখানে রাষ্ট্রীয় পুলিশের উপস্থিতি নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন।

[লোকবলের জন্য তৎকালে প্রথা ছিল, জমিজমা সহ বাস গৃহ প্রদান করে কন্যা জামাতা নিকটে রাখা। গ্রামে আমাদের বহু প্রতিবেশী বংশ ঐভাবে প্রতিষ্ঠিত। ভগিনীপতি জনসঙ্ঘ নেতা হরিপদ ভারতী ঐ প্রথা পুনঃপ্রবর্তনের জন্য বলেন। কিন্তু আর্থিক সংগতির অভাবের সঙ্গে সেদিনকার মানসিকতা ও প্রয়োজনীয়তা আজ আর নেই।]

ঘোষাল বাড়িতে নৈকষ্য-কুলীন ব্রাহ্মণকন্যা চাই। পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যা পিতামহীকে এক উভয় পক্ষীয় আত্মীয়ের মাধ্যমে ভুলিয়ে এনে পিতামহের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হোল। কন্যা পক্ষ দক্ষ লাঠিয়ালদের ভয়ে পিছিয়ে গেলেন। ইহা ছিল শাক্তধর্মীয় পাত্রের সহিত বৈষ্ণব ধর্মীয় বধূর আন্তর্ধর্মীয় বিবাহ। কিন্তু এজন্য পাদ্রিদের মাধ্যমে ইংরাজ হাকিমের নিকট ওঁরা দরবার করে নি। শেষ পর্যন্ত উভয়পক্ষ ব্যাপারটা মিটমাট করে নিলেন। কিন্তু ঠাকুমা এজন্য কখনো অপমান বোধ করেন নি। সেই ঠাকুমা এখন এ-বাড়ির মতো সমগ্র গ্রামের মহা কর্ত্রী। আমাকে সঙ্গে নিয়ে উনি প্রজাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খবরাখবর নিতেন। একদিন শুনলাম, ঠাকুমা এক কৃষক বধূকে বলছেন,—"হ্যাঁ রে বৌ, তোর সোয়ামী তোকে মারে? তা, তুই আমাকে তো বলিস্ নি।' প্রত্যুত্তরে কৃষক বধূ সলজ্জভাবে বলে-

ছিল,—'তা, মারুক্ মা। না মারলে ও আমাকে ভালবাসে কিনা তা আমি বুঝবো কেমন করে!' পারস্পরিক বিবাদে পুলিশ কিম্বা আদালতের শরণাপন্ন হওয়া তখনো অকল্পনীয়।

সমস্ত কাজকর্ম সমাধা করে ঠাকুমা সন্ধ্যেবেলা অন্দরমহলের উঁচু রোয়াকেআমাকে কোলে নিয়ে বসতেন। উঁচু দালানের লম্বা মাটির নলের ওপর দুটো ধব্ধবে সাদা পাখি। ও দুটো ঠাকুমার অতি আদরের লক্ষ্মী পেঁচা। এ-ছাড়া ঠাকুমার আরো দুটি প্রিয় প্রাণী ছিল। সে-দুটি বাস্তু সাপ। ওরা পুরুষানুক্রমে এখানে আছে। এ-বাড়ির কোন ক্ষতি করে না ওরা। জ্যোৎস্না রাতে কখনো কখনো ওদের দেখা যায়। কদাচিৎ বাড়ির উঠোনে ওদের শঙ্খ লাগে। উর্দ্ধফণী হয়ে ওরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। সিঁদুরমাখানো চেলি ওদের দিকে ছোঁড়া হয়। ওগুলোর মধ্যে কিছুক্ষণ ক্রিড়া করে ওরা বলে গেলে ঐ চেলি পবিত্র দ্রব্যরূপে গৃহীত হতো।

পুরুষানুক্রমে মানুষের সঙ্গে একত্রে বাস করলে জন্তুরা হিউম্যান ইনস্টিংক্ট প্রাপ্ত হয়। তারা বোঝে যে এ-বাড়ির কেউ তাদের কিছু ক্ষতি করবে না। সর্পজীব আসলে ভীতু প্রাণী। ভয় পায় বলেই আত্মরক্ষার্থে ওরা ছোবল দেয়। এখানে তাদের কাউকে ভয় নেই। বৌদ্ধ মঠে পাখি মারা নিষেধ। তাই পাখিরা সেখানে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। এজন্যে মৃত্যুভয়ে ভীত বানররা পুরীর মন্দিরে আশ্রয় নেয়। এ'কারণে বন্য শূকররা পাকিস্থানে ও নীল গাই ভারতে বাসা নেয়।

ঠাকুমার একটা নিজস্ব পুরানো কাঠের সিন্দুক ছিল। তার ভেতরে সংগৃহীত ছিল কয়েক শতাব্দীর ঐতিহাসিক সামগ্রী। কবে পরিবারের কোন্ এক বধূ মৃত পতির চিতায় আত্মবিসর্জন করে সতী হন। তাঁর রক্তাভ পদচিহ্ন একটা পুরাতন তুলট কাগজের উপর আমি দেখেছি। শুভ কাজে যাত্রাকালে ওটা কপালে ঠেকানো হ'ত। ঐ সিন্দুকে ঠাকুমার প্রচুর মোহর ছিল। ঠাকুমা ওগুলো হাত-ছাড়া করতেন না কিছুতে। এ-বিষয়ে অনুযোগ করলে তিনি বলতেন,—'পরে যদি তোরা আমাকে না দেখিস?' ঠাকুমার ঐ কাঠের সিন্দুক থেকে প্রহরে প্রহরে কট্ কট্ করে শব্দ উঠতো। বাড়িতে অনেক ঘড়ি থাকা সত্ত্বেও ঠাকুমার ওর ওপরেই বিশ্বাস ছিল বেশী। পরে বুঝেছিলাম, তাপমাত্রার উত্থান-পতনে ঐ কাঠের সঙ্কোচন প্রসারণ হওয়াতে ঐরূপ শব্দ হোত।

[ঠাকুরমাতা তাঁর শ্বশ্রূমাতা ত্রিলোকীসুন্দরীর মুখে শোনা বাড়িতে ডাকাত পড়ার একটা পুরনো কাহিনীর বর্ণনা করেছিলেন। ঐ কাহিনী থেকে পুরানো দিনের জমিদারদের আত্মরক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছুটা অবহিত হওয়া যায়। একবার

সংবাদ পাওয়া গেল, রাত দুটোয় ডাকাতরা ডাকাতি করতে আসবে। সেই কালে সূর্য ঘড়ি ছাড়া অন্য ঘড়ি সৃষ্ট হয় নি। ঠিক রাত দুটোর সময় ঐ সিন্দুকটা থেকে কট্‌কট্‌ আওয়াজ উঠেছিল। ডাকাতরা জেনেছিল, এ-বাড়িতে অঢেল মোহর আছে। ইংরাজ রাজত্ব এদেশেতে বহুকাল স্থাপিত হয়েছে। আমাদের পুলিশ ও বিচার-ক্ষমতা ওরা কেড়ে নিলেও কিছু বরখাস্ত পাইক-বরকন্দাজ তখনো আমাদের অনুগত ছিল। এজন্য এখনো এ-বাড়ির দাপট কিছুমাত্র কমে নি। আমরা তখন চব্বিশ পরগণার ক্ষুদ্র জমিদার। ক্ষুদ্রদের দায়িত্ব কম হওয়াকে ক্ষমতা বেশী হয়।

একদিন একটা রক্ত বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা পরিহিত ঝাঁকড়াচুলো লোক কর্তা-মশাই এর কাছে নত হয়ে ভূর্জপত্রে লেখা একটি পত্র দিল। ওদের চাহিদা সামান্য। বাৎসরিক সিধা—'বিশমন ধান, দুশো একান্নটি কড়ি এবং দুখানি আকবরী মোহর। প্রতি বছর কালী পুজোর রাতে তারা এসে তা নিয়ে যাবে। দূত অবধ্য, হওয়াতে লোকটা ভৎর্সিত হয়ে ডেরায় ফিরল।

কালী পূজার অমানিশা। রাত্রি দ্বিপ্রহর। নিশিপূজা সবে শেষ হয়েছে। হঠাৎ দেখা গেল অসংখ্য মশালের আলো। হারে-রে-রে শব্দ! তখন নিজস্ব পাইক-বরকন্দাজের দল আমাদের নেই। বহু পূর্বেই তারা বিদায় নিয়েছে। দ্বারিদের প্রধান অনুগত ডাকাত রঘু তখন দূর দেশে স্বকার্যে গেছে। অবশ্য বাড়ির তরুণরা তরবারি হস্তে যুদ্ধের জন্যে প্রাঙ্গণে প্রস্তুত। ওদিকে ঘোড় সওয়ার সদরে খবর দিতে গিয়েছে। বাড়ির চাপা সিঁড়িগুলির লোহার কপাট বন্ধ করে দেওয়া হোল। কুলনারীরা আত্মরক্ষার জন্য চোরা কুঠরিতে ঢুকলেন। বাধা দিল দেউড়ীর দ্বারবান'রা। ডাকাতরা ঢেঁকিকলের সাহায্যে দেউড়ীর দরজা ভাঙলো। কয়েকটি হত্যাকাণ্ডের পর ওরা বাঁকা সিঁড়ির পথে উপরে উঠতে লাগল। বস্তা বস্তা সরষে ছিল সিঁড়ীর চাতালের ওপর। বাড়ির গিন্নিরা সেগুলো সিঁড়ির ওপর ছড়িয়ে দিলেন। ডাকাতরা অন্ধকারে পা পিছলে নিচে পড়তে লাগল।

বাড়ির চিলের ছাদের ওপর একটা মিনার ছিল। অন্তঃপুরিকারা ওখান থেকে দূরের গঙ্গা দেখত। কর্তামশাই ওখানে দাঁড়িয়ে শিঙে ফুঁকে দূরের প্রজাদের জানিয়ে দিলেন ডাকাত পড়ার খবর। হৈ-হৈ করে ছুটে এল বাগ্দী পাড়ার দুশো ঘর প্রজা স্ত্রী-পুরুষে বল্লম, লাঠি, আঁশবঁটি ও রাম দা হাতে। গৌরে বেহে ডাকাতের সেই প্রথম পরাজয়। স্ত্রী-পুরুষের সমবেত সাহসিকতা পূর্ণ প্রচেষ্টায় উহা সম্ভব হয়েছিল।

কিছু ডাকাতকে ওঁরা পিটিয়ে মাটির তলায় গুম করলেন। বাকি গুলোকে বস্তা

স্বীকার করার পর পূর্বপুরুষদের খনন করা দীঘির বাকি কাজ সমাধার জন্য বেগার দেওয়া হোল। অপরাধীদের মেয়াদ না দিয়ে পুষ্করিণী ও বাঁধ তৈরীর কাজে নিয়োগ করা পুরানো প্রথা। অবাধ্যদের গুম্ করার জন্য ভূগর্ভে বহু কক্ষ আমি নিজেদের বাড়িতেও দেখেছি। তৎকালে ইংরাজ-নিযুক্ত উৎপীড়ক দারোগাদেরও গ্রামে গুম্ করা হয়েছে।

চার শ' বছর পূর্বে তৈরী মাদরাল দীঘির মতো বড়ো দীঘি যুক্ত বাংলার প্রেসিডেন্সী ডিভিসানে আর একটিও নেই। এর চারদিকের পাড়গুলো দেড় তলার মতো উঁচু। প্রশস্ত বকচরের মধ্যবর্তী একশ বিঘার উপর জলাশয়। ওপারের মানুষকে এপার থেকে ছোট দেখায়।

আজ হতে চার শ' বছর আগে কুলগুরু জমিদার শিষ্যকে জলকষ্ট নিবারণের জন্যে একটা সায়র তৈরীর নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রমাদ গুণে জমিদার রাজা তাঁকে বললেন, ঠাকুরমশাই, আপনি এক নিশ্বাসে যতদূর দৌড়বেন ঠিক তত দূর পর্যন্তই খোঁড়া হবে। ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রাণপণে ভূমির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত দৌড়ে জ্ঞানহারা হয়ে আর চোখ খুললেন না।

[এই বিশাল দীঘির পাড় ক'টি মাত্র আমার অধিকারে আছে। প্রশস্ত বকচর পূর্বে জনগণের গোচারণ-ভূমি ছিল। গ্রামের লোক এ-থেকে যদৃচ্ছাক্রমে মৎস্য আহরণ করেছে। বালকেরা ওখানে সাঁতার কাটে ও নৌকো বাইতে শেখে।

পাড়ের মধ্যস্থলে একশ দশ ফুট উচ্চ আমাদের প্রস্তর-নির্মিত মন্দির আছে। এই সর্বজনীন মন্দিরের বিগ্রহ সর্বশ্রেণীর ব্যক্তিকে স্পর্শ করতে দেওয়া হয়। পৃথক কোন পুরোহিতের ব্যবস্থা সেখানে নেই। বাঙলাদেশে বৃহদায়তন বহু মন্দির আছে। কিন্তু কারুকার্যখচিত এতো উঁচু মন্দির কোথাও নেই। মন্দির-সংলগ্ন আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের আমি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ভট্টপল্লীর একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়েরও আমি প্রতিষ্ঠাতা। উপরন্তু এখনকার একমাত্র গ্রামীণ পার্কটিও আমার তৈরী। কৃষি বিদ্যালয়ের জন্যেও সেখানে প্রচুর জমি আমি আলাদা করেছি। ওখানকার দুটি প্রাইমারী বিদ্যালয়ও আমার প্রতিষ্ঠিত। এই নূতন অট্টালিকা ও পৈত্রিক বাড়ি-জমিজমা এই কাজে দান করেছি।

[বিঃ দ্রঃ—এখানকার আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ে দুরন্ত বালকদের ভর্তি করা হয়। এদের জন্য আমার 'ডাইভারসন্যাল' চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। এদের বিপথ-গামী হওয়ার সকল সম্ভাবনাই এখানে বন্ধ করা হয়। অধিকন্তু অকৃতকার্য হওয়া ছাত্রদের এখানে প্রথমে ভর্তি করা হয়। কিন্তু আজও শেষ পরীক্ষাতে একজন ছাত্রও অকৃতকার্য হয় নি। এরা পালা করে নিজেদের পুলিশী কার্য নিজেরাই করে।

এখানে আত্মজীবনী লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। জীবনী মৃত্যুর অন্ততঃ পঞ্চাশ বছর পরে লেখা সম্ভব। জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যা প্রকাশ করা যায় না। তাই নিজেদের বিষয়ে কিছু না লেখাই আমি সমীচিন মনে করেছি।

আমাদের পারিবারিক জীবনে এতোদিনে অধঃপতন সুরু হয়েছে। অবশিষ্ট জমিদারীগুলি একে একে বিক্রয় হয়ে গিয়েছে। কয়েকজন শরিকী তরুণের স্থির বিশ্বাস, তাদের অধিকারভুক্ত অংশে গুপ্তধন পোতা আছে। রাত্রে মাটি খুঁড়ে তারা দুই জালা গুপ্তধন পেল। কিন্তু সেগুলো মূল্যহীন অচল কড়িতে ভর্তি। এখন গোপনে তাড়াতাড়ি ঐ গর্ত বুজিয়ে ফেলতে হবে। তাদের অধিকারভুক্ত এলাকায় রক্ষিত ছিল বহু সংস্কৃত ও পার্শী গ্রন্থ। ওর মধ্যে ছিল পূর্বপুরুষ রাধকান্ত ঘোষাল প্রণীত চার'শ বছরের পুরানো কয়েকটি পাঁচালি কাব্য। সেগুলি তারা তাড়াতাড়ি ঐ গর্তে ফেলে মাটি চাপা দিল। মাটি চাপা পড়লেও ঐ ঘটনাটি চাপা থাকে নি।

নৈহাটী থেকে ছুটে এলেন সেই দিনের তরুণ কুটুম্ব হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। উনি কয়েকটা নক্সাকাটা কাঠের মলাট মাত্র উদ্ধার করতে সক্ষম হন। স্থানত্যাগ কালে উনি বাটীর তরুণদের বলে গেলেন : বাবাজীবনরা! তোমাদের উর্ধ্বতন সপ্ত পুরুষ পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু অধস্তন সপ্ত পুরুষের শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ রইল। এলেন প্রমথনাথ তর্কভূষণ পঞ্চানন তর্করত্ন ও কুলগুরু কমলকৃষ্ণস্মৃতিতীর্থ। ওঁরা সব শুনলেন, দেখলেন, বুঝলেন ও আশীর্বাদ করে চলে গেলেন।

সেই মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণদের বাক্য আংশিক সত্য হয়েছিল। আমরা দুই ভাই ও এক বোন ডক্টরেট। অন্য ভগিনীরা ও এক ভ্রাতা এম,এ, বি-এল। কিন্তু যারা গ্রামে রইল, তারা স্কুলের গণ্ডি পেরুল না। এরা কেউকেউ 'ন'-এর তলায় ফুটকি দিলে কি হয় তাও বলতে পারে না।

আমাদের ঠাকুমার আমাদের জন্য একটি অমূল্য উপদেশ ছিল তাঁর মতে যাচা কন্যা ও সাজা পান ফেরত দিতে নেই। তাঁর এইদুর্বলতার সুযোগে কেউ কেউ তাদের অনূঢ়া কন্যাকে বাড়িতে রেখে চলে গেছে। এই বাড়িতে কন্যা ঢুকলে বেরুতে নেই। অগত্যা বাড়ির কোন উপযুক্ত পুত্রের সঙ্গে তার বিবাহ হত। ফলে পূর্বের মতো দীর্ঘদেহী হলেও আমাদের কারও কারও গাত্রবর্ণ পূর্বের মতো গৌরবর্ণ নয়। ঠাকুমার আর একটি অপূর্ব উপদেশ ছিল : সবাই মিলে নিজ নিজ গ্রাম গড়লে দেশ আপনিই গড়ে উঠবে। জনৈক বালক আম গাছে উঠে আম পাড়ছে শুনে ঠাকুমা বলেছিলেন, 'খবরদার ওদিকে কেউ যাবি না।' সে ভয়ে গাছ থেকে পড়ে যাবে। ঠাকুমা কাউকে অপরাধী বলে অপরাধিনী হতে চাইতেন না।

এক শ' বছর বয়সে ঠাকুমা একদিন বললেন যে তাঁর আর বাঁচার ইচ্ছে নেই। তাঁর অন্তিম সময় সমাগত। তাড়াতাড়ি তাঁকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যেতে হবে। সেখানে তিনি তে-রাত্তির বাস করবেন। উনি বাচ্চাদের তখন তাড়াতাড়ি খাইয়ে দিতে হুকুম দিলেন। সবাইকে সাবধান করে দিলেন ও বললেন যে বাসনগুলো না তুললে চুরি যাবে। আমরা তাঁর শেষ সময়ে সঙ্গে ছিলাম। গভীর রাতে অন্তর্জলির জন্যে তাঁর পায়ের বুড়ো আঙুল গঙ্গার জলে ডুবোনো হলো। উনি হরিবোল বলে আঙুল ঘুরিয়ে দেহত্যাগ করলেন। তাঁর প্রিয় পৌত্রদের প্রতি তিনি একবার ফিরেও তাকালেন না।

[হোমিওপ্যাথী চিকিৎসকরা বলেন, ওটা ঠিক ইচ্ছামৃত্যু নয়। ওটা একপ্রকার মৃত্যু-ভয়। হোমিওপ্যাথী ঔষধ প্রয়োগে উনি কিছুদিন বাঁচতেন। আমার মতে দিবসের শেষে নিদ্রাকাঙ্ক্ষা আসার মতো জীবনের শেষে মানুষ মৃত্যুকে আকাঙ্ক্ষা করে।]

কিন্তু—ঐ অবোধ মহিষ-শিশুর কান্না ব্যর্থ হয় নি। সেই বিরাট ঠাকুরদালানের অধিকাংশই আজ বিধ্বস্ত। তার স্তম্ভগুলির পোড়ামাটির অলংকরণে মুগ্ধ হয়ে তা লোকে সংগ্রহ করে। সেখানে আজ আর কোন মাতৃপূজার আয়োজন নেই। কুল-নারীরা প্রতিমার কানে কানে বলে না: 'মা সামনের বছর আবার এসো।' শরিকী মামলায় সিন্দুকগুলি রৌপা মুদ্রার বদলে মামলার নথিতে ভর্তি। ঠাকুমা চেষ্টা করেও এ-সমস্তের অবসান ঘটাতে পারেন নি। একে একে ভেঙে পড়ল রাজা রামশঙ্কর নির্মিত সাতটি মহল। জমিদারী বিলুপ্ত হওয়াতে বৃহৎ অট্টালিকার মেরামত সম্ভব নয়। শরিকরা ঐ বাড়িরই ইঁট ও কড়ি তুলে দূরে দূরে পৃথক গৃহ নির্মাণ করেছেন। শিক্ষিত স্বচ্ছল যাঁরা তাঁদের সবাই য়ুরোপ ও ভারতের বিভিন্ন স্থানেতে বাস করে। ইঁটের ভগ্নস্তূপের ভেতর শিশুদের [রাম ছাগল টানা] গাড়ির চাকা, ভাঙা পাল্কীর কাঠ, বর্মার ফলক, তরবারি ও খাঁড়ার লৌহখণ্ড, হাতীদের লৌহ ডাণ্ডস, ঘোড়ার সরঞ্জামের টুকরো এখনো পাওয়া যায়। উৎসাহী গুপ্তধন-সন্ধানীরা ভূগর্ভের কক্ষ ভেঙে খুঁজে পায় নরকঙ্কাল ও করোটি। পল্লীর লোকেরা সেখান থেকে ইঁট তুলে উনুন বানায় ও রাস্তা তৈরী করে। তবুও ইঁটের পাহাড় একটুও কমে না। বাটীর কিছু দ্বিতল ও ত্রিতল এখনো সগর্বে মাথা উঁচু করে আছে। ঠাকুমার লক্ষ্মী পেঁচারা এখন আর নেই। তবে তাঁর বাস্তু-সাপগুলির যথেষ্ট বংশ বৃদ্ধি হয়েছে। ওদের ভয়ে সম্প্রতি ঐ ভগ্নস্তূপের ক্ষতিসাধন করতে কেউ সাহসী হয় না। দারোয়ান আর পাইকদের অবর্তমানে ওরাই এখন ঐ প্রাচীন ভগ্ন প্রাসাদের রক্ষক।

পিতামহের মাতৃদেবী ত্রিলোকীসুন্দরী দেবী কর্তৃক তিনশো বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত অশ্বত্থ বৃক্ষটি ঐ ভগ্নস্তূপের অদূরে দাঁড়িয়ে এখনো নীরব বিস্ময়ে বিধ্বস্ত প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে আছে। ওরই তলায় কয়েক পুরুষ গ্রাম্য বালকেরা কপাটি, ডাংগুলি খেলেছে। কিন্তু তারা ঐ বিরাট বৃক্ষের প্রতিষ্ঠাত্রীর নাম জানে না।

[সমগ্র বাংলার বর্ধিষ্ণু পরিবারগুলির পতনের একই ইতিহাস। এখানে একটিমাত্র উদাহরণ দেওয়া হোল। অথচ এ-গুলিই একসময় গ্রামীণ সমাজ-ব্যবস্থার স্টিল ফ্রেম বা লৌহ-কাঠামো ছিল। স্বাভাবিক নিয়মে নদীর এক কূল ভাঙলে অন্য কূল গড়ে। এখানে ভাঙার ব্যাপার থাকলেও গড়ার ব্যাপার নেই। এদের অভাবে গ্রামীণ সমাজ কিছুকাল অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে ছিল।]

পূর্বপুরুষদের রাধাবল্লভজীউর বিগ্রহ পান দৌহিত্র বংশের বঙ্কিমবাবুরা এবং নারায়ণ ঠাকুরের বিগ্রহ পান আমাদের পৌত্র বংশ। রাধাবল্লভজীউর ভাগ্য ভালো। উনি এখনো বঙ্কিম ভবনে সাড়ম্বরে পূজিত। কিন্তু আমাদের বাস্তুচ্যুত নারায়ণ ঠাকুর এখন পুরোহিত গৃহে। বাল্যে বয়স্কদের দেখেছি অনন্যশরণ হয়ে নারায়ণ মন্দিরে মাথা ঠুকতে। বিগ্রহের রূপোর সিংহাসন ও সোনার ছত্র। রূপোর ঝারিতে স্নানের ব্যবস্থা। মখমলের গদিতে শয়ন। মূল্যবান তাম্র ও রৌপ্যের বাসন-কোসন। সকাল-সন্ধ্যায় ভোগ ও বৈকালিক জলপানের ব্যবস্থা। নিত্য-পূজা ও বহুজনে প্রসাদ বিতরণ তখনও অব্যাহত। এখন মন্দিরসহ দেবোত্তর সম্পত্তিও বিক্রিত। কিন্তু এজন্যে দেবতা কারও বিরুদ্ধে আদালতে মামলা রুজু করেন নি। এখন তিনি পরাশ্রয়ী, পরভোজী, গৃহচ্যুত দেবতা। হিসেবমত চার'শ বছরের প্রাচীন বিগ্রহ। সেদিন গ্রামে গেলে পুরোহিত পুত্র অনুযোগ করে বললেন 'ত্বখানি বাতাসা-ভোগের জন্যে মাসে পাঁচটা টাকাও তো দেবেন।'··· গাড়ির পেট্রোল কেনার পর দু'টাকা বেঁচে ছিল। অধোবদনে টাকা দুটো তার হাতে তুলে দিয়ে কলিকাতার নতুন তৈরী বাড়িতে ফিরলাম। জনৈক ব্যক্তি পাশ থেকে সব শুনে কিছু টিপ্পনি করলেন। 'দুশো বছর আগে হলে এজন্য ঐখানেই তার গর্দান যেত।'

বাড়ির একজন ঝি-মা আমাদের ভূত-পেত্নীর গল্প শোনাত। ভূত-পেত্নীদের পায়ের চেটো পেছন দিকে থাকে। ছেলেদের পেত্নী, মেয়েদের ভূত এবং ব্রাহ্মণ-বিধবাদের ব্রহ্মদৈত্যি ভর করে। এ-ছাড়া গন্ধর্ধাদা, গো-ভূত ও মামদো ভূতও আছে। তাঁর মতে মানুষের রূপ ধরেই ওদের আনাগোনা।

ঠাকুমা এ-সব বিষয় জেনে একদিন তাকে ধমকে দিলেন। ঠাকুমার মতে ওরা জীবন্ত দুষ্ট লোক ও তস্কর। চৌর্যকার্যের সুবিধের জন্য ওরা রাত্রে মানুষকে ভয়

দেখায়। তিনি বলতেন, 'আলেয়া জলাভূমিতে গ্যাসের আলো।' আবার চাষী-বধূরা মাঝে মাঝে পিত্রালয়ে পালায়। মাথায় মালসাতে আগুন জ্বেলে তারা ধুনো দেয়। ফলে তা থেকে দপ্‌ দপ্‌ করে আগুন জলে। তা দেখে অনুসন্ধানকারীরা ভয় পেয়ে মাঠে নামে না। ভূত-টুত সব—ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্পের মতো বাজে গালগল্প। জীবনে যারা খুব আপনার জন্য মরণান্তে তাদেরই কেউ চায় না। তাই তাদের নামে প্রিয়জনেরা ভয় পায়। মানুষ ও গরু মরে ভূত হলেও পিঁপড়া, বেজী বা সাপ ম'রে হয় না। কিন্তু আমি ভূতে পাওয়া লোককেও দেখেছি।

[পরে বুঝেছিলাম, ভূতে-পাওয়া একপ্রকার যৌনজ হিষ্টিরিয়া রোগ। অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষা থেকে এর উৎপত্তি। তাই পুরুষকে পেত্নীতে ও নারীকে ভূতে পায়। তাই রোজাদের মন্ত্রে অশ্লীল শব্দ থাকে। রোগীরা ওগুলো শুনে একটু একটু করে ভালো হয়। ভূত তাড়ানোর সময় কুমারী কন্যাদের কানে আঙুল দিয়ে ভূতে-পাওয়া ব্যক্তির সামনে বসানো হ'ত।]

তৎকালে পুস্তক পাঠ, বাক্যালাপ প্রভৃতি কৃত্রিম উপায়ে যৌন স্পৃহা উপশমের সুযোগ ছিল না। তাই বলপূর্বক যৌন অবদমনের ফলে মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের ওপর প্রবল চাপ পড়ত। বৌদি, ঠাকুমা ও শ্যালিকাদের ঠাট্টার সম্পর্ক যৌনাকাঙ্ক্ষা প্রশমনের সহায়ক হয়। [য়ুরোপে যুগ্ম নৃত্যের মাধ্যমে এ-উদ্দেশ্য সফল হয়] নতুবা সে-যুগে ভূত-পেত্নীর সংখ্যা আরও বেড়ে যেত। তবে বেশীর ভাগ ভূতের গল্প অলীক কাহিনী মনে হয়। নিম্নে এক বৃদ্ধের মুখে শোনা এ-ধরনের একটি কাহিনী উদ্ধৃত করা গেল।

"বহু বছর পরে পশ্চিম দেশ থেকে পিসিমার সঙ্গে দেশের বাড়িতে ফিরে দেখলাম ভেতর-বাড়ির প্রাঙ্গণে আতা-গাছের জঙ্গল। বাইরের দিকের একটা ঘর পরিষ্কার করে আমরা দুজনে থাকি। ইতিমধ্যে একটা স্কুলেও ভর্তি হয়েছি। একদিন পিসিমার আর্তনাদে উঠোনে গিয়ে দেখি আতা পাড়ার আঁকশি হাতে পিসিমা অজ্ঞান হয়ে গেছেন। পিসিমাকে তুলে নিয়ে এসে ঝি-এর জিম্মায় রেখে ফিরে এসে দেখি, ডালের ওপর বসে আছে একটা ফর্সা টুকটুকে মেয়ে। তাকে মৃদু হাসতে দেখে আমি বললাম, 'আরে, তুই পুঁটি না! তুই ত মরে গেছিস্ শুনলাম।' মৃতা পুঁটির সঙ্গে আমার বাল্যপ্রণয় ছিল। পুঁটি আমাকে তিনতলায় নিয়ে গিয়ে একটা ভাঙা সিন্দুকের ওপর বসাতো। আর সে নিজেও সেখানে বসে আমাকে আদর করত। স্কুল থেকে ফিরে খাবার হাতে ওপরে গিয়ে সেগুলো আমরা ভাগা-ভাগি করে খেতাম। একদিন পুঁটি বললে, এবার তার সময় হয়েছে। তার ইহলোকে দিন ফুরিয়েছে। আমার কাঁধে নোখ দিয়ে চিরে একটা ওষুধ ঢুকিয়ে

দিয়ে বললে যে এটা থাকলে ভূতে কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এই কটা কথা বলে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে হাওয়াতে মিলিয়ে গেল।"

অশরীরীদের মতে অলীক দেবতাদের কিছু উৎপাতও গ্রামে ছিল। হিষ্টিরিয়া রোগীরা অশ্লীল গালিগালাজ করলে তাদের বলা হ'ত 'ভূতে-পাওয়া' [Possessed]। আর দেব-দেবীর জবানিতে উচ্চাঙ্গের বাক্য প্রয়োগ করলে বলা হ'ত 'ভর হওয়া' [inspired]। কিছু পুণ্যস্থানের উৎপত্তির মূলে আছে এইরূপ প্রবঞ্চনা। উপরোক্ত ভূতের কাহিনিটি একটি প্যাথোলোজিক্যাল মিথ্যা ভাষণের দৃষ্টান্ত। ঐরূপ মিথ্যা বলে ওরাএকপ্রকার পুলক শিহরণ অনুভব করে। জনৈক সাধক গহন বনে ও শ্মশানে গভীর রাত্রিতে কালীপুজো করত। একটি গ্রাম্য বালক পূর্বেই বৃক্ষারূঢ় হয়ে ছিল। সাধক চক্ষু মুদ্রিত করার পর সে প্রসাদী ফলমূল ও মিষ্টাদি তুলে নিয়ে উধাও হ'ল। চক্ষু উন্মীলিত করে সাধকটি কেঁদে ফেলেছিল। তার বক্তব্য, মা সর্বকিছু খেয়ে নিয়েছেন। এক কণাও প্রসাদ রাখেন নি। আর একজন প্রবঞ্চক মাটির তলায় শুক্‌নো ছোলা রেখে তার ওপর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে। তার ঘোষণানুযায়ী গ্রামের লোকেরা মাটির ওপর জল ঢালতে থাকে এবং ব্যোম্ ব্যোম্ ধ্বনি তোলে। যথারীতি ছোলা ভিজে ফুলে ওঠে এবং শিবলিঙ্গও উপরে প্রকটিত হয়।

গ্রামে নারীর বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কাজ অসম্ভব ছিল। সেই কালে গ্রামীণ-নারীরা আত্মরক্ষায় সক্ষম। ভূমিহরণকে লোকে মাতৃহরণ মনে করতো। নারী নির্যাতনের অপরাধ ক্ষমাহীন বলে গণ্য হত। থানা-কোর্ট গ্রাহ্য না করে অপরাধীকে পিটিয়ে মেরে তার মৃতদেহ মাটির নিচে পুঁতে ফেলা হ'ত। গৃহস্থরা ঐ ধরনের সন্তানদের মুখ দর্শন করাও পাপ মনে করতেন। এই শ্রেণীর কেউ কেউ দেশ ত্যাগ করে ফেরার হয়ে এক জাতীয় সন্ন্যাসীর সৃষ্টি করেছে। জনগণই এক্ষেত্রে একই সঙ্গে তদন্ত-বিচার ও দণ্ডবিধানের দায়িত্ব পালন করতো। ব্রিটিশের শাসন-ব্যবস্থা বহুকাল গ্রামীণ মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে নি। কোনও অপরাধপ্রবণা চরিত্রহীনা নারী গ্রামে স্থান পেত না। তবে গোপন ব্যভিচারের নজির সেখানে ছিল। নিম্নের কাহিনী থেকে বক্তব্য-বিষয়টি পরিস্ফুট হবে। অশীতিপর এক বৃদ্ধের কাছে বাল্যকালে আমি এই ঘটনাটি শুনেছিলাম। তাঁর ভাষায় : 'দাদা ও বৌদি খোলাছাদে ঘুমুচ্ছিলেন। আমি কষায় বস্ত্র পরিধান করে মোটা পৈতে গলায় খড়ম পায়ে খট্ খট্ করে এগুলাম। তারপর বেল গাছ বেয়ে পাশের বাড়ির পাঁচিলের ওপারে গেলাম। যেতে যেতে শুনলাম, বৌদি দাদাকে বলছে—'ওগো, দেখছো!' দাদা তখন বৌদিকে ধমক্ দিয়ে বললেন, 'চুপ

কর। ওঁকে আমি রোজ দেখি। উনি আমাদের ছোড়-দাদু। খবরদার, কেউ যেন না এ-সব জানতে পারে।' [এতে গ্রামে নিন্দে হবে] ওদিকে আমি নির্বিঘ্নে গোয়াল ঘরে ঢুকলাম। ও-বাড়ির মেজবাবুর চাকরীর ক্ষেত্র লক্ষ্ণৌ। তিন বছর অন্তর তিনি একবার বাড়ি আসেন। ও বাড়ির শাশুড়ী ঠাকরুণ তাঁদের বাঁকা সিঁড়িতে ঝুম্-ঝুম্ ঘুঙুরের শব্দ শুনলেন। তিনি ভক্তিভরে কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন: 'হে মা লক্ষ্মী' তুমি এমনি করে এ-বাড়িতে অচলা থেকো।' আমরা প্রতিদিন যথারীতি ওদের গোয়াল ঘরে মিলিত হতাম। পরের দিন ওদের বাড়িতে পান চাইতে এসে সেখানে এলাহী ব্যাপার দেখলাম। ওঁদের বাঁকা সিঁড়িতে শাশুড়ী ঠাকরুণ লক্ষ্মীর পায়ের একটি ঘুঙুর কুড়িয়ে পেয়েছেন। ওটাকে নারায়ণের সিংহাসনে রেখে পুজো সুরু হয়ে গিয়েছে।'

বধূরা জল নিতে এসে পুকুর পাড়ে পরিত্যক্ত হাঁড়ির তলায় প্রেমপত্র রাখতো। জীউর মৃত্যুর পর ঐ সমস্ত ফেলে দেওয়া ওষুধের হাঁড়ি-কুঁড়ি ছুঁলে লোকে স্নান করত। তাই ওগুলোর তলাই ছিল সর্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান। ওদিকে প্রেমাস্পদরা যথা সময়ে এসে পত্রগুলি হস্তগত করত। তবে গ্রামেতে এ ধরনের সাহসিকতার নজির সংখ্যাতে নগণ্য ছিল।

[সে-কালের ভূত-পেত্নীরা বিলুপ্ত হয় নি। সেকালে যাদেব রাতের অন্ধকারে বেলগাছ কিম্বা শ্যাওড়া গাছে দেখা যেত; এখন তাদের দেখা যায় প্রকাশ্যে রেস্তরাঁ বা লেকের ধারে। এ-সব ভূত-পেত্নী চিরদিনই রক্ষীদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। অধুনা এদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। সীমিত ক্ষেত্রে অন্যপ্রকার অপরাধও গ্রামে দেখা যেত। জনৈক অশীতপর বৃদ্ধের নিম্নোক্ত বিবৃতি থেকে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে।]

'আমার পিতামহ ৪০টি বিবাহ করলেও আমার পিতার মাত্র ১২টি বিবাহ। পিতার পত্নীদের মাত্র দুজনে তাঁর স্বগৃহে স্থান পায়। আমি মা-র সঙ্গে মাতুলালয়ে থাকায় জ্ঞান হওয়ার পর পিতাকে কখনও দেখি নি। একদিন গ্রামান্তরে যেতে যেতে তাঁর মনে পড়ল, ঐ গ্রামে তাঁর এক স্ত্রী থাকে। আমাকে সম্মুখে পেয়ে তিনি নাম জিজ্ঞেস করলেন। তারপর আমার বয়স জেনে খাতা খুলে পরিচিত মিলিয়ে বললেন,—'বাবা, আমি তোমার পিতা।' ঐ অদ্ভুত চেহারার লোকটির এবংবিধ উক্তিতে ক্রুদ্ধ হয়ে আমি তাকে প্রহার করলাম। পরে মা ছুটে আসায় আমি প্রহার বন্ধ করে গৃহত্যাগ করি। এখনো পর্যন্ত আমি অবিবাহিত আছি। মহাকুলীন ব্রাহ্মণ-সন্তান হওয়া আমার কাছে অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার।'

অন্যায় হতে অপরাধ এবং অপরাধ হতে পাপের সৃষ্টি হয়। অন্যায় ও অপরাধ

পাপের প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপ। তাই অপরাধ দূরীকরণে গ্রামীণ সমাজ অন্যায়-কারী এবং পাপীকে প্রথমে দমন করতো। সমাজে অপরাধ নগণ্য থাকলে পুলিশেরও প্রয়োজন হয় না। সামাজিক বিধান কেউ সামান্য লঙ্ঘন করলে তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হত। দুর্দান্ত জমিদারদেরও সমাজ ভয় না করে বিচারপূর্বক দণ্ডবিধান করত। তিন প্রকার দণ্ড ব্যবস্থা ছিল—সামাজিক, কায়িক ও আর্থিক। তৎকালে সমাজে শাস্তিবিধান অত্যন্ত কঠোর ভাবেই হ'ত। দুরন্ত জমিদার-দেরকেও সমাজ নির্ভয়ে দণ্ডদান করেছে। গ্রামীণ সমাজ কোন অন্যায় বা অপরাধের লেশমাত্র কাউকে জিইয়ে রাখতে দেয় নি।

'বাড়ির এক চতুর্দশী বিধবা বীণা দেবী থান পরেন না। তার ওপর হাতে দু-গাছি পাত্‌লা চুড়ি পরেন। একাদশীতে উপোস করেন না। মাছ বাদ দিয়ে মাছের ঝোল খান। তাঁকে খোলা ছাদে বেড়াতে দেখা যায়। গ্রামের তরুণদের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা চলে। [জনপ্রবাদ—তাঁর ওরূপ আচরণেতে পিতামহীর অনুমতি ও সমর্থন ছিল।] গ্রামের মাতব্বররা বীণাদেবীকে শাসন করবার সুযোগ খুঁজ-ছিলেন। একটি সামাজিক নিমন্ত্রণ উপলক্ষে সে সুযোগ এল। তাঁরা সঠিক খবর সংগ্রহ করলেন যে বীণা দেবী হেঁসেলে ঢুকেছেন। তাঁদের দাবী—ওঁকে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। [তৎকালে ধনী রমণীদের স্বহস্তে রান্না করার রেওয়াজ ছিল] মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন নিমন্ত্রিতদের একজন। উনি পিতামহকে বললেন, 'বীণার রান্নাই সবাইকে খেতে হবে। তা না হলে উনি নিমন্ত্রণ রক্ষা না করে চলে যাবেন।' সেদিন কৃষক প্রজারাই কেবল আহার্য বস্তু গ্রহণ করে ছিল। ক্ষোভে শোকে বীণাদেবী শুকিয়ে যেতে থাকেন এবং একদিন তাঁর মৃত্যু ঘটে।

"বঙ্কিমবাবুর গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পরের বছর বাড়ির এক তরুণ গ্র্যাজুয়েট হন। এক বাগ্দী প্রজার বাড়িতে ওঁর যাতায়াত ছিল। বাগ্দী কন্যা ক্ষ্যান্তমণির হাতের রান্না খেতেও তাঁর আপত্তি নেই। তবে তিনি ছিলেন উদার-হৃদয় জমিদার পুত্র। বহু প্রজার খাজনা তিনি মুকুব করে দিতেন এবং তাদের আর্থিক সাহায্যও করতেন। তাঁর আচরণে শীঘ্রই সামাজিক প্রতিক্রিয়া সুরু হ'ল। তিনি গৃহত্যাগী হয়ে অন্যত্র বাসা নিলেন। তাঁর সঙ্গে রইল কৃষক-কন্যা ক্ষ্যান্তমণি। ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরী পেয়েও তিনি নিলেন না। ধীরে ধীরে সুরাসক্ত হলেন। অবশেষে একদিন ক্ষ্যান্তমণির হাতে এক ঢোক জল খেয়ে তিনি চোখ বুজলেন। এবাড়ি থেকে খবর পেয়ে সবাই ওখানে যেতেই ক্ষ্যান্তমণি বেরিয়ে যায়। সেদিন থেকে তাকে আর কোথাও দেখা যায় নি।"

কিন্তু অন্য একটি দোষে আমরা কিছুকাল এক ঘরে হলাম। অপরাধ—পিতামহীকে

এক মিশনারী মেম কিছুদিন পড়িয়েছে। কোনও বিদেশীর সংস্পর্শ গ্রামীণ সমাজ সহ্য করত না। আমাদের ক্ষমতা লোপ ও পড়ন্ত দশার ওরা সুযোগ নিয়েছিল। তবে গ্রামের ধোপা নাপিত ও প্রজার দল আমাদের সঙ্গে রইল। সেদিন যাঁরা আমাদের এক ঘরে করেছিল তাঁরা জীবিত থাকলে তাঁদের উত্তর পুরুষদের আচার-আচরণ দেখে স্তম্ভিত হয়ে যেতেন। আমাদের বাড়ির কয়েক ভ্রাতার য়ুরোপীয় বধূ। কিন্তু তাদের আমরা বাড়িতে স্থান দিই নি। অন্যদিকে ওদের বংশধরদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ সুরু হয়ে গিয়েছে।

জমিদার শাসক ও পণ্ডিত কুলের অভাবে যে কুফল দেখা দিয়েছে তা হ'ল— সমাজের চতুর্দিকে নানা কুসংস্কার ও নৈতিক অধঃপতন। পাঠশালা, সংস্কৃত টোল ও চতুষ্পাঠীগুলির ভগ্নদশা। গ্রামে ইংরাজী শিক্ষার তেমন সুযোগ ছিল না। ব্রিটিশ শাসকদের এই অব্যবস্থার ফলে গ্রামগুলি কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সেগুলির দশা ঠিক হালহীন নৌকো বা চালকহীন শকটের মতো হয়ে যায়। এ-অবস্থা বহুদিন পর্যন্ত বাংলার কিছু গ্রামকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

পণ্ডিতদের অনেকের আচরণের মধ্যে নানা অসংগতি, স্বার্থপরতা ও অন্যায় আস্ফালন লক্ষিত হত। কেউ কেউ ক্রুদ্ধ হসে উল্টো তুলসী দেবার ভয় দেখিয়ে বলতেন: 'অর্বাচীন, মূর্খ, স্ব-পল্লীতে প্রাপ্তহলে গাত্রচর্ম স্খলিত করবো।' আবার সামনে কেউ খেজুর রসের ভাঁড় দিলে ওঁরা বলতেন: 'বাবা জীবন, তান্ত্রিকমতে আহ্নিক সেরে নিই।' তারপর নামাবলীর তলায় খানিক আঙুল ঘুরিয়ে রস-ভাণ্ডে চুমুক দিতে তাঁদের বাধা নেই। পংক্তিভোজনে দৈবাৎ কোন অব্রাহ্মণ বসলে ওঁরা সত্বর দধি ও মিষ্টান্ন মুখে পুরে দিয়ে বলেছেন: 'নাঃ, খাবো না। আমার জাতঃপাত হবে,' ইত্যাদি। কোনও শিষ্য গুরুগৃহে এসে হঠাৎ বৃহৎ মৎস্য রান্না হতে দেখলে, নিরামিষাশী-মন্য স্বপাক-ভোজী গুরুদের বলে উঠেছেন— 'এসো, বাবা জীবন এসো, এখানে মৎস্য-যজ্ঞের আয়োজন হয়েছে। এ-যজ্ঞ দ্বাদশ বৎসর অন্তর মদ্‌গৃহে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তা বাবা, জীবন! অত্র গৃহে প্রসাদ গ্রহণ করবে।' মেথর অস্পৃশ্য হলেও এঁদের অনেকের কাছে তন্বী মেথরানী অস্পৃশ্য নয়। দুই বাগ্মী পণ্ডিতে ঘুসো-ঘুসি হলে জনৈক ব্যক্তি অভিমত দিলেন: 'দন্ত ভগ্নে চ পপাতঃ। অন্যজনে তীব্র প্রতিবাদ করে বললেন: 'উঁহু, মিথ্যা বাক্য। দণ্ড ভগ্নে চ তিষ্ঠায়মান।' যাত্রা প্রভৃতিতে নটীদের গানে মুগ্ধ হয়ে তাঁরা পুনরায় গানটি গীত হওয়ার জন্যে 'পুনারোপী গাহিতম্' বলেছেন। কেউ কথ্য ভাষা প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন না। বিদ্যা জাহির করে তাঁরা বলেছেন: 'গবাক্ষ-পথে হস্ত প্রসারিত করে বৃষ্টি পতিত হচ্ছে কিনা দেখ।' কোনও মঠের সন্ন্যাসীর

নিকট অন্য সন্ন্যাসীর সংবাদ জানতে চাইলে মুখ থেকে চাদর না তুলে তিনি বলেছেন 'ওঁর সঙ্গে আমার বাক্যালাপ নেই।' ব্রাহ্মণদের একত্রে দেখলে 'ব্রাহ্মনেভ্য নমো' বলা সেই কালে একটি সভ্য সম্মত রীতি ছিল।

[পূর্বে নিমন্ত্রণ বাটিতে গৃহকর্তা অভ্যাগতদের বলতেন : ব্রাহ্মণরা এদিকে ও অন্যেরা ওদিকে বসুন। এ যুগে ওঁরাই ঐ ক্ষেত্রে বলে থাকেন : ভদ্রলোকেরা এদিকে এবং ব্রাহ্মণরা ওই রোয়াকে বসুন।]

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা সমাজের পথপ্রদর্শক না হয়ে স্বস্থান হতে বিচ্যুত হয়ে ধীরে ধীরে চাকুরিজীবী হয়েছেন। সন্ন্যাসী ও জ্ঞানী গুণীরা তাঁদের স্থলাভিষিক্ত না হলে জনগণ আরও অধঃপতিত হ'ত। তবে গ্রামের অধিকাংশ মহিলা নিরক্ষর হলেও অশিক্ষিতা ছিলেন না। যাত্রা গান, পুতুল নাচ, কথকতা ও রামায়ণ-মহাভারত পাঠ শ্রবণে তাঁরা নানা শিক্ষা লাভ করতেন। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে ওঁদের গুরুত্বকে খুব অস্বীকার করা চলে না। গুরুমশাইদের সাপ্তাহিক 'সিধা' পাঠিয়ে ওঁরাই পাঠশালাগুলোকে রক্ষা করে এসেছেন। কারণ, জমিদার গৃহ থেকে তাদের অর্থদান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

বৃত্তিভিত্তিক সমাজ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। স্ব-বৃত্তিতে অধিষ্ঠিত থাকা কারও পছন্দ নয়। কেবল কৃষক সমাজ গ্রামের মেরুদণ্ড হয়ে রইল। এক কৃষককে ডন বৈঠক সেরে তাল গাছে ধাক্কা মেরে বলতে শুনেছি, 'মা, একটু ছাই দাও তো, এটাকে উপড়ে আবার পুঁতি।' ম্যালেরিয়ার প্রচণ্ড প্রভাব সত্ত্বেও এদের বুকের ছাতি ও বাহুর পেশী ঈর্ষার বস্তু ছিল। এক মধ্যবিত্ত তরুণকে নারকেল গাছের মাথায় বসে ইতিহাস মুখস্থ করতে দেখেছি।

তৎকালে তরজা গায়ক দল জাতীয় সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করতো। এই শ্রেণীর তরজা গায়করা গ্রামে গ্রামে তরজা গান পরিবেশন করে বেড়াত। কিন্তু তার আগে তারা গ্রামের বহু আভ্যন্তরীণ সংবাদ সংগ্রহ করত। অতঃপর গানের মাধ্যমে প্রতিটি দোষ-গুণ জনসমক্ষে প্রকাশ করত।—কোন্ পরিবারের কে কাকে প্রবঞ্চনা করেছে, কার পুত্র কেন বিপথগামী হবে, কার কোথায় সংশোধন যোগ্য ত্রুটি আছে ইত্যাদি প্রকাশ করে তরজা গায়করা একপ্রকার সংশোধনী পুলিশের কাজ করত।

সে-সময় মাদরাল থেকে কাঁকিনাড়া একটি মাত্র রাজপথ। পূর্বপুরুষরা এ পথ তৈরী করে স্টেশনগামী অন্নদা ব্যানার্জী রোডে যুক্ত করেন। [এঁর প্রথমা, পিতামহের ভগিনী।] কিন্তু নৈহাটী থেকে মাদরাল গ্রামে কোন রাস্তা না থাকায় তরজা গায়করা গাইল—'গ্রাম মাদরাল, রাস্তা নাইকো খালি—আল খেতে দিল

ডালে চাল।' বয়োপ্রাপ্ত হয়ে নৈহাটী থেকে মাদরাল পর্যন্ত দু'মাইল রাস্তা আমিই তৈরী করি। আমার নিজস্ব ধানক্ষেতগুলি এতে দুভাগ হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু এর জন্যে আমি কোন সুনামের অধিকারী হলাম না। বর্ষীয়ানদের অভিমত—ঐ পথ দিয়ে গুণ্ডারা এসে লুটপাট করে আর সেই সঙ্গে বাড়তি উৎপাত রূপে আসে গাড়ি বোঝাই পুলিশ। প্রথম রাজপথটি পূর্বপুরুষদের চেষ্টায় এবং দ্বিতীয়টি আমার চেষ্টায় তৈরী হল। গ্রামের লোক সুখ পেলেও তাদের শান্তি হ'ল বিঘ্নিত। কল্যাণ রোড সমাপ্ত হলে মোটর ডাকাতির সম্ভাবনা দেখা দেয়, জঙ্গল সাফ করে আমার তৈরী পার্ক গুণ্ডাদের আসার সুযোগ করে দেয়—উপরন্তু গ্রামের লোকেদের স্বাভাবিক শৌচাগার নাকি এতে নষ্ট হ'ল। একজনের সুখ অন্যজনের দুঃখের কারণ হয়।

আজও মনে পড়ে সেদিনের সেই বৌ-কথা কও আর দোয়েল পাখির গান। গত মহাযুদ্ধের সময় আমাদের শরিকরা বাগানের গাছ আর বাঁশ ঝাড় বিক্রি করে দেন। এর জন্যে অনুযোগ করলে তাঁরা বলেন—'এত বড়ো দুর্ভিক্ষ গেল, তোমরা কি আমাদের দেখেছো?' ফাগুনে আর আগুন জ্বলে না বাঁশে; তবু শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনি আজো কানে বাজে। আজো মন ছুটে যায় গো-হাড়গিলেদের পেছন পেছন। শুনতে ইচ্ছে করে সেদিনের সেই পাঠশালার পড়ুয়াদের ছুটির আগের—'দুই কড়া আধা গণ্ডা' ডাক। শহরবাসী পুত্রটি পারিবারিক ঐতিহ্যকে স্বীকার করতে নারাজ। তার মনে ভয়, বন্ধুরা তাকে এতে বুর্জোয়া বলে উপহাস করবে।

[এ-জীবনে বারংবার দেখেছি, মানব-মনের পরিবর্তন কিভাবে ঘটে। প্রথম জীবনে বিপত্নীক হওয়ায় শ্বশুর বাড়িটি বিশেষ অবলম্বন ছিল। বহু বৎসর ওদের সংস্পর্শে থেকে অতীতকে ভুলেছিলাম। ওরা প্রথমে বড়ো বড়ো রসগোল্লা নিয়ে আসতো। পরে ওগুলো আকারে ছোট হতে থাকে। একদিন ওরা রসমুণ্ডি এনে দিল। কিন্তু—বৌদের জন্যে আমি আর অপেক্ষা করি নি। ওরা আর আমার সংবাদ নেয় না। আমিও আর যাই না ওদের ওখানে। এমনটি যে হবে তা স্নেহশীলা শাশুড়ী ঠাকরুণ বুঝতে পেরেছিলেন। তাই মৃত্যুর পূর্বে তিনি আমাকে পুনর্বিবাহ করালেন। কিন্তু সেও বেশীদিন পৃথিবীতে রইল না। ওদের ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ির পাশ দিয়ে মাঝে মাঝে যাই। বাড়িটা যেন আমাকে ডাক দিয়ে বলে,—'ব্রাদার, তোমাকে আমি চিনেছি, তুমি কি আমাকে চিনতে পারো?' দ্রুত গতিতে মোটর গাড়ি দূরে সরে যায়।]

[আজও সেই ছায়া শীতল পল্লীর স্মৃতি বারংবার অন্তরকে ব্যথাতুর করে তোলে।

কলকাতায় থেকে উচ্চ শিক্ষা ও উচ্চপদ লাভ করে যে সম্মান আমি পেয়েছি তার চেয়ে বহুগণ বেশী সম্মান গ্রামের দরিদ্র অল্পশিক্ষিত শরিকরা পেয়ে থাকে। বংশ পরিচয়ের গুণে তাদের এই সম্মান লাভ। সাত পুরুষ একসঙ্গে বাস করে সবাই যেন এক পরিবারভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। কেউ অনাহারে থাকলে অন্য কেউ না কেউ সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসত। এখন বহিরাগতদের ভীড়ে জনবহুলতার জন্য তারাযে নিজবাসভূমে পরবাসীর মতো।]

উপরে রাষ্ট্রীয় পুলিশ-বিহীন গ্রামীণ সমাজের যে চিত্র তুলে ধরা হ'ল তা প্রায় সাম্প্রতিক কালের হলেও ব্রিটিশ কর্তৃক জমিদারী পুলিশ উচ্ছেদের সময় থেকে কিংবা শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত একই রকম ছিল। একে গভর্ণমেণ্ট অব্ দি পিপ্ল, বাই দি পিপ্ল এ্যাণ্ড ফর দি পিপ্ল বলা যায়। গ্রামীণ প্রশাসনে গ্রামের প্রতিটি ব্যক্তি সমান অংশীদার ছিল—প্রতিটি বয়স্ক ব্যক্তির অভিভাবকত্বে গ্রামের শিশুরা বড়ো হ'ত।

পথঘাট ও যানবাহনের উন্নতির সাথে সাথে গ্রামগুলিতে পুলিশের অনুপ্রবেশ তথা ব্রিটিশের বিচার-ব্যবস্থার প্রচলন হয়। বর্তমান শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে সংঘাতময়তার ভেতর দিয়ে গ্রাম্য সমাজ ভগ্নদশা প্রাপ্ত হলে এ-কাজ আরও সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। ফলে গ্রামের মানুষ আত্মরক্ষার জন্য এতদিন রাষ্ট্রীয় পুলিশের ওপর নির্ভরশীল হয়।

[শৈশবকালে মনুষ্যশিশু তার ইচ্ছাস্বরূপ কাজ করতে এবং ইচ্ছাস্বরূপ দ্রব্যাদি লাভ করতে চায়। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে সে উপলব্ধি করে যে, স্বীয় বাসনানুসারে কিছু পেতে হলে তা সৎভাবে পরিশ্রম দ্বারা উপার্জন করতে হয়। নতুবা চতুর্দিক থেকে প্রচণ্ড বাধা আসে। পরে অন্যের নিকট থেকে আসা বাধাকে নিজের ওপর আরোপ করতে দেখা যায়। কখনো অক্ষমতা ঢাকার জন্য 'ম্যাল-এ্যাড্জাস্টমেণ্ট' প্রভৃতি উচ্চধ্বনিব্যঞ্জক শব্দাদী প্রয়োগে এর ব্যাখ্যা করা হয়। পরবর্তী অবস্থা মানিয়ে নিতে গ্রামীণ সমাজ শিশুদের সাহায্য করতে সক্ষম। এজন্য গ্রামে অপরাধীর সংখ্যা সাধারণত কম। কিন্তু জনপদ নয়, গ্রাম বা শহরের পর্যায়েও ফেলা যায় না এসব ক্ষেত্রে অবস্থা সংকটজনক হয়।]

পুলিশ দু'ধরনের হয়ে থাকে, যথা—(১) শাসক আরোপিত পুলিশ (২) জনগণসৃষ্ট পুলিশ। প্রথমটি ওপর থেকে শাসকগণ কর্তৃক আরোপিত হয়। এ হ'ল সমগ্র দেশ বা প্রদেশের জন্য একই রূপ সংঘটন-সহ কেন্দ্রীভূত পুলিশ। শাসকনিয়োজিত পুলিশ সম্প্রদায় শাসকদের স্বার্থে কাজ করায় তেমন জনপ্রিয় হতে পারে না। ভারত, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি পূর্বতন কলোনিয়াল কাণ্ট্রিতে

এদের প্রাধান্য। কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত জনগণ-সৃষ্ট পুলিশ বিকেন্দ্রীকরণের ফলে স্থান ভেদে বিভিন্ন প্রকারের হয়। এরা জনগণের নিয়ন্ত্রণে জনগণের স্বার্থে কার্য করায় জনপ্রিয় ওঠে। আমেরিকা ও য়ুরোপের বহু শহরে ও দেশে তাদের মিউনিসি-প্যালিটির অধীনে জনগণ-সৃষ্ট বিকেন্দ্রীভূত পুলিশ এখনো আছে।

ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতব্যাপী জনগণ সৃষ্ট পুলিশ শাসকও আরোপিত পুলিশ-গণ কর্তৃক অপসারিত হয়। পরবর্তী পরিচ্ছেদে ঐ শাসক কুল-আরোপিত কেন্দ্রী-ভূত পুলিশের ইতিবৃত্ত বিবৃত করা হবে।

[প্রাচীন গ্রামীণ সংস্কৃতির কিছু কিছু নিদর্শন গ্রামে থেকে গেছে। যেমন, বিশেষ তিথিতে গহন বাগিচায় গিয়ে মহিলাদের পুরুষ বর্জিত বনভোজন। এটা বাঙলা দেশের একটি প্রাচীন প্রথার নিদর্শন। পূর্বকালে গ্রামের মহিলারা নৃত্যশিল্পে পারদর্শিনী ছিলেন। বরবধূ ও প্রতিমা বরণে ওঁদের হস্ত সঞ্চালন থাকলেও তৎসহ পদ সঞ্চালন আজও পরিত্যক্ত। আল্পনা ও কাঁথার ওপর নক্সা তোলার কাজে আজও এঁদের পারদর্শিতা লক্ষ্য করা যায়। সে-সময় গ্রামে অনাবিল শান্তি না থাকলে এ-সব সম্ভব হত না।

তরবারি, লাঠি খেলা প্রভৃতি আজো গ্রামের পুরুষদের কাছে অতি প্রিয়। বঙ্কিম-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাল্যকালে আমাদের বাড়িতে তরবারি চালনা শিক্ষার জন্য প্রায়ই আসতেন। তাঁর ব্যবহৃত তিন শ' বছরের পুরনো দুখানি তরবারি আমাদের অধিকারে আছে। এ-সব শিক্ষা প্রাচীন প্রজাদের কাছ থেকে গ্রহণ করতে ওঁর আপত্তি ছিল না।

কলিকাতা ও এর শিল্পাঞ্চল বাংলাকে নিজ দেশে প্রায় পরবাসী করেছে। মনে হয় এখন বাকি কাজটুকু চিত্তরঞ্জন, দুর্গাপুর, ও হলদিয়া সমাধা করবে। আশ্চর্য এই যে, বাঙালী মন্ত্রীদের নির্দেশে বাঙালী পুলিশের কর্মতৎপরতায় এ-কাজ সংঘটিত হবে। বাঙালিরা নিজেরা নিজেদের জন্য এ-সব গঠন করতে অক্ষম হলে তাদের বলতে হবে ও বলা উচিত—"দাও ফিরে সে অরণ্য।'—বৃথা চাষের ভূমি হারাতে আমরা রাজী নই। কয়েক শতাব্দীর রণক্লান্ত বাঙালীর আত্মসংরক্ষণের প্রয়োজন সর্বাধিক।

বাংলার শিল্পাঞ্চলগুলি চাষের ভূমি নষ্ট করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রাইম সৃষ্টি করেছে। এর ফলে সামাজিক আবহাওয়া দূষিত হয়েছে। অপরাধীর সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু স্থানীয় লোকেদের কর্ম সংস্থান হয় নি। এমন কি খাদ্যাভাব আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে। এদিকে বাঙালী নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার কথা চিন্তা না করে আত্মধ্বংসী রাজনীতির চর্চায় মত্ত হয়ে আছে।

ব্রিটিশ শাসকরা প্রায়ই বলতেন—ভারতের হিতার্থে তারা ঈশ্বর-প্রেরিত দূত। বস্তুতঃ চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, বিজয়নগরের মহারাজা দেবপাল, মহীপাল ও আকবরের স্বপ্নকে তারা বাস্তবে রূপায়িত করে সমগ্র ভারতকে একসূত্রে গ্রথিত করেন। মানস-সরোবর সহ তিব্বত জয় করার পর তা ত্যাগ না করে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করলে আজ ব্রহ্মদেশের মতো তিব্বত স্বাধীন দেশ থাকতো। ইংরাজ পণ্ডিতরাই ভারতীয় বেদ ও ব্রাহ্মীলিপির পাঠোদ্ধার করেন। এমন কি জাতীয় কংগ্রেসের মূল ভিত্তি ওঁদেরই একজন স্থাপন করেছিলেন। ভারতবর্ষকে নানা দিকে সুসংগঠিত করে আমাদের হাতে তারা তুলে দেন। সে-সময় নেপাল, ভূটান, সিকিম ও সিংহলও ভারতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারত। অবশ্য 'ইকনমিক এক্সপ্লয়টেশন'-এর বিষয় এখানে উল্লেখ করবো না। ভারতের একটুকরো ভূমিও তারা বেদখল হতে দেয় নি। বহুকালের উৎপীড়িত ও রণক্লান্ত জাতি প্রথম শান্তি পেল। তাই বহু পূর্বে কলহরত গ্রাম-বালকেরা পিতা ও পিতৃব্যের মতো পরস্পরকে বলতো—'কোম্পানীর রাজত্বে বাস করি—ভয় করি না বাপু! এটা মগের মুলুক নয়।'

[আমি পুলিশে চাকরী করে একটা অদ্ভুত বিষয় লক্ষ্য করতাম। এ্যাংলো সার্জেণ্টরা দেশীয় ইনচার্জ কর্মীদের অধীন হলেও মেথর শ্রেণীর উৎপীড়িত বালকেরা ঐ লালমুখোদেরই সুবিচারার্থে বেছে নিত। তখনো তাদের ধারণা, বাবুদের চেয়ে ওরা ভালো বিচার করবে।]

একজন ইউরোপীয় ও একজন ভারতীয়েব বিচারে কিছু তারতম্য হত। কিন্তু একজন ভারতীয়ের সঙ্গে অন্য ভারতীয়ের তারা চুলচেরা বিচার করেছে। ইউরোপীয় অপরাধীরাও সব সময় রেহাই পেত না। তবে তাদের ক্ষেত্রে লঘুদণ্ড হত। ইংরাজ নাগরিকরা স্বভাবতঃই দেশীয়দের সঙ্গে সংঘাত এড়িয়ে চলত। তারা লক্ষ্য করেছিল যে দেশীয়রা ধর্মীয় কারণে বিদ্রোহী হয়। তাই তারা ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ করার পক্ষপাতী ছিল না। মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ও সিপাহী বিদ্রোহের মূলে ছিল এই ধর্মীয় চেতনা। দোষে-গুণে ওদের যে সাম্রাজ্যের সূচনা হয়েছিল তার শেষভাগে কেবলই 'ভেদনীতি'। এতে ব্রিটিশ ও ভারতীয় উভয়েরই সর্বনাশ ঘটে।

যেভাবে স্থল পথে রুশীয়ার [Russia] সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে জলপথে সেই একইভাবে ব্রিটিশরা তা করেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভগ্নদশাপ্রাপ্ত হলেও রুশ সামাজ্য ভাঙে নি। বহুভাষা ও জাতিসম্বলিত রুশ সাম্রাজ্য আজও অন্য নামে অক্ষুন্ন আছে। বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একাংশ থেকে অন্যাংশে প্রেরিত খাদ্য ও

বস্ত্র সুলভ ছিল। ভারতের বিভিন্ন দেশীয় নৃপতিদের সঙ্গে তারা ক্ষমতার ভাগাভাগি করে। কিন্তু বাংলার ভূঁইয়ার শাসকদের সঙ্গে অনুরূপ চুক্তিতে তারা সম্মত হয় নি। তাই তাদের বিচার ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ফৌজ ও পুলিশ ওরা ভেঙে দেয়। এ-ভাবে বাঙালীদের একাংশের সঙ্গে তাদের চির বিরোধ ঘটে। লর্ড কর্নওয়ালিশের সময় থেকেই তার সূত্রপাত। [প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য] বাঙালীরাই ওদের ডেকে এনে ভারতের রাজতক্তে বসিয়ে ছিল। আবার বাঙালীরাই ওদের সাম্রাজ্যলোপের বীজ বপন করে। তা না হলে এত শীঘ্র ওদের এ-দেশথেকে বিদায় নিতে হ'ত না। তবুও বেশ কিছুকাল স্বাধীনতাকামী বাঙালী তথা ভারতীয়দের মধ্যে একটা সুষুপ্তির অবস্থা তথা 'লুসিড্ ইণ্টারভ্যাল' বিরাজ করে। এই সুযোগে ব্রিটিশরা অনেক কিছু গুছিয়ে নিতে সক্ষম হয়।

কিন্তু শ্মশানের মহাশান্তি যে কাম্য নয় তা বালাংর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম উপলব্ধি করলেন। উনি লক্ষ্য করলেন যে, সাম্রাজ্যরক্ষার প্রয়োজনে রেলপথগুলি স্থাপিত হ'ল সমুদ্রের কিনারা ধরে। পরে এগুলি সৈন্য চলাচলের সুবিধার্থে সমগ্র দেশকে শৃঙ্খলিত করলো। এই রেলগাড়ি, ষ্টিমার এবং টেলিগ্রাফ প্রান্তিক বিদ্রোহ দমনে সহায়ক হবে। ভারতকে চিরপরাধীন রাখাই এর অন্যতম উদ্দেশ্য। উনি আরও লক্ষ্য করলেন যে ওরা প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যকে যথা সত্বর ভুলিয়ে দিতে চায়। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজ পূর্বেই সৃষ্টি হয়েছিল। অতঃপর এ্যাংলো-বাঙলো নামে এক নতুন ইংরাজীনবিশ দল সৃষ্টি হচ্ছে। এরা সগর্বে বলতে সুরু করেছে—'উই থিঙ্ক ইন ইংলিশ, উই স্পিক্ ইন্ ইংলিশ, উই ড্রিম ইন্ ইংলিশ।' উপরন্তু ইংরাজ পণ্ডিতরা 'বিভেদ-পন্থী' গবেষণায় নিরত। একীভূত হিন্দু-সমাজকে নৃ-তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বদ্বারা বহু ভাগে বিভক্ত করাই ওদের ইচ্ছা। ওরা চায় না, মুশ্লিমরা নিজেদেরকে ধর্মে মুশ্লিম হয়েও জাতিতে হিন্দু ভাবুক। অথচ চিরকাল বাদশারাও তাদের দেশকে হিন্দুস্থান বলে এসেছে।

[বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, আর্যরা আদি মানব-গোষ্ঠীরই একটি উন্নত শাখা। তাঁর মতে আদি মানবজাতির উদ্ভব হিমালয়ের পাদদেশে। কাশ্মীর ও হিমালয় থেকে আর্যরা পাঞ্জাব ও অন্য স্থানে পারস্য ও ইউরোপে বসবাস করে। ভারতের ঐ সমস্ত অঞ্চল শীত-প্রধান হওয়ায় তাদের গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল ছিল। নিগ্রোয়িটরা ভেলায় করে সমুদ্রপথে ভারতে এসেছিল। আর্যরা অন্য স্থান থেকে এলে বেদে তার উল্লেখ থাকতো। ভারতে স্থানভেদে জলবায়ু আলাদা হওয়ায় মানুষও ভিন্ন ধরনের হয়েছে। পরে সকলে একত্রিত হয়ে অভিন্ন হিন্দু জাতি ও হিন্দু সভ্যতার

সৃষ্টি করে। এই অভিন্নতা ইংরাজরা স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল। এটাই ইংরাজদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রধান অভিযোগ।]

তাঁর মতে ইংরাজী শিক্ষা দেশের কোন উপকার করে নি। সামান্য সংস্কৃত জ্ঞানে সমগ্র ভারত ভ্রমণ সম্ভব ছিল। সরল ও কথ্য সংস্কৃত তৈরী শুরু হয়েছিল। জাপানী ও আরবরা ইংরাজী শিক্ষা ব্যতিরেকে জ্ঞানচর্চায় অনগ্রসর নয়। পাদ্রীরা আইন ও ডাক্তারী শাস্ত্র পর্যন্ত অনুবাদ করতে আরম্ভ করে। কিছু ইং-রাজের হস্তক্ষেপে তা বন্ধ হয়ে যায়। কিছু সংখ্যক ইংরাজের সুবিধার্থে ইংরাজী ভাষার প্রচলন হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এর কুফল বুঝে বাঙলা ভাষা তথা বাঙলা সাহিত্যের উন্নয়নে সচেষ্ট হন।

সংস্কৃত ছাড়াও আন্তঃরাজ্যে ব্যবহার্য কিছু মিশ্র ভাষাও মধ্য যুগেই তৈরী হচ্ছিল। বাঙলার রাজা কেদার রায়ের রাজ্য আক্রমণ কালে মানসিংহ উভয়ের বোধগম্য এ-ধরনের এক মিশ্রভাষায় তাঁকে চরম পত্র পাঠিয়েছিলেন। "মানসিংহ বিষম সমর সিংহা প্রষাতি। সুতরাং ত্রিপুর সম বাঙালী চাকলী সকল পুরুষমেতৎ ভাগী যাও পলাপয়ী।"

বঙ্কিমচন্দ্র এ-সমস্ত উপলব্ধি করে উদাত্ত কণ্ঠে গর্জে উঠেছিলেন—"তুলে নাও তোমাদের রেলপথ ও টেলিগ্রাফের স্তম্ভ।" [বঙ্কিম রচনা দ্রঃ] উপরন্তু তিনি ইংরাজ গবেষকদের ওপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠলেন। স্নাতক হওয়ার পর তিনি পিতার আদেশক্রমে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ গ্রহণ করেছিলেন। নতুবা হয়তো তাঁর নেতৃত্বেই দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ সুরু হতো। তাঁর প্রণীত পুস্তকাবলীর মধ্যেই স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিকল্পনার বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। উপযুক্ত প্রস্তুতির অভাবে তিনি স্বয়ং উহা রূপায়িত করতে পারেন নি। উহার ছত্রে ছত্রে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রচ্ছন্ন আহ্বান উচ্চারিত। তিনি একটি জাতীয় সংগীতও সৃষ্টি করে গেছেন। পরবর্তীকালে তাঁরই প্রদর্শিত পন্থায় স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা হয়। শত সহস্র তরুণ তাঁরই সৃষ্ট "বন্দেমাতরম" ধ্বনি উচ্চারণ করে দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন আমাদের ঘোষাল পরিবারের দৌহিত্র বংশোদ্ভূত সন্তান। রায় বাহাদুর বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের পিতামহ রায়বাহাদুর কমলাপতির মাসতুতো ভ্রাতা। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত বঙ্কিম-প্রসঙ্গ পাঠে জানা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র পিতামহ কমলাপতির নিকট ইংরাজী শিক্ষা লাভ করেছিলেন। পিতামহ ফোর্ট উইলিয়ামের জুনিয়র ও সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক। রাজা দোলগোবিন্দ কর্তৃক

পরিত্যক্ত সম্পত্তি তাঁর উত্তরাধিকারী রঘুদেব ঘোষালের মাধ্যমে উভয় পরিবারে বিভক্ত হয়।

আমাদের কুলপুরোহিত তাঁর হাতে-খড়ি দেন অর্থাৎ অক্ষর পরিচয় করান। এ-জন্য তিনি তাঁকে যথেষ্ট সমীহ করে চলতেন। এই মহাপণ্ডিত নিত্য গঙ্গা স্নানান্তে বঙ্কিম ভবন হয়ে স্বগ্রাম মাদ্রালে ফিরতেন। সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান পূর্বক বঙ্কিম-চন্দ্র এবং তাঁর বন্ধুদের মুখে মুখে কবিতা শোনাতেন। একদিন তিনি অনুযোগ করে বঙ্কিমচন্দ্রকে বললেন—"আচ্ছা, বঙ্কিম! অক্ষয়, দীনবন্ধু প্রভৃতি সকলেই নানা বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। কিন্তু তুমি কোনদিন আমাকে কিছু প্রশ্ন কর না কেন?" তদুত্তরে বঙ্কিম বলেছিলেন: "ঠাকুর মশাই, আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন হবে। আচ্ছা, তাহলে আপনি এই ছত্রটির পাদ পূরণ করুন তো।

'আকাশেতে শিবা হুয়া হুয়া করে।'

পণ্ডিত মশায় তখুনি কবিতায় তার উত্তর শুনিয়ে সকলকে চমৎকৃত করে দিলেন। —জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিতে গৃহছাদে দম্পতি নিদ্রামগ্ন। হনুমান সে সময় অরণ্য সমাবিষ্ট গন্ধমাদন পর্বত স্কন্ধে আকাশপথ অতিক্রম করছেন। হঠাৎ বধূটি জাগ্রত হয়ে স্বামীকে ডেকে বলল: "ওগো শুনছ! আকাশেতে শিবা হুয়া হুয়া করে, ইত্যাদি। উত্তর শুনে বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথম তাঁর পিতামাতা ব্যতিরেকে অতিরিক্ত একজনের পদধূলি গ্রহণ করলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচ্ছন্ন ব্রিটিশ বিদ্বেষের উপর লক্ষ্য রাখার জন্য ভারতে সর্বপ্রথম গোপন নথি রক্ষা [C. C. Role] প্রথার সৃষ্টি হয়, এতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এ-কথাও লেখা ছিল যে, ঐ অসীম প্রতিভাধর পুরুষ ইংল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করলে নামী ব্যক্তি হতেন। পরে এই গোপন নথিরক্ষা প্রথা সমগ্র পৃথিবীতে গৃহীত হয়।

তাঁর জীবদ্দশাতে গ্রামাঞ্চলে আধি-ব্যাধির প্রকোপ পরিলক্ষিত হয়। রেল লাইন স্থাপনের জন্যে খালগুলির মুখ ছিল বন্ধ। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছিলেন যে এরূপ অবস্থায় বাঙালীর লাঠি বেশীদিন তাদের ধন-প্রাণ-মান রক্ষণে সক্ষম হবে না। উনি স্বগ্রাম কাঁঠাল পাড়া, সংলগ্ন গ্রাম দেউল পাড়া, কুটুম্বগ্রাম মাদ্রাল ও শ্বশুরালয় নারাণ-পুর গ্রাম চতুষ্টয়কে একত্রিত করে সেখানে একটি স্যানিটেশান কমিটি নামক সংস্থা স্থাপন করেন। পুষ্করিণী সংস্কার, জঙ্গল পরিষ্কার ও পথ ঘাটের ব্যবস্থা। সদস্যদের প্রদত্ত চাঁদায় সমাধা হতো। মাদরাল গ্রামে আমাদের বাড়িতে এর অফিস ছিল। জ্যেষ্ঠতাত রায়বাহাদুর কালিসদয় পাঠ্যদশায় এর শেষ সেক্রেটারী ছিলেন। এই

বেসরকারী কমিটির একটি বাৎসরিক রিপোর্ট পেয়ে জেলা হাকিম গভর্ণমেণ্টকে প্রতিবেদন পাঠালেন। এরই কিছুকাল পরে সমগ্র বাংলাদেশে বঙ্কিমচন্দ্র-নির্দেশিত পথে গভর্ণমেণ্ট প্রবর্তিত ইউনিয়ন কমিটিগুলি স্থাপিত হ'ল। কিন্তু এর ফলাফল সামগ্রিকভাবে শুভ হয় নি। ভোটাভুটির ফলে গ্রামে স্বতঃস্ফূর্ত নির্বাচন বাতিল হ'ল। এর দ্বারা দলাদলি বৃদ্ধি পায় ও গ্রামীণ চিরাচরিত শান্তি বিঘ্নিত হয়। কিন্তু ইউনিয়ন বেঞ্চগুলি সে-সময় এদের উপকারে আসে। তিনজন মানীগুণী ব্যক্তি অবৈতনিক হাকিম মনোনীত হতেন। প্রাথমিক বিচার সম্পর্কে তিনজন বা পাঁচজন বিচারকের একত্রে বিচারকার্য পরিচালনা প্রাচীন ভারতীয় প্রথা। তিন ব্যক্তিকে একত্রে প্রভাবিত করা সম্ভব নয়। এঁরা সম্ভবমতো মামলা মিটমাট করতে বাধ্য করাতেন। এদের বিচারের বিরুদ্ধে কম ক্ষেত্রেই আপীল হয়েছে। নগরে গ্রামে গঞ্জে পল্লীতে এগুলি পুনঃপ্রবর্তিত হলে উৎকোচ গ্রহণের পরিমাণ হ্রাস পাবে। বহুক্ষেত্রে এরা একত্রে সরজমিন তদন্ত করে সত্যমিথ্যা প্রমাণ করতেন।

[বিঃ দ্রঃ—] মৌর্যপূর্বে গ্রন্থকার বৃহস্পতির গ্রন্থে বিবৃত আছে যে ভারতে জনৈক বিচারক তিনজন মানীগুণীর সাহায্যে বিচার করতেন। উপরন্তু সেনানিবাসে সৈনিকদের বিচারের জন্য পৃথক বিচারালয় ছিল। ভারতকোষ দ্রষ্টব্য। বিচার করা অপরাধী, দোষী বা নির্দোষ বলে দিলে রাজা তাদের কম বেশী দণ্ড দান করতেন।]

[বাংলাদেশে জমিদারী শাসনকালে দু'ধরনের আদালত ছিল, যথা—গ্রাম পঞ্চায়েত বা নিম্ন আদালত এবং ভ্রাম্যমাণ ব্রাহ্মণ উচ্চ আদালত। জমিদারদের 'প্রধান দেওয়ান' শেষ আপিল শুনতেন। ইংরাজ প্রশাসকরা বিচার অধিগ্রহণ করে কিছুকাল এই ভ্রাম্যমাণ দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। পরে এরা নির্দিষ্ট স্থানে একক বিচার-পদ্ধতির প্রচলন করে বিচার-বিভ্রাটের সৃষ্টি করে। অনুপোযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এখনো সেই বিদেশী বিচার পদ্ধতি এ-দেশে পরিত্যক্ত হয় নি।]

গ্রামের স্ব-নিভর লোকেরা কিন্তু দেশে কাদের রাজত্ব চলছে তার কোন খবরই রাখতো না। গ্রামে ব্রিটিশ পুলিশ তদন্তে এলে কিম্বা কেউ ওদের আদালতে বিচারপ্রার্থী হলে সমগ্র গ্রামের অপমান বলে ধরে নেওয়া হ'ত। ব্রিটিশ পুলিশ গ্রামে এলে কোন সাক্ষী পেত না। তখনো কৃষক সমাজের একটি চিরাচরিত অভ্যাস ছিল, গ্রামীণ বিবাদ গ্রামেতেই মিটিয়ে নিতে বাধ্য করা। গ্রামীণ সমাজ তখনো শক্তিহীন নয়। কেউ আঘাত হানলে তার প্রতিঘাত করার ক্ষমতা ছিল।

গ্রাম্য সমাজ-ব্যবস্থার রদবদল না হওয়ায় বাংলা প্রদেশ-পুলিশের কোনও পরিবর্তন হয় নি। এরা কিছুটা নবাবী আমলের ঘাঁটি দখলকারী পুলিশের মতো থেকে যায়। দশ বিশ মাইল দূরে দূরে স্থাপিত ব্রিটিশ থানার জন বারো ঘাঁটি দখলকারী পুলিশ অতি অকিঞ্চিৎকর। আত্মরক্ষার জন্য গ্রামের মানুষ তাদের শরণাপন্ন হওয়া অবাস্তর মনে করতো। কিন্তু শহরগুলির ক্ষেত্রে এ-ধারণা পোষণ করা যেত না। নগর-পুলিশ ক্রমান্বয়ে জটিল হয়ে ওঠে। কেউ শহরে এলে বুঝতে পারতো যে তারা পরাধীন জাতি। গ্রামীণ সমাজে পুলিশের কোনও প্রয়োজন ছিল না। তারা বিনা পুলিশে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম ছিল।

গ্রামীণ পুলিশ

চৌকিদার ও দফাদার প্রভৃতি গ্রামীণ পুলিশ নামে অভিহিত হ'ত। জমিদারদের পুলিশী ব্যবস্থা ব্রিটিশরা ভেঙে দিলেও চৌকিদারদের বহাল রাখে। ওরা স্থানীয় লোক হিসেবে গ্রামবাসীদের সমীহ করে। স্থানীয় ইউনিয়ন কমিটিগুলি এদের সামান্য বেতন দিত। কিন্তু ঐ চৌকিদার ও দফাদারগণ থানা ইন্‌চার্জদের হুকুম শুনতে বাধ্য। সমগ্র ভারতের পরিসংখ্যান তৈরির ভার এরা নেয়। এদের প্রেরিত পরিসংখ্যানের ওপর নির্ভর করে রাষ্ট্রীয় ভাবনা নির্ধারিত হ'ত। বরং উচ্চ বেতন, ভোগী রাজপুরুষদের সংগৃহীত পরিসংখ্যান বিশ্বাসযোগ্য হ'ত না। এজন্য ওদের উপহাস করে নিম্নোক্ত গণ-গল্পটির সৃষ্টি হয়।

"কোন এক জেলা হাকিমের ওপর তার এলাকার গাধার সংখ্যা নিরূপণের হুকুম হ'ল। কিন্তু ঐ পরিসংখ্যান পাঠানোর তারিখে ইংরাজ সাহেবের এ-কথা স্মরণে এলো। কৈফিয়ৎ এড়াতে উনি তার হেড ক্লার্কের শরণাপন্ন হলেন। ঐ হেড ক্লার্ক দশ মিনিটে সমগ্রে জেলার গাধার সংখ্যা তাঁকে জানালেন এবং বললেন, 'গত সেনসাসে (Census) ধোপার সংখ্যা এত ছিল। ওদের মধ্যে ত্রিশ শতাংশ ধোপার গাধা না থাকার কথা। বাকি সত্তর শতাংশ ধোপার গাধার সংখ্যা এত হবে।' সাহেব এতে খুশী হয়ে তাঁর ঐ হেড ক্লার্ককে বলেছিলেন, 'চমৎকার!' তারপর উনি নিজের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন—'এ্যাড্ এ্যানাদার'। অর্থাৎ আমিও আর একটি গাধা। এমন সহজ পন্থাটি তাই বুঝতে পারি নি।"

প্রতি সপ্তাহে একদিন চৌকিদার থানায় এসে নিজ নিজ গ্রামের জন্ম মৃত্যু, জনসংখ্যা, উল্লেখ্য ঘটনা ও শস্য উৎপাদনাদির সংবাদ জানাতো। এদের প্রদত্ত পরিসংখ্যানের ওপর নির্ভর করে বহু সরকারী পলিশি নির্ধারিত হয়েছে। লাটসাহেবের স্পেশাল ট্রেন পাহারা দেবার জন্যে এদেরকে দিবারাত্রি রেল লাইনের

ধারে থাকতে দেখা গেছে। এর জন্যে এদের অনেকে সর্প দংশনে বা ব্যাঘ্রের আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছে। কেউ কেউ তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থার জন্য ট্রেনের দ্বারা চাপা পড়েছে। এভাবে এদের বাৎসরিক ভাগ্য নির্ধারিত হত।

[তৎকালে গভর্ণর তথা লাটবাহাদুররা প্রায়ই কলকাতা থেকে নদী পথে ঢাকা পরিদর্শনে যেতেন। বাংলা পুলিশের দারোগাবাবুদের সফরের আগে মাসাধিক-কাল নিরাপত্তা নিরূপণের জন্য ষ্টিমারে কিংবা বোটে সুন্দরবনের জলপথে ঢাকা থেকে কলিকাতা যাতায়াত করতে হত]

দিনের বেলা চৌকিদার'রা নিজ নিজ গ্রামের শস্য পাহারা দিত; গ্রামের ছাড়া গরু খোঁয়াড়ে দিয়ে সরকারের আয় বাড়াতো। রাত্রে চোর-বাতি হাতে এরা গ্রাম পাহারা দেওয়ার সময় চিৎকার করে বলতো—"ছোট বাবু! জাগলো-হো-ও-ও। ও ভট্টাচার্যমশাই! আপনি জেগে আছেন? ভয় নেই বাবু! আমরা পাহারায় আছি।" ওরা জমিদারী পুলিশে থাকাকালে নীলে ডোবানো পোশাক পরতো। এখনো তারা সেই নীল রঙা পোশাক পরে। আজও ওদের সেই আগেকার হাঁক ডাক আছে।

রেল প্রভৃতি যানবাহনের উন্নতির ফলে প্রদেশ-পুলিশের দক্ষতা সম্ভবত বেড়ে যায়। এতে মূল কেন্দ্রের সঙ্গে জেলাগুলির যোগাযোগ সহজ হয়। তার ফলে গ্রামীণ পুলিশের স্ব-নির্ভর বিকেন্দ্রিত চরিত্র ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হল। প্রদেশের অভ্যন্তরে তারা বহুকাল অশ্ব, নৌকা বা পদযাত্রাকেই যাতায়াতের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে। ওদের পুলিশী পোশাক ছিল খাকী হাফ্ প্যাণ্ট ও সোলার হ্যাট। কলিকাতা পুলিশদের যানবাহনের অসুবিধা ছিল না। বাংলা পুলিশকে একটি ঘোড়া এবং কলিকাতা পুলিশকে একটি সাইকেল দেওয়া হ'ত। উপরন্তু কলি-কাতার পুলিশদের জমকালো য়ুনিফর্ম ছিল।

কলিকাতা শহরে উল্লেখ্য রাজপথের সংযোগগুলিতে ফিক্স্‌ড পয়েন্ট [Fixed point] কনস্টেবল কোমরে ব্যাটনসহ ডিউটি দিত। অধিকন্তু রাত্রে দুটি ফিক্সড পয়েন্টের মধ্যবর্তী পথে দুজন সিপাই পদচারণা করত। বিটগুলির অলিগলিতে কিছু সিপাহী ঘোরাফেরা করত। প্রয়োজনে একজন অন্যজনকে হাঁক দিত—"জুড়িদার হো!" বড় রাস্তার প্রত্যেক দোকানের তালা তারা টেনে পরীক্ষা করত। গভীর রাত্রে জেগে উঠে লোকে শুনতে পেত টহলদারী শান্ত্রীর ভারী বুটের শব্দ। অন্যদিকে তাদের অফিসাররা সারারাত পালা করে বিটে বিটে রাউণ্ড দিয়েছে ও তাদের পকেটবুক চেক করে সই দিয়েছে। জমাদারগণ প্রায় পল্লীর ঝগড়া-বিবাদ মেটাতো। লাল পাগড়ী ও শ্বেত পোশাক পরা যষ্টিধারী

সিপাইদের বেল্ট বা পেটী ছিল গর্বের বস্তু। কেউ সাসপেণ্ড হলে তাকে তাদের ঐ নম্বর যুক্ত বেল্ট খুলে দিতে হ'ত। এই সুন্দর পাহারার ব্যবস্থা স্বাধীনতার কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। প্রয়োজন হলে লোকে বিট থেকেও সিপাহীদের ঘটনাস্থলে ডেকে নিয়ে যেত।

কলিকাতা শহরের তৎকালীন আরও কয়েকটি সুদৃশ্য অধুনা অন্তর্হিত। প্রতিটি বিকেলে একদল কর্পোরেশন কর্মী লম্বা পাইপযোগে পথিপার্শ্বে হাইড্রেনগুলি থেকে জল তুলে সমগ্র পথ ধৌত করে ধূলি মুক্ত করত। ঐ সকল কর্মী এবং হাইড্রেনগুলি এখন কোথায়? পথের ধারে দমকল ডাকার টেলিপোস্ট বসানো ছিল। কোথাও আগুন লাগলে লোকে ওদের মুখের কাঁচ ভেঙে ভিতরের হ্যাণ্ডেল ঘোরাতো। পথের গ্যাস-বাতি জ্বালানোর জন্য কর্মীদের মই ঘাড়ে ছোটাছুটি নিত্যকার দৃশ্য ছিল। পোর্ট কমিশনারের মতো কলিকাতা কর্পোরেশনেরও ময়লা ফেলার জন্যে নিজস্ব রেলপথ ছিল। লোক জাগার আগে ঐ গাড়ি ময়লা নিয়ে ধাপার পথে পাড়ি দিত। ওদের পরিপূরক ঘোড়ায় টানা ময়লার গাড়ি-গুলোর বিকল হবার সম্ভাবনা ছিল না। ওগুলোর পুনঃপ্রবর্তনের বিষয় ভেবে দেখা উচিত। রাস্তা ঘাটের সংখ্যা প্রায় একই আছে। এদের ট্যাক্স (tax) বিশ গুণ বেড়েছে। তৎকালে ভদ্রনারীরা জানলার খড়খড়ি তুলে ঘোড়ার গাড়িতে যাতায়াত করত। পুরুষের অবর্তমানে গৃহতল্লাসীর কাজ সাধারণতঃ এড়িয়ে যাওয়া হ'ত। নিতান্ত প্রয়োজনে পুরুষের সাহায্যে পুলিশ মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেছে। মহিলাদের সাক্ষী বা আসামীরূপে আদালতে নেওয়া হ'ত না। হিন্দুনারীর এবং দেবতার সম্মান রক্ষণে ইংরাজ রাজপুরুষরা তখনো তৎপর ছিল। এ-দুটি গুণের জন্য ওদের জনপ্রিয়তাও ছিল অপরিসীম।

কলিকাতা

পশ্চিম ভারতে ও অন্যত্র কানপুর, লক্ষ্ণৌ, মিরাট, এলাহাবাদ, আগ্রা, বেনারস, পাটনা, রাঁচী, গয়া প্রভৃতি প্রতিটি শহরই সর্ব বিষয়ে কেউ কারও চেয়ে ছোটো বা বড়ো নয়। এজন্য এদের চারপাশের গ্রামগুলি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে লাভবান হয়েছে। কিন্তু রাঢ় বঙ্গের দুর্ভাগ্য এই যে কলকাতা একটি মাত্র বৃহৎ নগর। চতুষ্পার্শ্বের গ্রামগুলির রক্ত শোষণ করে এই বিরাট মহানগীর সৃষ্টি হল। এতে লাভ অপেক্ষা সেখানে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতির পরিমাণই বেশী। বহিরাগতদের খাদ্য ও অর্থ যুগিয়ে সাধারণ বাঙালী নিঃস্ব হল।

ইংরাজদের প্রথম দেওয়ান গোবিন্দরাম তৎকালীন কলিকাতা নগর রাষ্ট্রে তাঁর তিনজন নায়েব দেওয়ানের অধীনে স্থল ও জল পুলিশ, বিচার ব্যবস্থা ও পৌরসভা

গড়ে তোলেন। অবশ্য ইউরোপীয়দের বিচার ব্যবস্থা যথাক্রমে বণিকদের এজেন্ট ও প্রেসিডেন্ট ও পরে কলিকাতার গভর্ণরের দ্বারা সমাধা হতো। পরে কলিকাতায় প্রেরিত ইংরাজ মেয়র ও তাঁর অলডারম্যানরা ইংরাজদের বিচারের ভার নেন। ঐ সময়ে কলিকাতাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৌরসভা কেন্দ্রীয় পৌরসভার অধীনে থানা ওয়ারী ভাবে বিকেন্দ্রিত ছিল। প্রতিটি পল্লী তার থানা, পুলিশ, বিচার ও পৌরসভা সংক্রান্ত ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। আজও কলিকাতার প্রেসিডেন্সী হাকিমরা থানা পুলিশে নথি পাঠানোর সময় লিখে থাকেন—'A'-টাউন বা 'B' টাউন টু এনকোয়ার। 'A' টাউন অর্থে শ্যামপুকুর থানা। 'B' টাউন অর্থে জোড়াবাগান থানা। ঐ ভাবে আজও বিভিন্ন টাউন অর্থে 'C' = বটতলা, 'D' = বড়বাজার, 'E' = জোড়াসাঁকো, 'F' = আমহার্স্ট স্ট্রীট, K = পার্ক স্ট্রীট প্রভৃতি থানাকে বোঝানো হয়। অবশ্য এগুলির সঙ্গে যোগাযোগের জন্য উর্ধ্বতনদের অধীনে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি ছিল। সর্ববিষয়ে বিকেন্দ্রিত প্রশাসন প্রাচীন ভারতীয় প্রথা। তৎকালে থানা, পুলিশ, অগ্নিনির্বাপণ, পশু নিধন ও ধ্বতিকরণ বিচার ব্যবস্থা প্রায় অভিন্ন ছিল। এ বিষয়ে এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে]

পলাশীর যুদ্ধের পর কলিকাতা সহ সমগ্র বাংলার প্রশাসন লর্ড ক্লাইভের প্রধান দেওয়ান রাজা নবকৃষ্ণ-র অধীন হয়। যুদ্ধকালে পলাতক ইংরাজ মেয়র ও তাঁর অল্ডারম্যানগণ ফিরে এলে সমগ্র বাংলার শাসক দেওয়ান নবকৃষ্ণের অধীনে নিযুক্ত হন। কলিকাতার পুলিশের বিচার ও পৌরসভা এঁদের অধীনস্থ হলেও প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রাজা নবকৃষ্ণের হাতে থাকায় ওঁরা অনাচারী হন নি। কিন্তু বাংলার প্রধান দেওয়ান মহারাজা নবকৃষ্ণের বিদায়ের পর ওঁরা অত্যাচারী হলেন। গণ-বিক্ষোভের ফলে ওদের বিদায় নিতে হয়েছিল। ওঁরা বিদায় নিলে কলিকাতা পুলিশ, বিচার ও পৌরসভা জনৈক ইংরাজ চেয়ারম্যান ও তাঁর সহকর্মীদের তদারকিতে একটি কনসারভেন্সীর অধীন হ'ল। চব্বিশ পরগণার জমিদারী ও তার পুলিশ অধিগৃহীত হলে চব্বিশ পরগণার মতো কলিকাতা শহরকেও একটি ম্যাজিস্ট্রেটের অধীন করা হ'ল। এই ম্যাজিস্ট্রেটের নিয়ন্ত্রণে 'জাষ্টিস অব্ পিস'-দের তিনটি সংস্থার অধীনস্থ পুলিশ, বিচার ও পৌরসভা থাকে। পরে পৃথক পৃথকভাবে ম্যাজিস্ট্রেটদের অধীনে বিচার বিভাগ, জনৈক চেয়ারম্যানের অধীনে কলিকাতা করপোরেশন এবং পুলিশ কমিশনরের অধীনে কলিকাতা পুলিশ নির্দিষ্ট হয়। এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে এ-বিষয়ের ধারাবাহিক বিষদ বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে।

[বি. দ্র.—বাঙালী জমিদার তথা ভূঁইয়া শাসকদের ফৌজ লর্ড ক্লাইভ বাতিল করে দিয়েছিলেন। তাদের বিচার-ব্যবস্থা লর্ড হেষ্টিংস এবং তাদের জাতীয় পুলিশ লর্ড কর্নওয়ালিশ রহিত করেছিলেন। এইভাবে ধীরে ধীরে বাঙালীদের সম্পূর্ণ পরাধীন জাতিতে পরিণত করা হয়।]

ট্রাফিক পুলিশ

কলিকাতায় প্রথম স্থল ও জল পুলিশের স্রষ্টা বাবু গোবিন্দরাম। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে শহরে পৃথক ট্রাফিক পুলিশ না থাকায় ঐ সময় থানা পুলিশই স্ব স্ব এলাকায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করত। প্রধানতঃ ঘোড়ায় টানা ট্রামই তৎকালে শহরে পরিবহণের কাজে ব্যবহৃত হ'ত। ধর্মতলার মোড়ে গাড়ির অস্ট্রেলিয়ান হর্সগুলি বদল করা হ'ত। ঐ সঙ্গে কিছু পুস্-পুস্ (Push) যান, ঘোড়ার গাড়ি, স্টেজ-ক্যারেজ ও পালকী ছিল।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড থেকে ৫০টি মোটরকার কলকাতায় আমদানি হ'ল। কিছু পরে ঘোড়ায় টানা ট্রাম প্রথমে বাষ্পচালিত হয়। শহরে ইলেকট্রিক ট্রামের প্রচলন হয় অনেক পরে। গ্যাসবাতির আলো ম্যাণ্টেল যুক্ত করে আরো উজ্জ্বল হ'ল। ক্রমশঃ শহরে বৈদ্যুতিক পাখা ও আলোর ব্যবহার হতে থাকে। পুলিশের থানাগুলিতে রেড়ীর তেলের প্রদীপ উঠে গেল। তার জায়গায় গ্যাসবাতি ও ইলেট্রিক হ'ল। উচ্চশ্রেণীর লোকদের বাড়িতে ঝাড় লণ্ঠনের বদলে ইলেক্‌ট্রিক এ'ল। তাঁদের কক্ষস্থিত টানাপাখাগুলির স্থান অধিকার করল বৈদ্যুতিক পাখা। কলের জলের কল্যাণে গৃহস্থ বাড়িগুলির মতো থানার পাতকুয়াগুলি বুজিয়ে ফেলা হয়। ইলেক্‌ট্রিক ট্রাম সম্পর্কে নিম্নোক্ত গাল গল্পটি ঐ কালে রচিত হয়েছিল :—

'চারজন মদ্যপ ধনী তরুণ ঘোড়ার বগী গাড়ি করে বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টিতে ঐ গাড়ির চাকা চারটি ট্রামের দুটি লাইনে আটকা পড়ে বসে গেল। ও-দিকে বল্গা ছিঁড়ে গাড়ির ঘোড়াটিও গড়ের মাঠে দৌড় দিয়েছে। সহিস ও কোচ-ম্যান তাকে ধরবার জন্যে মাঠে নামল। মদ্যপ তরুণ চতুষ্টয় নীচে নেমে গাড়িটি ঠেলতে থাকে। কিন্তু গাড়ি এগোয় না একচুলও। এক বৃহৎ টিকি তথা শিখা-ধারী ব্রাহ্মণ নামাবলী গায়ে চৌরঙ্গীতে হাঁটছিল। ঐ চার মাতাল তাকে বল-পূর্বক গাড়ির ছাদে তুলে দাঁড় করাল। অতঃপর তারা ব্রাহ্মণের মস্তকের শিখাটি ওপরে ঝোলানো ট্রামের ইলেকট্রিক তারে ঠেকাতে চেষ্টা করল। তাদের ধারণা, ছাদে দণ্ডায়মান ব্রাহ্মণের শিখাটি ট্রামের বৈদ্যুতিক তারে ঠেকালে ঐ গাড়ি

ট্রামের মতো চলবে। প্রহরারত পুলিশ ব্রাহ্মণের পরিত্রাহী চিৎকারে ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে।

খৃষ্টান পাদ্রীরা ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে তৎপর হ'ল। নব সৃষ্ট ব্রাহ্মধর্মের দ্বারা প্রভাবিত না হলে শিক্ষিত ধনীরা খৃষ্টান হ'ত। অন্যদিকে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে অনেকে মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়। ফলে থানায় পেটি কেসের সংখ্যা বেড়ে যায়। এর প্রতিবাদ স্বরূপ নিম্নোক্ত গল্পগল্পটির সৃষ্টি হয়।

'এক জমিদারের ইংরাজী শিক্ষিত পুত্র স্বগৃহে মদ্যপান সুরু করল। জমিদার প্রমাদগুণে তাঁর কুলগুরুকে পুত্রের সংশোধনার্থে গৃহে আনলেন। ঠিক হ'ল পুত্র মদ্যপান ত্যাগ করলে উনি এক সহস্র মুদ্রা পাবেন। লোভাসক্ত ব্রাহ্মণ তাকে নানা শাস্ত্রের বাণী শুনিয়ে মদ্যপানে বিরত করাতে চাইলেন। শেষ পর্যন্ত তাকে পায়ে ধরে সাধলেন। ঐ তরুণ কুলগুরুর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাঁর সঙ্গে শর্ত করলেন—গুরুদেব তিনদিন তিনরাত তরুণের গৃহে বসে মদ্যপান করলে তিনি মদ্য পান ত্যাগ করবেন। ঐ তরুণ মদ্যপান থেকে বিরত হলেও গুরুর পক্ষে পান-পাত্র ত্যাগ করা সম্ভব হয় নি।

স্যার সুরেন্দ্রনাথ

বৃহৎ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথ পুরোভাগে এসে নেতৃত্ব দেন। সিভিলিয়ান বৃত্তিতে ইস্তফা দিয়ে তিনি দেশবাসীর মাঝখানে ঋজু বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে এসে—উদাত্ত কণ্ঠে গর্জে উঠলেন, 'আই উইল সেক্ দি ফাউণ্ডেসন অব ব্রিটিশ এম্পায়ার,' অর্থাৎ 'আমি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মূল ভিত্তি নড়াবো।' তাঁর হাত থেকে 'নেশন ইন মেকিং' গ্রন্থটি নেওয়ার সময় মহাত্মা গান্ধী স্বীকার করেছিলেন যে, বাল্যে ও যৌবনে তাঁর বক্তৃতা পাঠে তিনি দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হন। অসহযোগ ও সশস্ত্র বিপ্লব দু'টিই বঙ্কিমচন্দ্র প্রদর্শিত পন্থা ছিল। ক্রমে বিলাতী বস্ত্র বর্জন ও দহন এবং ইংরাজ পীড়ন শুরু হ'ল। আমি বিচিত্রা সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর মুখে শুনেছি যে, একদিন সুরেন্দ্রনাথ সংবাদ শোনার জন্যে সবন্ধু এক স্থানে অপেক্ষা করছিলেন বঙ্গভঙ্গ রদের সঙ্গে খবর এল যে, রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হ'ল। উপরন্তু বাংলার উল্লেখ্য অংশ বিহার ও আসামের অন্তর্ভুক্ত। এই বার্তা শুনে সুরেন্দ্রনাথ ব্যাকুল হয়ে 'হায় হায়' করে উঠেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বুঝলেন, তাঁদের সংযত হয়ে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হবে। সম্মুখের পঞ্চাশ বছরে কি ঘটবে তা বুঝতে পারা ব্যক্তিরাই প্রকৃত রাজনীতিবিদ,

উনি বুঝেছিলেন যে, সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির দ্বারা ব্রিটিশ বাংলাকে পঙ্গু করে দেবে। এজন্য সাময়িক ভাবে রাজ-নীতিতে মধ্যপন্থা দ্বারা সম্ভব মতো ক্ষমতা করায়ত্ত করা দরকার। কিন্তু উগ্রপন্থীরা তা না বুঝে তাঁর নেতৃত্বকে অস্বীকার করে বাঙালী হিন্দুদের চরম দুর্দশা ঘটায়। তিনি বুঝেছিলেন যে, অর্ধসংখ্যক জনগণের দ্বারা প্রকাশ্য বিদ্রোহ সহসা ফলপ্রসূ হবে না। তাঁরই প্রচেষ্টায় নতুন কর্পোরেশন আইনে কংগ্রেসীরা কর্পোরেশন দখল করেন। কিন্তু অকৃতজ্ঞ বাঙালীরা তাঁকে ভোট পর্যন্ত দেয় নি। বাঙালীরা চোখের জলে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে। তিনি ধৈর্য সহকারে উপযুক্ত সময়ে অগ্রসর হওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় ভারতকে কিছু ক্ষমতা ইংরেজরা হস্তান্তরিত করে। দ্বৈতশাসনের মন্ত্রীরূপে কলিকাতার মেয়র পদটি তিনি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন।

বঙ্গভঙ্গ রদের পূর্বে ব্রিটিশ সুরেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত স্বদেশী আন্দোলনকে প্রচণ্ড দাপটে দমন করেছিল। কিন্তু তার ফল তাদের পক্ষে শুভ হয় নি। প্রকাশ্য আন্দোলন বঙ্কিমের পরিকল্পনা মতো গুপ্ত সশস্ত্র আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে অনতি-বিলম্বে। সে-সময় উহা প্রস্তুতির পর্যায়ে থাকলেও বেশ কিছু পরে তার ক্ষমতা বোঝা যায়।

[লালবাজারে তখন কেবল পূর্ব ও উত্তর দিকের বিল্ডিং দুটি ছিল। প্রাচীর ঘেরা প্রশস্ত প্রাঙ্গণে পুলিশ ও দমকলের প্যারেড হ'ত। লর্ড কারমাইকেল অশ্বারোহণে এসে ঐ প্যারেড দর্শন ও স্যালুউট গ্রহণ করতেন। এর বহু পরে পশ্চিম দিকের বিল্ডিং তৈরী হয়।]

সংযুক্ত তথা সুবা বাংলায় পুলিশ ট্রেনিং কলেজটি প্রথমে ভাগলপুরে ও পরে রাঁচীতে ছিল। সেখানে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার কর্মীদের সাথে কলকাতার পুলিশদেরও একত্রে ট্রেনিং দেওয়া হ'ত। উর্ধ্বতন পুলিশকর্মীদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাও একই সঙ্গে ছিল। নিম্নপদী দেশীয় ইন্‌স্পেক্টরদের উপর উচ্চপদী ইংরাজদের শিক্ষা হলেও উভয়ের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের হেরফের হয় নি। এ-সম্পর্কে তৎ-কালে মধ্যপদী অফিসারদের দ্বারা বানানো একটি গণ-গল্প নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

'এক দেশীয় রাজ্যের রাজপুত্রকে শিক্ষাদানের জন্য গুরুমশাই নিযুক্ত হলেন। রাজ-পুত্র রাজছত্রের তলায় সিংহাসনে সমারূঢ় হয়ে পা দোলাতেন। গুরুমশাই নিম্নে হাঁটু গেড়ে বসে করযোড়ে তাঁকে বলতেন, 'মহারাজ, 'ক' বলিতে আজ্ঞা হউক।' দেশীয় অধীনকর্মীদের দ্বারা উচ্চপদীদের পড়ানো ঐ-রকমই হ'ত।

[কিন্তু এতে খুব ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল না। কোন এক অনগ্রসর শ্রেণীর তরুণ দৈবাৎ

গ্র্যাজুয়েট হয়। গভর্ণমেণ্ট ভেবেই পায় না, তাকে কি পদ দেওয়া হবে। প্রথমে তাকে এক সরকারী কলেজের অধ্যাপক করা হ'ল। অনতিবিলম্বেই সব দিক থেকে তার অক্ষমতা প্রমাণিত হ'ল। তখন তাকে কর্তৃপক্ষ ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট করলেন। হাইকোর্ট থেকে পুনঃ পুনঃ ষ্ট্রিকচার হলে তাকে পুলিশ সুপার করা হ'ল। তখন তার কাজ হ'ল চিবিয়ে চিবিয়ে ইংরাজী বলা, শিকার ও ভ্রমণ করা এবং কয়েকটা টাইপ করা কাগজে সই করা। এবার আর চাকুরী রক্ষার অসুবিধা নেই। সাধারণতঃ বলা হ'ত, দেশীয় ধনীদের মূর্খ পুত্র সাব রেজিস্ট্রার ও ইংরাজ ধনীদের মূর্খ পুত্র পুলিশ সুপার হয়। অবশ্য এখানে মূর্খ বলতে অল্পশিক্ষিত।]

[বিঃ দ্রঃ—সাম্রাজ্য রক্ষা ও স্বজন পোষণের জন্য পুলিশ এদেশে তিনটি অর্ডার অফ্ সার্ভিস তৈরি করেন। যথা—(১) অল ইণ্ডিয়া তথা ইমপিরিয়াল (২) প্রভিন্সিয়াল সার্ভিস (৩) সাব অর্ডিনেট সার্ভিস। ভারত ব্যতীত অন্য কোথাও এ ধরনের কর্ম-বিভেদ নেই। অন্যত্র সমগ্র পুলিশ মাত্র পুলিশ অফিসার ও পুলিশম্যানে বিভক্ত। একই রূপ শিক্ষা-দীক্ষা ও বংশ গরিমার ব্যক্তিদের এ-ধরনের শ্রেণী বিভাগ নিরর্থক ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ইউরোপীয় তরুণদের উচ্চপদ দেবার জন্যই এই নিয়ম সৃষ্টি হয়।]

বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পরে বিহার উড়িষ্যা থেকে বিচ্ছিন্ন নতুন বাংলাদেশ সৃষ্টি হ'ল। তখন বাংলা প্রদেশ পুলিশের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হ'ল পদ্মাপারে সারদাতে এবং কলকাতা পুলিশের প্রশিক্ষণ শিবির হ'ল পূর্বতন ডুলাণ্ডা গ্রামের পাগ্‌লাগারদ ডুলাণ্ডা হাউসে।

বিঃ দ্রঃ—মোটর ভিহিক্যাল ও হ্যাকনিক্যারেজ ডিপার্ট তখনো কলিকাতা পৌরসভার অধীনে ছিল। ওঁরাই গাড়িগুলি রেজিস্ট্রেশন করতেন এবং আয়ের জন্যে লাইসেন্স ফিস্ গ্রহণ করতেন। পরবর্তীকালে কতিপয় পৌরপিতা এঁদের বন্ধুবর্গ বহু লাইসেন্স ফিস্ বাকি রাখেন। ফলে অন্য নাগরিকরাও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। পৌরকর্মীরা লক্ষ লক্ষ টাকা ফিস্ আদায় করতে অনিচ্ছুক বা অক্ষম। বাধ্য হয়ে গভর্ণমেণ্ট করপোরেশনের কাছ থেকে মোটর ভিহিক্যাল ও হ্যাক্‌নিক্যারেজ ডিপার্ট অধিগ্রহণ করে সেগুলির ভার কলিকাতা পুলিশের হাতে অর্পণ করেন। কলিকাতা করপোরেশন তার আয়ের একটা প্রধান অংশ থেকে বঞ্চিত হ'ল। অবশ্য পূর্বের মতো গরুর গাড়ি ও ঠেলা গাড়ির লাইসেন্স কর্পোরেশনের অধীনেই থাকে।

[এ-সময় বর্তমান বাংলার স্রষ্টা ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে পুলিশী কর্মকৃত্যের

একটি সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তখন ডাক্তার বিধানচন্দ্র কিছুদিন কলিকাতা পুলিশ ট্রেনিং কলেজে ফার্স্ট এইড্ পড়াতেন। লর্ড কিচনারের বাঙালী ড্রাইভারকে তিনি নিজ ড্রাইভার রূপে গ্রহণ করেন। পরে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দান করলেও স্বাধীনোত্তর বাংলায় তিনি পুলিশেরই ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হন। কলিকাতা কর্পোরেশনের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন।]

স্বদেশী আন্দোলন দমনের জন্য ইউরোপীয় কনস্টেবলদের সার্জেন্ট পদ দেওয়া হ'ল। ওদের সংখ্যা বাড়িয়ে দেশীয় মধ্যপদী অফিসারদের সমান করা হ'ল। বর্ণবিদ্বেষ বাড়াবার জন্যে দৃশ্যতঃ তাদের অধিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। অথচ এদের প্রায় সকলেই অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত ছিল। সামঞ্জস্য বিধানের জন্য দেশীয়দের ইন্‌ভেস্টিগশন স্টাফ ও এ্যাংলোদের নন-ইন্‌ভেস্টিগেশন স্টাফ্ নামে অভিহিত করা হয়। ইউরোপীয় ও এ্যাংলো সার্জেন্টদের রিভলবার থাকলেও দেশীয় কনস্টেবল ও অফিসারগণ তা থেকে বঞ্চিত হলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েও থানায় লাঠি ছাড়া অন্য অস্ত্র ছিল না। সার্জেন্টদের মূল দলটিকে লালবাজারের হেড কোয়ার্টার্সে রাখা হয়। তবে প্রত্যেক থানায় একজন করে সার্জেন্ট বহাল হ'ল। সেখানে তাদের পদমর্যাদা হেডকনস্টেবল ও A- S- I-দের উপরে এবং দেশীয় সাব ইন্‌সপেকটরদের নিম্নে। বহু থানার ইন্‌চার্জ অফিসার এবং সাব ইন্‌সপেকটরগণ এ্যাংলো ও ইউরোপীয় ছিলেন।

থানায় নিযুক্ত এ্যাংলো সার্জেন্টদের অন্যতম কাজ ছিল কনস্টেবল ও হেডকনস্টেবলদের খবরদারী করা ও রাজপথের বেওয়ারিশ কুকুরদের বিষ প্রয়োগে হত্যা করা। এজন্য ওদের প্রতি সপ্তাহে কিছু হালুয়া ও বিষ যোগানো হতো। নাগরিকদের কুকুর কামড়ালে ঐ কুকুরসহ দুই সপ্তাহ ডেপুটিদের নিকট হাজিরা দিতে হ'ত। উদ্দেশ্য, কুকুরের দাঁতে বিষ ছিল কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। কুকুর-দংশিত লোকদের চিকিৎসা করানোর সকল দায়িত্ব তখন কলিকাতা পুলিশের। দেশীয় অফিসারদের ওপর গোপনে এদের কেউ কেউ লক্ষ্য রাখতো এবং তাদের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী ভাব দেখলে তারা ইংরাজ ঊর্ধ্বতনদের সংবাদ দিত। ফলতঃ প্রমোশনে বাধা কিম্বা মন্দ স্থানে বদলীর ব্যবস্থা হ'ত। কাশীপুর ও গার্ডেনরীচ থানা দুটি তখন পানিশমেন্টের স্থান। ওখানে বদলী হলে বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে যেত।

বাংলায় রেঁনেসাঁসের যুগ শেষ হয়ে গিয়েছিল/। এ-সময় দেশে একটা সন্ধিক্ষণ চলেছে। দিকে দিকে অধঃপতন ও আত্মধ্বংসী রাজনীতি। পূর্বে বড়ো সাহেব বলতে বাঙালীকে বোঝাতো। ইংরাজরা রাজ্য জয় করলে তা চালানোর ভার

বাঙালীর। সমগ্র ভারতে ও বহির্ভারতে বাঙালীরা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। বাঙালীরা যেখানে গেছে সেখানে তারা কালীবাড়ি ও স্থানীয় লোকদের জন্যে লাইব্রেরী ও নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করবেই। তাদের জনহিতকর কার্যগুলি ইংরেজদের জনপ্রিয় করে তোলে। কিন্তু মুলুকী আইনে তৎপ্রদেশ থেকে ধীরে ধীরে দেশে ফিরে বাঙালী দেখল, যে তাদের পরিত্যক্ত বাণিজ্য অপরের কুক্ষিগত। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর ইংরাজরা চাইল বাঙালীর ধ্বংস।

এ-সময় নবীন ইংরেজদের মধ্যেও অধঃপতন প্রকট হয়ে ওঠে। তাদের পূর্বপুরুষরা দেশীয়দের গৃহে বিবাহে, উপনয়নে, অন্নপ্রাশনে ও পূজাপার্বণে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতো। ছোটলাটবাহাদুর পর্যন্ত হঠাৎ রবিবারে বাঙালী ছাত্রদের মেসে এসে কথাবার্তা বলতেন। পরদিন সংবাদপত্র পাঠে জানা যেত ছাত্রদের মেসে হঠাৎ আসা সাহেব আসলে ছোট লাট। পাদ্রীরা সাইকেলে চড়ে গ্রামে গ্রামে বালকদের লজেন্স দিয়েছে। কিন্তু নবীন ইংরাজদের পৃথক বসবাস ও দেশীয়দের সংসর্গ ত্যাগ তাদের মানসিক অনুদারতাকেই প্রকট করে। দেশীয়দের প্রতি তাদের অবজ্ঞা ও দম্ভভাব অসহনীয় হয়ে ওঠে। ওদের ব্যবহার কিভাবে শিশুমনকে পর্যন্ত কলুষিত করেছিল তা আমার নিজেরই শৈশব স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত করে বোঝাতে পারবো।

'দিল্লীতে কোন এক বড়লাট বি[illegible]বীদের বোমা থেকে অল্পের জন্যে বেঁচে গেলেন। এজন্যে উৎসব উপলক্ষে ইংরা[illegible] ও দেশীয় রাজপুরুষদের শিশুরা লাটভবনে নিমন্ত্রিত হ'ল। অন্য শিশুদের সঙ্গে আমিও সে-উৎসবে উপস্থিত ছিলাম। টবের ভেতর কাঠের কুচির মধ্যে লুকানো চকোলেট তোলার সময় ইংরাজ শিশুদের সঙ্গে হুটোপাটি শুরু হ'ল। ওরা ঘুসিতে দক্ষ হলেও চড়ে কাবু। পরদিন ঐ অভিযোগে দেশী অফিসারদের পুত্রদের ওখানে যাওয়া নিষেধ হয়ে গেল। বাড়িতে পিতামহ জ্যেষ্ঠতাতকে অনুযোগ করে বললেন, 'ছোটরা ওরকম কত মারপিট করে থাকে তার জন্যে তোকে কৈফিয়ত দিতে হবে কেন? ফরাসী, ওলন্দাজ ও দিনেমাররা তো ওরকম ছিল না; বাঙালীরা ওদের তক্তে বসাল। দেখিস, ঐ বাঙালীরাই ওদের বিদেয় করবে।'

'বড়লাট শোভাযাত্রাসহ রেসকোর্সে আসবেন। তাঁকে দেখবার জন্যে ইংরেজ বালকদের সঙ্গে আমরাও রেলিঙের ওপর চেপে বসলাম। হঠাৎ এক দেশীয় কনস্টেবল তেড়ে এসে বলল: 'উতারো'। আমরা ইংরেজ বালকদের দেখালে সে খেঁকিয়ে উঠে বলল: 'উ লোককো রাজ হ্যায়। তুহোর কি রাজ আছে?' দূরে এক এ্যাঙলো সার্জেন্ট রুলের গুঁতো মেরে দেশীয় লোক নামাচ্ছে। আমার

ছোটো ভাইটি তখন সবেমাত্র ছোটদের মহাভারত শেষ করেছে। সে সব দেখল, বুঝল এবং পরে বলল, 'ছাখ্ দাদা, আজ ভীম আর অর্জুন বেঁচে থাকলে ওদের একবাণে শেষ করতো।'

'বড় গীর্জার পাশে পাঁচিলঘেরা জায়গায় ইংরেজ বালকরা ক্রীড়ারত। ওখানে ফটকে লেখা আছে—'ডগ্স্ এ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ানস নট এ্যালাউড।' আমরা একটু উঁকি দিতেই ওরা মারমুখী হ'ল। জনৈক বাঙালী ভদ্রলোক আমাদের দূরে সরিয়ে এনে বলল, 'ঝগড়া কোরো না। বড়ো হয়ে তোমরাও ক্লাব তৈরি করে দুয়ারে লিখে রেখো: 'ইউরোপীয়ানস্ এ্যাণ্ড বুলস্ নট এ্যালাউড।'

ভারতীয়রা ভিক্ষা করলে আইনে তারা ভ্যাগাবণ্ড। ইউরোপীয়রা ভিক্ষা করলে তারা হয় ভেগরেণ্ট। ওদের তখুনি ধরে এনে ভেগরেণ্ট হোমে আশ্রয় দিতে হবে। এজন্যে পুলিশের অধীনে ভেগরেণ্ট হোম স্থাপিত হয়েছিল। সার্জেণ্টদের সুবিধার্থে আমহার্স্ট স্ট্রীট থেকে পুলিশ হাসপাতাল বেণীনন্দন স্ট্রীটে নির্মিত গৃহে স্থানান্তরিত হ'ল। ইউরোপীয়দের গৃহে বারগলারী হলে উর্ধ্বতন কর্মীদের তদন্তভার নিতে হবে। এই হুকুমৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরেও অব্যাহত ছিল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশে রাজভক্তের অভাব হয় নি। যুবরাজ অষ্টম এডওয়ার্ডের ভারত আগমন উপলক্ষে তাঁর সংবর্ধনার আয়োজন করা হয় গড়ের মাঠে। তাঁর মনোরঞ্জনার্থে সেখানে 'সা-রে-গা-মা' লাঞ্ছিত সাতটি গাড়িতে রাগ ও রাগিণীদের মূর্ত করা হয়। একজন রাজার দুই দিকে ছয় রাণী। (এক রাগ ছয় রাগিণী) শেষ গাড়িতে সর্বাঙ্গে শ্বেত বিভূতিমাখা জটাজুটধারী ভৈরবরাগ। ওগুলোর পেছনে এক এক দল গায়ক সানাই বাদনরত। অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা সকলেই অভিজাত বাঙালী পরিবার থেকে সংগৃহীত। ঐ তরুণ চঞ্চল যুবরাজ রেসকোর্সে নিজেই ঘোড়ায় চড়বার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর অবিভাবক জনৈক লর্ড তাঁকে বাধা দিলেন! অবশ্য এর বিপরীত দৃশ্যও কিছু কিছু দেখা যায়। যাদের পিতারা কুইন ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুকে মাতৃবিয়োগ মনে করে গলায় কাছা নেন তাদের পুত্র ও পৌত্ররা 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি তোলে এবং ইংরাজ নিধনে মত্ত হয়।

একবার এক গোরা সৈন্যের সঙ্গে মারামারি করে বাড়ি এলে ছোটো কাকু বললেন, "ওরা ব্যবসায়িক স্বার্থে এ-দেশে আছে। ওদের মিল, ফ্যাক্টরীর পাশে মিল, ফ্যাক্টরী বানাও। তাহলেই ওরা এদেশ থেকে বিদায় নেবে।" ছোটো কাকু এই হুকুম দিয়ে বায়োস্কোপ দেখতে গেলেন। কিন্তু আমরা ভেবেই পেলাম না যে, কি ভাবে তা কার্যকরী করা যাবে।

[বিঃ দ্রঃ—এ-দিক থেকে বিচার করলে মাড়ওয়ারী ব্যবসায়ীরা ধন্যবাদার্হ। পুলিশের লোকদেরও বোধহয় এজন্য প্রশংসা প্রাপ্য। ভারতবাসী জাগছে না। ওরা ঠেঙিয়ে তাদের জাগিয়ে দিল। বন্ধুভাবে যেমন শত্রু ভাবেও তেমনি ভগবান লাভ হয়। প্রকৃতপক্ষে ওদেরই ক্রুত তাড়নায় দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়।]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

ব্রিটিশ সুপরিকল্পিতভাবে বাঙালী জাতিকে ততদিনে অসামরিক সম্প্রদায়ে পরিণত করেছে। বাঙালীর প্রতিভা তখন সাহিত্য, বিজ্ঞান ও রাজনীতিতে বহুধা বিকীর্ণ। ঠিক এই সময় বিশ্বজুড়ে প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। কিন্তু নতুন সেনাদলে বাঙালীদের তখনও স্থান নেই। এই যুদ্ধে বাঙালীরা এগিয়ে এলেও মাত্র এ্যাম্বুলেন্স বাহিনীতে তাদের স্থান হয়।

আদালতে একদিন বিখ্যাত ব্যারিস্টার রাসবিহারী ঘোষকে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান-বিচারপতি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওয়েল! মিঃ রাসবিহারী, জার্মানরা কলি-কাতায় উপস্থিত হলে তোমরা কি করবে?' রাসবিহারী ঘোষ একটু ভাবলেন তারপর উত্তর দিলেন, 'মী লর্ড! আমরা তাড়াতাড়ি একটা সভা করব। তারপর সকলে মালা-হাতে চাঁদপাল ঘাটে গিয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানাবো।' বিচারপতি বিস্মিত। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর ইউ সিরিয়াস?' উত্তরে বাগ্মী ব্যারিস্টার বলেছিলেন, 'এছাড়া আমাদের আর কি করবার আছে? বিগত দেড়শো বছর রাজত্বে তোমরা এইটুকু মাত্র আমাদের শিখিয়েছো।

এই বাদানুবাদে তৎকালীন কর্তৃপক্ষ একটু সচেতন হলেন। তাঁরা বুঝলেন যে বাঙালীদের যুদ্ধস্পৃহা অন্যদিকে বার করে না-দিলে পরে তা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধেই উদ্দীপিত হবে। আপাতত ওদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা দরকার। তবে বাঙালী বিপ্লবীদেরও সেই সঙ্গে ভর্তি হওয়ার ভয় ছিল। ইতিমধ্যে ফরাসীরা চন্দননগরে বাঙালী সৈন্যবাহিনী তৈরি করে ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে পাঠাচ্ছে। ফরাসীরা কিছু বাঙালীকে বিমান-বাহিনীতেও নিযুক্ত করেছিল। ব্রিটিশরা এবার বাঙালী-পল্টন তৈরি করে মেসোপটেমিয়ায় পাঠালো। ভেদবুদ্ধিখ্যাত ব্রিটিশ তাদেরকে তুর্কিদের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করলো। আশ্চর্য এই যে মুস্লিম-সম্প্রদায় এতে কোনো আপত্তি করে নি।

বহু বাঙালীর সঙ্গে কলিকাতা ও বাংলা-পুলিশের কিছু তরুণ এই বাহিনীতে নাম লেখায়। আমাদের পরিবারের দুজন তাতে যোগ দিয়েছিল। কাজী নজরুল

ইসলাম প্রভৃতি কবি-সাহিত্যিকও তাতে যোগ দেয়। কলিকাতা-পুলিশেরজনৈক ডেপুটি-কমিশনার ক্যাপটেন উড্ তাদের নেতৃত্ব দেন। পরে তিনি কর্নেলরূপে খ্যাত হন। এই বাঙালী-দরদী ডেপুটি পুলিশ-কমিশনার মেসোপটেমিয়ার রণক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছিলেন। বুদ্ধিমান বাঙালীদের সেনাবাহিনীতে গ্রহণ করা বড় ইংরাজের পছন্দ ছিল না। প্রতিবাদ স্বরূপ ওদের ক্যাম্পে ক্যাম্পে নিম্নোক্ত গল্পটি শোনা যেত। কারো কারো মতে ঘটনাটির মধ্যে কিছু সত্যতা ছিল।

ইংরাজ মেজর বাঙালী সেনাবাহিনীকে হুকুম দিলেন, 'বিশ কদম সামনে এগিয়ে গুলি ছোঁড়।' বাঙালী সৈন্যরা তাতে তর্ক জুড়ে দিলো, বললে, 'স্যার, এটা ঠিক কম্যাণ্ড নয়। সামনে এগোবার প্রয়োজন নেই। এখানেই এডজাস্ট করে রাইফেলের রেঞ্জ বাড়ালেই তো হয়।' মেজর-সাহেব সেইরকম কম্যাণ্ড করতে অবশ্য পারতেন। কারণ রাইফেলে এডজাস্টমেণ্টের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এই তর্ক বিতর্কের মধ্যে অহেতুক মূল্যবান সময় চলে যাওয়ায় প্রতিপক্ষ তুর্কিদল এসে ওদের সবাইকে খতম করে।

[বাঙালীদের এই অহেতুক মগজ-ব্যবহার অন্য প্রদেশেও প্রবাদ হয়ে ওঠে। এক হিন্দিভাষী প্রৌঢ়ব্যক্তি তার পৌত্রসহ নদীতীরে গাছের তলায় বসেছিলেন। এক সময় তিনি পৌত্রকে বললেন, 'দেখো, এই গাছের পাতা জলমে পড়বে তো শের আর ডাঙ্গামে পড়বে তো কুমীর হোবে।' তাঁর পৌত্র বিস্ময়ে চোখ ছানাবড়া করে চুপ করে রইলো। কিন্তু জনৈক বাঙালী তরুণ তা শুনে জিজ্ঞাসা করলো, 'লেকিন ওহী পাতা আধা-ডাঙ্গামে আউর আধা পানিমে পড়বে তো ক্যা হোগী?' প্রৌঢ় তখনই বলে উঠেছিল, 'বাপস্! তুম এতনা বুদ্ধি ধরতা? তব তুম জরুর বাঙালী হোগী।']

মগজ-ব্যবহারকারী বাঙালীরা নিজেদের বিরুদ্ধেও কম স্যাটায়ার তৈরি করে নি। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দকে উপহাস করে তারা লিখলো, 'টেরিলিল সূত্রধর কাঁঠালেরই কাঠে।' জগদীশর বসুর 'বৃক্ষের প্রাণ' সম্পর্কিত গবেষণাকে কটাক্ষ করে তারা লিখলো, 'বেলফুলকে উদ্দেশ্য করে মল্লিকা ফুল বললে, দিদি, ফুটবে নাকি?' এমন-কি রবীন্দ্রনাথকেও তারা বাদ দেয় নি। মনীষীদের ব্যঙ্গ করা এদের বহুদিনের অভ্যাস। বিশ্বযুদ্ধ সম্বন্ধে বাঙালীরা নিম্নোক্ত গল্পটি ক্যাম্পে প্রায়ই বলতো।

এক ভদ্রলোক ডাক্তারের কাছে গিয়ে বললে যে তার ব্রেনটা খারাপ হয়ে গিয়েছে। ডাক্তার তার ব্রেনটা বার করে স্পিরিটের বোতলে রেখে বললেন, 'ঠিক আছে। এটা আমি মেরামত করে রাখবো। সাতদিন পরে এসে নিয়ে যেও

কিন্তু সাতমাস পরেও ও লোকটি তার ব্রেন নিতে এলো না। একদিন বাজারে তাকে দেখে ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আরে, তোমার ব্রেনটা মেরামত করে রেখেছি। কই, তুমি তো নিতে এলে না?' 'আজ্ঞে ওটা আমার আর দরকার নেই, লোকটি নির্লিপ্ত স্বরে উত্তর দিলে, 'কারণ ইতিমধ্যে আমি মিলিটারিতে চাকরি পেয়েছি।'

"সেবার আমাদের অফিসর হবার পরীক্ষা হচ্ছিল। কর্নেল ঘোড়ায় চড়ে পরীক্ষা নিতে এলেন। আমাকে বলা হ'ল একটা সেকসনকে কম্যাণ্ড করতে। কিন্তু কিভাবে কম্যাণ্ড দেব তা বুঝতে পারছি না। হঠাৎ ছুটে গিয়ে একটা সিপাহীর মাথা চেপে ধরে খেঁকিয়ে উঠলাম, 'উজবুক কাঁহাকে! তুম শির হিলাতা। আভি তুহর শির তোড়েগী। আউর দাঁত উতর লেগী।' কর্নেল আমার দৌড় ঝাঁপে খুশি হয়ে বললেন, 'ঠিক হ্যায়। যাও, পাশ।' অর্থাৎ—সে যতো বড়ো বুলি, সে ততো ভালো অফিসর।

বিঃ দ্রঃ—কলিকাতাতে টেরিটোরিয়াল কোর্স স্থাপিত হলে বছরে একমাস বেতন-সহ গড়ের মাঠে ক্যাম্পে বাঙালী তরুণদের ট্রেনিং দেওয়া হ'ত। কিন্তু বহু বাঙালীর এই মামুলি ধরনের সমর-শিক্ষা পছন্দ নয়। বহু কৃষক শহরে গরু কিনতে এলে ওই ট্রেনিং-এ ভর্তি হয়ে একমাস পরে গরু-কেনার খরচ তুলে গ্রামে ফিরতো। এজন্য পরে শিক্ষিত বাঙালীদের জন্য য়ুনিভারসিটি ট্রেনিং-কোর্স খোলা হয়। আমি তখন ওই বাহিনীতে যোগদান করে ওদের একজন অফিসর হয়েছিলাম।

লালদীঘির জলে বিরাট একটা হাঁস ভাসছে। তার পিঠে বড়ো বড়ো দুটো ডিম। হাঁসের গায়ে বাংলায় লেখা: 'ওয়ার-বণ্ড কেনো।' অর্থাৎ 'তাহলে ডিম্বলাভ হবে।' বহু ব্যক্তির আশা যে ভবিষ্যতে হোমরুল পাওয়া যাবে। দেশীয় পত্রিকায় হোমরুলকে ভীমরুল বলা হ'ত। যুদ্ধ থামলো। ওদেরই ভবিষ্যত-বাণী সত্য হ'ল। হোমরুল এলো না। বাঙালী বিপ্লবীরা এই যুদ্ধ কাজে লাগিয়েছিল। তাদের আশা, জার্মান ডুবোজাহাজ অ্যামডেন তাদের জন্য সুন্দরবনে অস্ত্র নামাবে। কিন্তু এই অ্যামডেন বঙ্গোপসাগরে কয়টি ব্রিটিশ-জাহাজ ডুবিয়ে নিজেও ডুবলো।

স্বদেশী-আন্দোলন বাংলাদেশে ও অন্যত্র থেমে গেল। বিদেশী বস্ত্র বর্জনে গুজরাটের মিল-মালিকরা লাভবান। তারা আপন স্বার্থে কংগ্রেসকে চাঁদা দেয় ও তাকে শক্তিশালী করে। তখনও কংগ্রেসের আশা, আলোচনা দ্বারা দেশ স্বাধীন হবে। ওদিকে কিন্তু বাংলাদেশে গুপ্ত-বিপ্লবীরা তখন শক্তিশালী হতে থাকে।

দেহচর্চার অজুহাতে এখানে-ওখানে খুব আখড়া স্থাপিত হচ্ছিল। আখড়াগুলিতে দাদারা প্রথমে কিশোরদের বিবেকানন্দের লেখা ও অন্যান্য বই পড়তে দিতো। এ ভাবে তাদের দেশাত্মবোধ উদ্বুদ্ধ হলে তাদেরকে দলে নেওয়া হ'ত। শান্ত প্রকৃতি অথচ চতুর সভ্যদের উপর ইনটেলিজেন্সের কাজ থাকতো। তারা পত্রবহন, অস্ত্র-সংগ্রহ, নতুন কর্মী রিক্রুট ইত্যাদি কাজ করতো। যারা অতি-সাহসী ও উগ্র-প্রকৃতি তাদের হত্যা ও ডাকাতি প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত করা হ'ত। সভ্যদের মনোবল রক্ষার জন্যে দাদারা বলতো যে সুন্দরবনে তাদের বহু ঘাঁটি আছে এবং সেখানে অজস্র তরুণকে অস্ত্রশিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। তারা দেহের রক্ত দিয়ে ভুজ-পত্রে প্রতিজ্ঞাবাণী লিখতো। কেউ-কেউ ডাকাতির পর রসিদ দিয়ে বলেছে যে দেশ স্বাধীন হলে ওই অর্থ ও অলংকারাদি ফেরত দেওয়া হবে। এভাবে সংগৃহীত অর্থ বেহাত হলে নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি হয়েছে। ফরাসী চন্দননগর ও জাহাজীদের নিকট হতে অস্ত্র সংগ্রহ করা হ'ত। তারা বোমা বানাতো ও বোমার দল তৈরি করতো। পুলিশের চর সন্দেহে ওরা নিজেদের লোককেও গুলি করেছে?

প্রমাদ বুঝে ব্রিটিশ-সরকার সাম্প্রদায়িক বোধ সৃষ্টি করতে এজেণ্ট-প্রপোগেটর নিযুক্ত করলেন। তখনও ইন্দোনেশীয় মুস্লিমদের মতো বহু বাঙালী-মুস্লিমদেরও ভারতীয় নাম ও আচারবিচার। উভয়ের পালা-পার্বণে উভয়ে সানন্দে যোগ দিতো। মুস্লিম-নারীরা তারকেশ্বরে হত্যা দেয়। হিন্দু-নারীরা পীরের দরগায় সিন্নি চড়ায়। দুর্গাপূজার সময় উভয়-সম্প্রদায়ই কেনাকাটা করে ও ভাসান দেখতে বেরোয়। হিন্দুদের পৃষ্ঠপোষকতায় মহরমের জাঁক বাড়ে। মুস্লিম-কৃষকরা ব্রাহ্মণদের ঠাকুর বলে ডাকে ও শ্রদ্ধা করে।

দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রমাণের জন্য ওই-সব পরিহার করার ব্যবস্থা হ'ল। মুস্লিমদের বোঝানো হ'ল যে তাদের অনগ্রসরতার জন্য হিন্দুরাই দায়ী। তারা জানলো না যে অনগ্রসর হিন্দু ও বৌদ্ধরা মুস্লিম হওয়াই তার কারণ। কিন্তু উন্নত হিন্দুরাও তৎকালে মুস্লিম হ'ত। ফলে, তারা এখনও উন্নত। বিহার ও লখনউ-এর মুস্লিমরা অর্থে, জ্ঞানে ও মর্যাদায় সেই প্রদেশের হিন্দু অপেক্ষা উন্নত। বিদেশী মুস্লিম-শাসকরা ধর্মান্তরিত মুস্লিমদের একটুও সুবিধা দেয় নি। কারণ ধর্মের চেয়ে গুণের বিচারই তখন রীতি ছিল। ধর্ম তখনও পরিবর্তনশীল আচারমাত্র। নৃ-বিজ্ঞান, রক্ত-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান দ্বারা বোঝান হ'ল না যে ধর্মে মুস্লিম হলেও মূলতঃ জাতিতে ওরা হিন্দু তথা ভারতীয়। তাদের বোঝানো হ'ল না যে হিন্দুদের মতো তাদের পূর্বপুরুষরাও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের রুখেছে। তাদের

এ-ও বলা হ'ল না যে বহু হিন্দুও তাদেরই মতো আজও অনগ্রসর এবং দরিদ্র। তাদের বলা হ'ল না যে ধনী-হিন্দুদের দ্বারা স্থাপিত গ্রামীণ উচ্চবিদ্যালয়ে তারা শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছে। তারা জানলো না যে বিদেশী মৌলভীরাই তাদের ইংরাজি শিক্ষা-গ্রহণে বাধা দিয়েছিল।

[মুস্লিমদের উঁচুতে তুলে হিন্দুদের সমান না-করে হিন্দুদের নামিয়ে মুস্লিমদের সমান করার চেষ্টা হ'ল। তাতে বাঙালী-হিন্দুদের অধিকাংশই বেশি করে ব্রিটিশ-বিদ্বেষী হয়ে ওঠে।]

ভারতের অন্যত্র মধ্যবিত্তদের বদলে কৃষক-শ্রেণী হতে শ্রমিক ও নিম্নপদস্থ সৈনিক ও পুলিশ ভর্তি করা হয়। এজন্য গ্রামে-গ্রামে রিক্রুটিং-স্কোয়াড পাঠানো হ'ত। চতুর ব্রিটিশরা শহুরে মধ্যবিত্ত বাঙালীদের দেখিয়ে প্রচার করে যে বাঙালী জাতি শ্রম-বিমুখ। (অন্য প্রদেশের মধ্যবিত্ত ও ধনীরা কিন্তু তাই।) বাঙালী কৃষকদের মতো হাঁটুজলে পাট কাচতে সক্ষম শ্রমিক-সম্প্রদায় পৃথিবীতে নেই। কাঁধে ভারী বোঝা নিয়ে দশ-বিশ ক্রোশ পথ হাঁটতে বাঙালীরাই সক্ষম। চতুর ব্রিটিশ এই-ভাবে ধীরে-ধীরে বাঙালীকে দুর্বল করে দিলো।

উপরোক্ত ওজুহাতে ব্রিটিশরা কিছুকাল আত্মবিস্মৃত বাঙালীদের পুলিশের নিম্নপদে ও আমর্ড ফোর্স-সমূহেও ভর্তি করে নি। তবে মধ্যবর্তী পদগুলিতে শিক্ষিত বাঙালীকে তারা বাধ্য হয়ে নিতো। তাড়াতাড়ি ইংরাজি না-শিখলে এই-সব পদ থেকেও তারা বঞ্চিত হ'ত। বাংলা দেশে ভূমিস্বত্ব আইন প্রথম প্রণীত হয়। তাতে ভূমিহীন কৃষকের কিছুটা অভাব ঘটে। এদেশে তার ফল বিশেষ শুভ হয় নি। এ কারণে বাঙালীর বদলে স্টেশনের কুলি ও মুটে-মজুরের কাজগুলি অন্য প্রদেশের লোক দখল করে নেয়। অপরদিকে জমি টুকরো-টুকরো হওয়ায় কৃষি-কাজও অ-লাভজনক হতে থাকে। ছোট-ছোট জমি-চাষের জন্য লাঙল ও বলদ রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

পুলিশ-কমিশনার হেলিডে

কমিশনার হেলিডে (১৯১০-১৯১৫) কলিকাতা-পুলিশের কমিশনার ছিলেন। এই বিভাগ পত্তনের কাল থেকে যাবতীয় কাজকর্ম বাংলায় সমাধা হ'ত। ইনি কর্মভার গ্রহণ করে বাংলার বদলে ইংরাজীতে উহা সমাধা করার হুকুম দিলেন। ইনি রিক্রুটিং-স্কোয়াড পাঠিয়ে বিহার ও উত্তরপ্রদেশ হতে কলিকাতা-পুলিশের জন্য কনস্টেবল ভর্তি করতেন।

তাঁরই নেতৃত্বে শহর-কলকাতায় ও দেশের সর্বত্র বাঙালী বিপ্লবীদের দমনে পুলিশ সবিশেষ মনোযোগ দিয়েছিল। কমিশনার হেলিডে-র সময়ে কলিকাতা-পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ঘটে। ১৯১৩ খ্রীঃ ইনি স্বয়ং হিন্দু হোস্টেলে খানাতল্লাসীতে গিয়েছিলেন ভোররাত্রে। কিন্তু তৎকালীন ইংরাজ হোস্টেল-সুপারিনটেনডেণ্টের নেতৃত্বে ছাত্ররা বাধা সৃষ্টি করায় তাঁকে সকাল না-হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। পরে তাঁকে বিপ্লবী মনে-করা ছাত্রটির দ্রব্যাদি মাত্র তল্লাস করতে দেওয়া হয়েছিল। শুধু সন্দেহের কারণে ছাত্রটিকে গ্রেপ্তার করতে দেওয়া হয় নি। বিনা-অনুমতিতে বিশ্ববিদ্যালয়-হোস্টেলে প্রবেশের জন্য তাঁকে ক্ষমা চাইতে হয়। ভুল সংবাদ-দাতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও তিনি প্রতিশ্রুতি দেন। হেলিডে পার্ক সম্ভবতঃ তাঁরই স্মৃতিস্মারক। তবে বাংলা ও কলিকাতার বিপ্লবী-দমনে ইনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। এঁরই আদেশে এই কসমোপলিটন শহরে কাজের সুবিধার জন্য একজন করে কাবুলি ও পাঞ্জাবি এবং কিছু দেশওয়ালী অফিসর নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। তৎকালে পাওয়া যায় নি বলে মাড়োয়ারী কর্মী নিযুক্ত করা হয় নি।

[এর মধ্যে কতো বোমার ষড়যন্ত্র-মামলা আদালতে উঠলো এবং নিষ্পত্তি হ'ল। কতো উল্লাসকর দ্বীপান্তরে উন্মাদ হ'ল, কতো বিপ্লবী ফাঁসিতে ও সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ দিলো। বারীন ঘোষ, ক্ষুদিরাম, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখের রাজনৈতিক ইতিহাস এখানে আলোচ্য নয়। পুস্তক-বোমা, কলম-পিস্তল প্রভৃতি বিপ্লবীদের ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রাদি ও তাঁদের তরুণ-বয়সের ফটোচিত্রগুলি কলিকাতা-পুলিশ মিউজিয়মে সযত্নে রক্ষিত আছে।]

বিঃ দ্রঃ—প্রথম মহাযুদ্ধ ১৯১৪-১৮ খ্রীঃ পর্যন্ত চলেছিল। বাঙালীদের পক্ষপাত সম্পূর্ণ জার্মানীদের পক্ষে ছিল। জার্মানীদের পরাজয়ে বহু বাঙালী বিমর্ষ হয়েছে। সরকারী খরচে পুলিশ-কোয়ার্টারগুলি আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়। বাল্যে আমরাও না-বুঝে ছাদের উপর বিরাট বোর্ডে লিখেছিলাম : 'ব্রেভো দা এলাইস'। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গান্ধীজী ইংরাজদের সাহায্য করেছিলেন আফ্রিকা থাকাকালীন। তাঁর আশা ছিল, ইংরাজরা ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দেবে। কিন্তু তা হ'ল না। উনি আশাহত হয়ে অহিংস-সংগ্রামে লিপ্ত হলেন। রাউলাট এ্যাক্টের বিরুদ্ধে তাঁর প্রথম সংগ্রাম-ঘোষণা। এই এ্যাক্টকে উনি 'রাক্ষুসী আইন' আখ্যাবিভূষিত করলেও এরকম আইন কিন্তু সাধারণ-আইনেও ছিল। এই উপলক্ষে গড়ের মাঠে সর্বপ্রথম লক্ষাধিক লোকের প্রতিবাদ-সভা হয়। ফলে কলকাতায় যে-আন্দোলনের উৎপত্তি তার নিষ্পত্তি হ'ল পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে। এই

সময় থেকে কলিকাতা-পুলিশকে রাজনৈতিক আন্দোলন-দমনে অধিক মনোযোগী হতে হ'ল।

গান্ধীজী কংগ্রেসকে আবেদন-নিবেদনের পথ ত্যাগ করতে নির্দেশ দিলেন। তাঁর কয়েকটি অহিংসা-আন্দোলন সমগ্র ভারতকে প্রভাবিত করেছিল। ১৯২১-২২ খ্রীঃ অসহযোগ-আন্দোলনে তিনি ভাবপ্রবণ বাঙালীদেরই বেছে নিলেন। তিনি জানতেন যে বাংলায় ঢেউ উঠলে তা সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়বে। উপরন্তু বাঙালীদের বিলাতী বস্ত্র বর্জনে ও দহনে অভিজ্ঞতা আছে। প্রখর মেধার অধিকারী চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করায় সকলে বিস্মিত। এতে এক-দিনেই গান্ধীজী সমগ্র ভারতের স্বীকৃতি পেলেন। তাঁর 'মহাত্মা' উপাধিটিও বাঙালীদেরই দেওয়া।

[গান্ধীজী সহিংস বিপ্লবের চির-বিরোধী। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-দখলের সংবাদে উনি বললেন, 'চিটাগাঙ রিড্‌স এ স্যাড রিডিং।' চিত্তরঞ্জন প্রথমে সশস্ত্র বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন। হঠাৎ তিনি গান্ধীবাদী হওয়ায় লোকে রটালো যে ওঁরা দুরাত্রি একত্রে কংগ্রেস-ক্যাম্পে ছিলেন, সেই সুযোগে গান্ধীজী তাঁকে সম্মোহিত করেছেন। বাংলাদেশে এই দুই নেতার প্রচেষ্টায় অসহযোগ-আন্দোলন ও বিদেশী বস্ত্র-বর্জন তীব্র হ'ল। তরুণেরা দলে দলে স্কুল-কলেজ ত্যাগ করে এই আন্দোলনে সামিল হোল। পার্কে-পার্কে মিটিং ও গ্রেপ্তার বরণ। বিলাতী বস্ত্র বর্জন এবং উহা দহনও চললো সেই সঙ্গে।]

বিঃ দ্রঃ—চিত্তরঞ্জনের ডাকে অন্যদের সঙ্গে আমিও স্কুল হতে বেরোই। তার বাড়িতে গুর্খা দারোয়ান বিনা বাধায় ভিতরে ঢুকতে দিলো। আমরা প্রথমে বাগানের পিয়ারা গাছের সব কটি পাকা-ফল পেড়ে শেষ করি ও পরদিন স্কুলে ফিরি। আমাদের বহু বন্ধু ক্লাশে না-এসে সোজাসুজি আন্দোলনে লিপ্ত হ'ল। তবু চিত্তরঞ্জনের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি অটুট রইলো। উনি তখন স্থানে-স্থানে ছোট সভা করতেন। বাল্যে এরকম এক সভায় তাকে নিকট হতে দেখি ও বক্তৃতা শুনি। তাঁর বক্তৃতা হুবহু উদ্ধৃত করা আজ মোটেই সম্ভব নয়। উহা মোটামুটি এই-রকম ছিল : নেতারা তোমাদের বিষয় ভাবেন। তোমাদের দেশের কথা ভাববার সময় নেই। তাই নেতাদের সুচিন্তিত নির্দেশ তোমরা গ্রহণ করো।' বহু সভায় তাঁর উগ্র বক্তৃতাও আমি শুনেছি।

[দক্ষিণ-কলিকাতা হাজরা, পার্কে প্রথম আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু হ'ল। একজন করে বক্তৃতা দিতে উঠলে উপস্থিত উর্ধ্বতন পুলিশ তাকে হাতের ইশারা করতেন। অমনি বক্তৃতাকারী নেমে এসে গ্রেপ্তার বরণ করতো। হঠাৎ সংবাদ

এলো, বাসন্তী দেবী গ্রেপ্তার! জনৈক তরুণ ক্ষেপে উঠে চীৎকার করে বললে, 'এখনও চুপ করে কেন? প্রতিশোধ নিন ও ওদের রক্ত নিন।' সুশিক্ষিত কংগ্রেস কর্মীরা ছুটে এসে তাকে নিরস্ত করেছিল।]

এ সময় কংগ্রেসী তরুণদের অদ্ভুত নিয়মতান্ত্রিকতা ও ভদ্রতাবোধ দেখেছি। কটূ-বাক্যে ও প্রহারে তারা স্মিতহাস্য করেছে। লোকমান্য তিলকের মৃত্যুকালে তারা পথচারীদের জুতো খুলে মুছে সশ্রদ্ধভাবে তাদের হাতে তা তুলে দিয়েছে। আন্দোলনের এই নম্র-শান্ত প্রকৃতি পরবর্তী প্রতিটি ক্ষেত্রে অব্যাহত ছিল। অথচ তার মাত্র ক'বছর পরে বিয়াল্লিশের 'আগস্ট আন্দোলনে' তরুণরা পথচারীদের মাথার হ্যাট উপড়িয়ে গলার টাই ছিঁড়ে তাদেরকে দৌড় করাতেও দেখেছি। তাদের দুর্ভোগে বিজাতীয় উল্লাসে অন্যেরা করতালি দিয়েছে।

আন্দোলনের জন্য গান্ধীজীর বাংলায় আসা কিছু বাঙালীর পছন্দ নয়। তাদের মতে গান্ধীজী বাঙালী জাতির ভাবপ্রবণতার সুযোগ নিতে চান। আগেও উনি তাই নিয়েছেন। এবার তিনি এলে ব্রিটিশদের রোষ বাঙালীদের আরও ক্ষতি করবে। সত্যাগ্রহ করে তারা বাড়ি ফিরে দেখবে যে অন্যদের সঙ্গে পুলিশরা একযোগে সর্বস্ব লুণ্ঠন করেছে। নারীদের সম্মান ও মর্যাদা নেই। তাদের অভিযোগ শুনে লাটসাহের আবার বললেন, 'ওটা কলোসল হোক্স।' সরোজিনী নাইডু ও অন্য-নেতারা আর-একবার টাউন-হলে মিটিং করবেন ও লাটসাহেবকে গাল পাড়বেন, তারপর চলে যাবেন। ব্যস, ওই পর্যন্ত। বহু ব্যক্তির আশঙ্কা, একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবারও বাধানো হবে।

[স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করার জন্য স্যার আশুতোষ মুখার্জির পরোক্ষ দান কম নয় তৎপুত্র সহপাঠী বামাপ্রসাদের মাধ্যমে আমি তাঁর সংস্পর্শে আসি। তিনি আমাদের মিত্র ইনস্টিটিউশন-এ এসে ছাত্রদের উৎসাহিত করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমেও তিনি অসংখ্য শিক্ষিত 'স্বাধীনতা-যোদ্ধা' সৃষ্টি করেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে গভর্ণরকে তিনি একবার বলেছিলেন, 'ফ্রিডম ফার্স্ট, ফ্রিডম সেকেণ্ড, ফ্রিডম লাস্ট।'

স্যার আশুতোষের এই বিশ্ববিদ্যালয়টি অসংখ্য শিক্ষিত বেকার সৃষ্টি করেছিল। তাঁর ইচ্ছা, চাকুরীর অভাবে শিক্ষিত বেকারেরা ব্যবসায় নামবে। কিন্তু পরিবর্তে তারা রাজনীতিক্ষেত্রে যোগ দিতে থাকে।]

সুপারী গাছের বালদো হতেও নুন তৈরী করে ওরা আইন ভেঙেছে। ওদিকে সুপরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক কর্মী-নিয়োগ সরকারী কাজে হিন্দুর সংখ্যা কমানো হয়েছে। ইংরাজ-সওদাগররাই শুধু তাদের কাজে বাঙালী নিয়োগ করতো। তা

না-হলে বাঙালীদের বেকারত্ব আরও বেড়ে গিয়ে ইংরাজ রাজত্বের পতন ত্বরান্বিত করতো। বাঙালীদের কাজ-কর্মে নিযুক্ত না-করলে তারা অন্যভাবে নিযুক্ত হবেই। শহরের অন্যান্য পার্কে সভা সেরে নেতারা হরিশ পার্কে এলেন। বাল্যে এই সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। গান্ধীজী বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বললেন, 'অফিস আদালত স্কুল ছাড়ো। বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ করো। সকলে ট্যাক্স বন্ধ করো। 'দেন্ স্বরাজ উইল বী অবটেণ্ড টু-ডে।'—মহম্মদ আলী ও শওকত আলী গর্জে উঠে বললেন, 'জর্জ ফিপ্‌থ কিং অব ইংলণ্ড, পারহ্যাপস্ স্টিল এম্পারার অব ইণ্ডিয়া।—অন্য একজন আরও বিশদভাবে বললেন 'একটা কামানের গোলা বিশ মাইল মাত্র যায় ও সেই স্থান ধ্বংস করে। কিন্তু এই চরকা দশহাজার মাইল দূরে ম্যানচেস্টার ধ্বংস করবে।' তারপর সুরু হ'ল বিলাতী বস্ত্র দাহন। চিত্তরঞ্জন দাশ চিৎকার করে বললেন, 'আরও চাই—আরও চাই। আধখানা বিলাতী বস্ত্র পরে থেকে বাকী আধখানা আগুনে ফেল।' ভাবপ্রবণ তরুণের দল জামা ও গেঞ্জি আগুনে ছুঁড়লো। আমাদের বাড়ির অভিভাবকদের বকুনির ভয় ছিল, তবু পকেটের বিলাতী রুমালটা আগুনে ছুঁড়ে আমরা দু'ভাই বাড়ি ফিরে এলাম।

[কলিকাতা-পুলিশ এ্যাক্ট-এ পাবলিক প্লেসে কোনো ফায়ার নিষিদ্ধ। ওটা দোল-যাত্রার নেড়া-পোড়া বন্ধের জন্য তৈরি। কিন্তু শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বস্ত্র-দহনের জন্য গান্ধীজী অভিযুক্ত হলেন। তাঁর তরফে আদালতে এক অজ্ঞাত ব্যক্তি জরিমানা দিয়েছিল।]

হাজরা পার্ক হরিশ পার্ক শ্রদ্ধানন্দ পার্ক ওয়েলিংটন স্কোয়ার শ্যাম পার্ক—এই কটি তখন রাজনৈতিক পীঠস্থান। রাউলাট বিল তথা রাক্ষুসে আইনের প্রতিবাদে সর্বপ্রথম গড়ের মাঠে বিরাট মিটিং হয়েছিল। রাখীবন্ধন-খ্যাত বিহারের লিয়াকত হোসেন এবং বর্তমানে পণ্ডিচেরী আশ্রমবাসী অনিলবরণ তৎকালে বিশিষ্ট সুবক্তা। অনিলবরণ বাবু আশ্রমবাসী না-হলে বাংলার উল্লেখযোগ্য নেতা হতেন।'

রেজিনেণ্ড ক্লার্ক

স্যর রেজিনেণ্ড ক্লার্ক (১৯২০-২৫) কলিকাতার উল্লেখযোগ্য পুলিশ-কমিশনার হয়েছিলেন। দেশবাসীর প্রতি তাঁর অনুরাগ ও সহনশীলতা অত্যন্ত বেশি। এই সুযোগ বাংলার বিপ্লবীদল গ্রহণ করেছিল। তাঁর সময়ে ওঁরা কলকাতায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘাঁটি করে।

এই ভদ্রলোকের পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যবোধ আজও প্রবাদ। তিনি সকল শ্রেণীর

পুলিশ-কর্মীর উর্দীর ও আবাসের যথেষ্ট উন্নতি করেন। কোনো পুলিশ-কর্মীর নিকট একটি সুন্দর ফাউনটেন পেন দেখলে তিনি প্রশংসা করতেন। তাঁর সময়ে থানাগুলি বেশ পরিচ্ছন্ন ও উদ্যানশোভিত হয়। তবে কিছু দেশীয় কর্মী ও কনট্রাকটারদের যোগসাজসে অর্থব্যয় সত্ত্বেও কিছুসংখ্যক পুলিশ-কোয়ার্টার তাঁর মনোমত তৈরি হয় নি। তিনি কলিকাতা-পুলিশের বেতন বৃদ্ধি করে প্রায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের (তৎকালীন মান মতো) সমান করেন। এজন্য বহু ব্যক্তি সাব-ডেপুটি না-হয়ে কলিকাতা-পুলিশে সাব-ইনস্পেক্টর হয়েছে। তিনি অভিজাত পরিবারের গ্র্যাজুয়েট যুবকদের সাব-ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করতেন। এজন্য তিনি কলেজগুলির য়ুরোপীয় প্রিনসিপ্যালদের সঙ্গে স্বয়ং সংযোগ করতেন। তাঁর সময়ে উর্ধ্বতন পুলিশ-কর্মীরা (আই-পি) সকলেই ইংরাজ হতেন। তিনি গভর্ণমেণ্টকে একজন দেশীয় ডেপুটি-কমিশনার নিয়োগে রাজী করালেন।

রায়বাহাদুর পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ীকে সহকারী কমিশনার পদ হতে উন্নীত করে এক-মাত্র ভারতীয় ডেপুটি কমিশনার নিযুক্ত করা হ'ল। তখনও কলিকাতা-পুলিশে সহকারী পুলিশ-কমিশনার ও থানা-ইনচার্জের মধ্যে ইংরাজ ও অ্যাংলোই বেশি। কমিশনার ক্লার্ক এই পদগুলির দেশীয় করণ করলেন। তিনি কলিকাতা-পুলিশে আভিজাত্য রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর। নিম্ন ও মধ্যপদগুলিতে বাংলা-পুলিশ অপেক্ষা কলিকাতা-পুলিশের বেতন, উর্দির ঔজ্জ্বল্য ও অন্য সুযোগ-সুবিধা বেশি হ'ল।

কলিকাতা-পুলিশে কনস্টেবল অফিসার নির্বিশেষে উর্দিতে সাদা জিনের ফুলপ্যাণ্ট, গলাবন্ধ কোট ও নিকেল বোতাম। মাথায় ক্রাউন-মার্কা নিকেল ব্যাজ যুক্ত হেলমেট ও কাঁধে স্ট্রাপ-সহ ব্যাজ ও চিহ্ন। গ্রীষ্মে কালো বনাতের টিউনিক কোট ও ফুলপ্যাণ্ট। মাথায় সুদৃশ্য ব্যাজ সহ হেলমেট। প্রয়োজন হলে তাতে রৌপ্যোজ্জ্বল পাইক্স্ ও চেইন লাগানো হ'ত। ইনস্পেকটরদের কাঁধে রৌপ্যোজ্জ্বল পাকানো কর্ড লাগানো থাকতো। অ্যাসিসটেণ্ট ও ডেপুটি-কমিশনারদের তরবারি সহ উর্দি প্রায় জেনারেলদের মতো জমকালো।

কমিশনার ক্লার্ক কলিকাতা-পুলিশে তিনটি অর্ডার অফ সার্ভিস (ইম্পিরিয়াল, প্রভিনসিয়াল ও সাব-অরডিনেট) বাতিল করে লণ্ডন-পুলিশের মতো দুটি ভাগ যথা পুলিশ মেন [কনস্টেবল ও হেড-কনস্টেবল] এবং তদূর্ধ্বদের অফিসর রূপে চিহ্নিত করতে চাইলেন। কিন্তু সেকালে ডেপুটি-কমিশনারগণ ইংরাজ হওয়ায় গভর্ণমেণ্ট রাজী হয় নি। একই শিক্ষা-দীক্ষা ও বংশ-গরিমার কর্মীদের পদমর্য্যাদা-গত বিভেদ তাঁদের পছন্দ নয়। অধিকন্তু বয়স ও তদ্জনিত অভিজ্ঞতার উপর তিনি প্রাধান্য দিতেন। তাঁর নির্দেশে তরুণ ইংরাজ-উর্ধ্বতনরা অধীনস্থ প্রধান

কর্মীদের কাছে পরামর্শ নিতেন। পুলিশ-কর্মীদের জনগণের প্রতি সামান্যতম অসৎ ব্যবহার করলে তিনি কঠোর দণ্ড দিতেন। পরিচ্ছন্ন, দক্ষ এবং জনপ্রিয় কর্মীদের খুঁজে বার করে প্রমোশন দেওয়া হ'ত।

পুলিশের নিজস্ব আদালত তথা রিপোর্ট রুমে বিবাদমান নাগরিকদের ডেকে তাদের বিবাদ মিটানোর জন্য তিনি ডেপুটিদের নির্দেশ দিতেন। সেকালে আদালতও একই উদ্দেশ্যে প্রাইভেট মামলা সমূহের তদন্তের জন্য পুলিশ-বিভাগে পাঠাতেন। সেগুলি পুলিশী স্তরেই মিটে যাওয়ায় আদালতের কাজ হালকা হ'ত। এবং পল্লীর শান্তি ও বন্ধুত্ব অটুট থাকতো। পুলিশী তদন্ত পছন্দ না-হলে হাকিমরা পুনরায় তদন্তের জন্য পল্লীর মানী গুণীর নিকট সেগুলি পাঠাতেন। সরেজমিন তদন্তে সত্যমিথ্যা তখনই ধরা পড়তো। এতে মিথ্যা মামলায় কারো হায়রানি হয় না। প্রয়োজনীয় সাক্ষীদের তদন্তকারীরা নিজেরাই খুঁজে বার করতেন। তার ফলে মিথ্যা সাক্ষী তৈরি হ'ত না এবং সত্য সাক্ষীরাও দায়িত্ব এড়াতে পারতেন না। এই ব্যবস্থায় নাগরিকরা নিরাপদ ও সুখী ছিলেন। পদনির্বিশেষে কোনো পুলিশ-কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এলে উর্ধ্বতনরা তৎক্ষণাৎ তা তদন্ত করতেন। অসৎ ও পক্ষপাতদুষ্ট হাকিমদের উপর প্রধান-হাকিম স্বয়ং লক্ষ্য রাখতেন। দূর দূরান্তরে পুনঃ পুনঃ বদলী ও উচ্চ-আদালতের ভয়ে হাকিমরা সর্বদা সতর্ক থাকতেন। জুডিসিয়ারী সুবিধা দৃশ্যতঃ তাঁদের রক্ষাকবচ হলেও সর্বক্ষেত্রে কার্যকর হয় নি। [এজন্য তারতীয়রা পূর্বে একক বিচার পছন্দ করে নি।]

কলিকাতা-পুলিশে তখন ট্রিবিল চেকিং ব্যবস্থা বর্তমান। প্রত্যহ সান্ধ্যভিজিটে অ্যাসিসটেন্ট কমিশনাররা স্ব স্ব এলাকায় প্রতিটি থানা পরিদর্শনে বাধ্য ছিলেন। তাঁরা হাজতঘর, মালখানা, গার্ডরুম ও অফিস পরিদর্শন করতেন। প্রত্যেক আসামীকে তাঁর কাছে পেশ করা নিয়ম। আসামীদের প্রত্যেককে অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে তাঁরা জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। কারো বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ থাকলে তা তৎক্ষণাৎ ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করে তদন্ত করার নিয়ম। আহতদের হাসপাতালে না-পাঠালে বা জামীনযোগ্য অপরাধীদের জামীন দেওয়া না-হলে তারজন্য থানা-ইনচার্জদের কৈফিয়ৎ তলব হোত। জামীনযোগ্য অপরাধে জামীনের জন্য পুলিশই তাদের বাড়ি হতে জামীনদার ডেকে আনতো। কাউকে গ্রেপ্তারের পর তার বাড়িতে সংবাদ দিতে পুলিশ বাধ্য ছিল। অফিসররা প্রতিটি মামলার ডায়েরী খুঁটিয়ে পড়ে মন্তব্য সহ নির্দেশ দিতেন।

উক্ত প্রাথমিক চেকিং-এর পর দ্বিতীয় চেকিং পরদিন সকালে ডেপুটি কমিশনারদের নিজস্ব আদালত তথা রিপার্ট রুমে হ'ত। সেখানে ডেপুটি সাহেবদের রেলিং

ঘেরা নিজস্ব এজলাস। প্রতিটি থানার ইনচার্জ অফিসর আসামী ও নথীপত্র সহ সেখানে আসতেন। ডেপুটি কমিশনার তাঁর অ্যাসিসট্যাণ্ট কমিশনারের সাহায্যে সমস্ত মামলা বুঝতেন ও আসামীর পক্ষের বক্তব্য শুনতেন। তাদের সাক্ষী সেখানে এলে তাঁরা জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। উভয় পক্ষের উকিলরা সেখানে থেকে সওয়াল করত। উচিত বুঝলে ডেপুটীরা আইন ক্ষমতার বলে আসামীদের তৎক্ষণাৎ মুক্তি দিতেন। সন্দেহ হলে, অন্য অফিসর দ্বারা মামলা পুনঃ তদন্ত করা হ'ত। এমনকি প্রয়োজনে নিজেরাও সরেজমিন তদন্তে বেরুতেন। অফিসারদের গাফলতি বা দোষ প্রমাণিত হলে তাঁরা শাস্তি পেতেন। থানার অফিসররা নিজেরা কোর্টে কোনো মামলা পাঠাতে পারেন নি। (এরপর তৃতীয় চেকিং আদালতে হ'ত।) কোনো নিরপরাধী ব্যক্তির হায়রানি ও অর্থকষ্ট তাতে সম্ভব ছিল না।

বিঃ দ্রঃ—প্রাথমিক, আকস্মিক ও জুভেনাইল অপরাধীরা অনুতপ্ত হলে পুলিশ-গ্রাহ্য মামলাতেও তাদের রিপোর্ট-রুমে পুওর-ফাণ্ডের জন্য কিছু চাঁদা নিয়ে মুক্তি দেওয়া হ'ত। হেড-কোয়ার্টারসে একটি পুওর ফাণ্ড ছিল। সেই তহবিল হতে দুঃস্থদের মাসিক সাহায্য ও দরিদ্র ছাত্রদের পুস্তক দান করা হ'ত। দরখাস্ত পেলে পুলিশী তদন্তের পর ওই অর্থ হতে সাহায্য দেওয়া হয়েছে। ব্যর্থ-আত্মহত্যাকামীদের রিপোর্ট এনে তাদের সাবধান করে ছেড়ে দেওয়া হ'ত। এই-সব ক্ষেত্রে জেলে পাঠানোর নিয়ম ছিল না। স্বাধীনতার পর বহু হিতকর ব্যবস্থার মতো এটিও পরিত্যক্ত হয়। সেকালে গৃহস্থ-বাড়িতে নাইট-সার্চ এড়ানোর নিয়ম ছিল। (ফ্রেঞ্চ চন্দননগরে তো বেআইনী)। পুরুষদের অবর্তমানে বাড়িতে প্রবেশ করা হ'ত না। মহিলাদের সাক্ষী বা আসামী করা হ'ত কম। প্রতিদিন থানা-প্যারেডের পুলিশ-কর্মীদের একত্রিত করে কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করা হয়েছে। কোনো মামলা থানায় এলে দশ-মিনিটের মধ্যে তা গ্রহণ করা চাই। মামলা বার্কিং (Barking) বা এড়ানো জঘন্য অপরাধ। প্রতিটি উত্তম-কর্মের জন্য পুরস্কার ছিল। মামলা মিথ্যা প্রমাণ করলেও তাঁরা পুরস্কার পেতেন। বিনা প্রমাণে নির্বিচারে গ্রেপ্তার করলে পুলিশের দণ্ড হ'ত। শহরে পুলিশের জীবন তখন মসৃণ ছিল না। দুই রাত্রি দুই ঘণ্টার রাউণ্ডের পর একরাত্রি বিশ্রাম মিলতো। চব্বিশ ঘণ্টাই তাদের ডিউটি। সামান্যতম গাফলতি হলে তাদের ক্ষমা নেই। বাইরে বেরুলে তা লিখে বেরুতে হ'ত। ফেরার সময়টিও তারা লিখতে বাধ্য। মধ্যবর্তীকালে কৃত কাজের হিসাব দিতে হ'ত।

(ইংরাজ ডেপুটি-কমিশনার ও দেশীয় থানা-ইনচার্জরা সাধারণত কম বয়স্ক। এরাই দাঙ্গা-হাঙ্গামাকালে রাজপথে বার হ'ত। কিন্তু অ্যাসিসটেণ্ট কমিশনারগণ

প্রমোটেড হওয়ায় সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে মধ্য-বয়স্ক। এজন্য তাদের বাইরের ডিউটিতে আহ্বান করা হ'ত না। তবে এদের পরামর্শ সব সময় গ্রহণ করার নিয়ম ছিল। বয়স ও অভিজ্ঞতার সম্মান দেওয়া সেকালের রীতি। উর্ধ্বতনরা বয়স্ক ও অভিজ্ঞ হেড-কনস্টেবলেরও পরামর্শ নিতেন।]

এই সুবন্দোবস্তের জন্যে ব্রিটিশ-শাসনের অনুগামীদের সংখ্যা বাড়ে। অসন্তোষের কোনো কারণ নেই। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তখনও সুলভ্য। কর্মীরা জানতো যে তাদের মৃত্যু হলে একটি পুত্রের চাকরি নিশ্চয়ই হবে। বংশানুক্রমে সরকারী কর্মীরা স্বভাবতই দক্ষ ও অনুগত। এজন্য বিপ্লব-আন্দোলনে বেশি সমর্থক ছিল না। শান্তি ও নিরাপত্তাই সাধারণ মানুষের কাম্য। ভূমিস্বত্ব শ্রমিক-আইনে কৃষক ও শ্রমিক-স্বার্থ রক্ষিত। এটি কৃষক-সম্প্রদায় পূর্বে কল্পনাও করে নি। বেশি লোক জমির মালিক হওয়ায় বহিরাগত শ্রমিকদের প্রাধান্য ঘটে। অন্যদিকে ভাগ-বাঁটোয়ার ফলে ভূমির পরিমাণ সংকীর্ণ হয়ে যাওয়ায় কৃষির ক্ষতিও হয়। (সাম্প্রতিক জবর-দখল জমি-বণ্টনে ফল শুভ হয় নি।)

কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহেরু গান্ধীবাদ হতে সরে গিয়ে স্বরাজ দল গঠন করলেন। ওঁরা কাউনসিলে ঢুকে কাউনসিল ভাঙতেন। এই কাজে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সাহায্য প্রয়োজন। চিত্তরঞ্জন সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে খুশি রাখার জন্য বললেন, 'শতকরা পঞ্চান্নটি চাকরি তোমাদের রইল।' কিন্তু লোভে লাভ ও হিংসায় হিংসা বাড়ে। একমাত্র ত্যাগ দ্বারাই স্বাধীনতা সম্ভব। চতুর ইংরাজরা তখন তাদের শতকরা আশি শতাংশ চাকরি দিতে প্রস্তুত। বিপ্লবীদল বুঝেছিল যে কতিপয় ত্যাগী তরুণই স্বাধীনতা আনতে সক্ষম। নইলে ভাগাভাগি ও রেষা-রেষির অন্ত থাকবে না। দেশের জন্য মরণ-পণ আত্মত্যাগে তারা এগিয়ে এলো। পথে-ঘাটে ইংরাজ ও দেশীয় রাজপুরুষরা নিহত হতে থাকে। গোয়েন্দা-বিভাগের কর্মীরা সকালে বেরুলে সন্ধ্যায় ফেরার নিশ্চয়তা নেই। উভয় পক্ষের বহু ব্যক্তি প্রতিদিন শহীদ হতে থাকে। ক্রমাগত নিহত হওয়ার সংবাদ। বাসস্থানের চতুর্দিকে তারের জালের বেড়া দেওয়া হ'ল। সামনে-পিছনে সশস্ত্র পাহারা। তাদের সঙ্গে সশস্ত্র ছদ্মবেশী রক্ষী। তবুও বিপ্লবীদের আক্রমণ হতে সবাইকে রক্ষা করা যায় নি।

হাতপাতাল হতে মধ্যে-মধ্যে পুষ্পাচ্ছাদিত শবাধার বার হয়। সামনে-পিছনে উর্ধ্বতন ও অন্যদের সশস্ত্র মিছিল। কোয়ার্টারের সামনে শবাধার কিছুক্ষণের জন্য নামানো হয়। আলুথালু সদ্যবিধবা স্ত্রী ছুটে এসে শববক্ষে লুটিয়ে পড়ে। বাড়ির লোক অতিকষ্টে তাঁকে তুলে ভিতরে নিয়ে যায়। চতুর্দিকে বুক-চাপড়ানি ও

ক্রন্দনরোল। উর্দিপরা শবানুগামীদের চোখের পাতা সিক্ত হয়। শ্মশানে লাস্ট বিউগিল বাজলে তারা একে-একে স্যালুট করে ফিরে আসে। কিন্তু এতসত্ত্বেও কোনো বাঙালী-অফিসর কর্মত্যাগ করে নি। গোয়েন্দা-বিভাগ হতে বদলীর চিন্তাও নেই। ইংরাজরা ভীরু বলবে এ-অপবাদ তাদের অসহ্য।

[পরে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, মাখনলাল ঘোষ ও লোকনাথ বল প্রভৃতির মুখে শুনেছি যে এজন্য তাঁরা দুঃখিত। পুলিশ-কর্মীদের বীরত্বে ও সাহসে তাঁরাও মুগ্ধ। তবে থানা-কর্মীরা তাঁদের লক্ষ্য ছিল না কখনও।...দুর্বৃত্ত দমনে উর্দিপরা পুলিশও নিহত হ'ত বটে কিন্তু তাদের পরিবারের সুযোগ-সুবিধা নেই। পূর্বোক্তদের কন্যার বিবাহ, পুত্রের শিক্ষা ও চাকুরি এবং বিধবার ভার সরকার নিতো।]

জনৈক গোয়েন্দা-কর্মীর গৃহে এক মূর্খ তরুণ ভৃত্যরূপে নিযুক্ত হ'ল। এই কর্মীটির কন্যা ও পুত্রের নিকট সে ইংরাজি শিক্ষা করলো। ওদিকে বিপ্লবীরা যথারীতি গোপন সংবাদ পাচ্ছিল। এই-সব সংবাদের গোপন-কেন্দ্র হিসাবে, সন্দেহবশত, অবশেষে গোয়েন্দা-গৃহেই থানা-তল্লাস। জানা গেল, ওই তরুণ গ্র্যাজুয়েট এবং ধনীপুত্র। বাড়ির কন্যাটি পরে তার বধূ হয়।

এর বিপরীত ঘটনাও বহু ঘটেছে। গৃহস্থ বাড়িতে এক তরুণ পাচকরূপে নিযুক্ত হ'ল। বাড়ির বড়োমেয়ের পাতে সে বেশি করে মাছ দিতো। মেয়েটি এজন্য ভর্ৎসনা করে। সমবয়স্ক তরুণেরা কিন্তু তার অনুগত হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে ওই ভৃত্য একজন গ্র্যাজুয়েট পুলিশ-কর্মী। মায়াবদ্ধ হয়ে সে দুর্বলতা স্বীকার করে এবং কর্মে ইস্তফা দেয়। তার পক্ষে ওদের সর্বনাশ করা সম্ভব নয়। পরে ওই কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছে।

বহু সরকারী কর্মীর বাড়িতে ছেলেরা গোপনে চরকা আনে। গান্ধীজীর ও আলী-ভ্রাতৃদ্বয়ের ফটো ঘরে রাখে। কাজী নজরুলের 'অগ্নিবীণা' কিনে আনে। উচ্চপদস্থ পুলিশ-পিতা তাই দেখে চরকা আছড়ে ভাঙলেন। তারপর মুষ্টিবদ্ধ করে গান্ধীজীর ফটোর পানে দৌড়লেন। ফটোর কাছে গিয়ে মুঠি শিথিল, থমকে দাঁড়ালেন। আঘাত হানা সম্ভব হ'ল না। ভদ্রলোক গজরাতে গজরাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এই রকম বহু বাড়িই প্রকাশ্যে বা গোপনে আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট। মাঝে-মাঝে আমরাও সংযুক্ত হয়েছি। কিন্তু অভিভাবকদের ভয়ে বেশিদূর অগ্রসর হই নি।

পরীক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানলাভ করা তরুণরাই সাধারণত ডেটিনিউ হ'ত। ফলে সর্বভারতীয় পরীক্ষায় বাঙালী পিছিয়ে পড়েছিল। কোনো-এক উর্দিপরা

পুলিশ-কর্মীর পুত্রের ধারণা হ'ল যে তার পিতা বিপ্লব-মন্ত্র সহপাঠীদের উৎপীড়ন করছেন। প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে সে পিতাকে একটি পত্র লিখে হোস্টেলে আত্মহত্যা করলো। সংবাদ পেয়ে ভদ্রলোক ছুটে এসে ওই পত্র দেখে রেগে বললেন, 'এঃ, বেটা আবার উপদেশ দিয়েছে!'...বলছেন আর গাল বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে। এই ভদ্রলোককে অবসর নেওয়ার পর কাশী বিশ্বনাথ-ঘাটে মালাজপ করতে দেখা যেতো।

এ সময়ে আমি ও আমার ভাই হিরণ্ময় সাহিত্য-সেবায় ব্রতী হই। স্বদেশ-প্রেমের এ-ও এক বিকল্প পন্থা। ভ্রাতৃবন্ধু প্রতুলচন্দ্র গুপ্তের হস্তলিখিত 'কণা' পত্রিকায় লিখলাম। এঁর পিতা অতুলচন্দ্র গুপ্তকে দেশভক্তির অপরাধে হাইকোর্টের জাজয়তী করতে দেওয়া হয় নি। ওই বাড়ির কন্যাকে জনৈক সিভিলিয়ান বিবাহ করলে গভর্নমেণ্ট বিরূপ হন। তখন সিভিলিয়ান-স্বামী বলেছিলেন যে স্ত্রীকে তিনি যোগ্য-পত্নীরূপে গড়ে তুলবেন।

নিজেরাও পরে হস্তলিখিত পত্রিকা 'সাজি' বার করলাম। ততদিনে সৌরীন্দ্র-মোহন মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্যিকের সংশ্রবে এসেছি। সাহস করে 'কল্লোল' পত্রিকায় একটি লেখা পাঠালাম। দীনেশরঞ্জন সেন ও গোকুলচন্দ্র নাগের লেখাটি (নীচের সমাজ) পছন্দ হওয়ায় পত্রস্থ করেছিলেন। উল্লেখ্য এই-যে একবার মহিলার ছদ্মনামে আমি লেখা পাঠাই। সেটি ছাপা হবে জেনে স্বনাম ব্যবহারের অনুরোধ জানাতে পত্রিকা-অফিসে গেলাম। এক সাহিত্যিক-ভদ্রলোক তাই শুনে বলে ওঠেন, 'খোকা, উনি তো তোমার দিদি...তাঁকে বোলো একদিন আলাপ করবো।' আমি প্রবলবেগে ঘাড় নেড়ে ওটা আমারই লেখা বলায় তিনি বেশ লজ্জিত হয়েছিলেন।

যাঁরা সোজাসুজি দেশোদ্ধারে ব্রতী হতে সাহসী হতেন না তাঁরাই সে-সময়ে বিকল্প পন্থা সাহিত্য-কর্মে আত্মনিয়োগ করতেন। (কিছুকাল পরে অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখের সঙ্গেও পরিচিত হলাম।) ডঃ সত্যচরণ লাহা, বিমল লাহা, ডঃ নরেন লাহা ও ডঃ বিনয় সরকারের সঙ্গে আলাপ হয়। আমার বিজ্ঞান-সম্পর্কিত একাধিক প্রবন্ধ ডঃ লাহা সম্পাদিত 'প্রকৃতি'-তে প্রকাশিত হয়। এ সবই আমার দেশ-সেবার নিরাপদ প্রকাশ বলে মনে করেছি।
সাউথ-সুবারবর্ণ কলেজে (এখন আশুতোষ কলেজ) স্টুডেণ্ট-ইউনিয়ন স্থাপিত হলে তার প্রথম সেক্রেটারি হই। তখন তা ছিল সাহিত্য ও দেহচর্চাতেই মাত্র সীমাবদ্ধ। তবুও আমি গোয়েন্দা-পুলিশের নজরে পড়ে গেলাম। সরকারী-

কর্মীদের ছেলেদের উপর দৃষ্টি রাখা তখন রীতি। আমার জ্যেষ্ঠতাত উচ্চপদস্থ পুলিশ-কর্মী হওয়া সত্ত্বেও তিনি তা জানতে পারেন নি। কিন্তু আমাদের কলেজের প্রিনসিপ্যাল পঞ্চানন সিংহ মহাশয় তা জানতে পেরেছিলেন।

[বহুপরে, এক-পয়সা ট্রামভাড়াবৃদ্ধিকালে সশস্ত্র পুলিশ সহ ফুটের এপারে দাঁড়িয়ে আছি। ওয়ারলেসে আশুতোষ কলেজে প্রিনসিপ্যালের সঙ্গে দেখা করার হুকুম এলো। তখন চতুর্দিকের ছাদগুলি হতে ইষ্টক বর্ষণ হচ্ছে। ছাত্ররা কিছু সংগত কারণে বিক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ। তাদের কাছে গেলে লাঞ্ছিত হওয়ার সম্ভাবনা। তবু হুকুম যখন এসেছে তখন ইষ্টক বর্ষণ ভেদ করেই কলেজের গেটে গিয়ে পৌছুলাম। ছাত্ররা আমাকে ঘেরাও করে ফেললো। প্রিনসিপ্যাল সোমেশ্বরবাবু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বললেন. 'আরে, ইনি আমাদের কলেজের একজন প্রাক্তন কৃতী ছাত্র। এই কলেজ-ইউনিয়নের ইনি প্রথম সেক্রেটারি।' শুনে ছাত্রছাত্রীরা সমাদর করে আমাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন এবং চা-পানে আপ্যায়ন করলেন। ওঁরা আমার সাহিত্য-রচনার সঙ্গে পরিচিত। এখন আমার পূর্ব বিবরণ শুনে তাঁদের মনে বিস্ময়। আমি যে একজন পুলিশ-অফিসর তা তাঁরা বিশ্বাসই করতে চান না।]

ম্যালেরিয়া

স্বদেশী আন্দোলন বন্ধের ব্যাপারে ম্যালেরিয়া-রোগ ইংরাজদের প্রভূত সাহায্যে এসেছিল। এই রোগের প্রবল প্রকোপে শহরাঞ্চল ব্যতীত গ্রামাঞ্চলে কোনো ব্রিটিশ-বিরোধিতা প্রসারলাভ করে নি। অন্তত পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলকে এই রোগ বিশেষভাবে পঙ্গু করে রেখেছিল। এজন্য সেই সময়ে গভর্নমেণ্টের পক্ষ হতে ম্যালেরিয়া-দমনে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি।

বিঃ দ্রঃ—সড়ক নির্মাণকালে বর্ধমানে কিছু বাঙালী শ্রমিক এই রোগে আক্রান্ত হয়। পুরাতন জেলা-গেজেটে একে 'বর্ধমান ব্যাধি' বলা হয়েছে।

হাইটালি কমিশন তাঁদের রিপোর্টে মন্তব্য করেছিলেন : ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত পশ্চিমবঙ্গ হতে শ্রমিক সংগ্রহ করা যেন না হয়। বাঙালী শ্রমিকের বদলে বহির্বঙ্গ হতে শ্রমিক আনা হ'ল। ব্রিটিশ সামরিক বিভাগের রিপোর্টে একাধিকবার উল্লেখ আছে যে ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত অঞ্চল হতে সেনা-সংগ্রহ করা বন্ধ হোক।

[এ-সব কিন্তু অজুহাত মাত্র। তাঁরা জানতেন বাঙালী শ্রমিকদের উপর উৎপীড়ন

অসম্ভব। আত্মসম্মানবোধ তাদের প্রখর। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, নীল, কৃষক ও পাইক-বিদ্রোহের স্মৃতি ওঁরা ভোলেন নি।]

এই ব্যাধির জন্য বাংলাদেশে পরিবার-পরিকল্পনার প্রয়োজন হয় নি। ব্যবসায়ী জমিদারগণের চিন্তা: তারা মারা গেলে জমি খাস হবে। উপরন্তু, বাংলা প্রদেশ-পুলিশের কর্মীরাও এতে পর্যুদস্ত। ভয়ে রাজপুরুষরা জেলায় প্রবেশ করতে চান না। অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা গ্রাম পরিত্যাগ করে শহরে আশ্রয় নেয়। নেতৃত্বহীন গ্রাম-সমাজ অন্ধকারে ডুবে থাকে।—এই ব্যাধির অসহনীয় ভয়াবহতা নিম্নোক্ত গণ-গল্পটিতে পরিস্ফুট।

উলো-গ্রামের জমিদারের কুস্তিগীররা তখন ভারতে অপরাজেয়। কিন্তু এই সময় ম্যালেরিয়া রোগে তারা শক্তিহীন ও দুর্বল। এক নামী পশ্চিমী পালোয়ান গ্রামে এসে তাদের সংগ্রামে আহ্বান করলো। জমিদার তখন প্রমাদ গুণে বলেন, 'ঠিক হ্যায় পালোয়ানজি। হামার পালোয়ান মহাল মে গয়া। কুছ রোজ বাদ উনে লোটবে। আভি আপ খাও দাও আউর পুকুরমে আস্নান করো।'—কদিন পর ওই পরদেশী পালোয়ান জ্বরে কাঁপতে-কাঁপতে এসে বললে, 'হুজুর, এ মেরা ক্যা হুয়া?' একটু হেসে জমিদারবাবু বলেন, 'মেরি পালোয়ান আব তুমকো পাকড় লিয়া। আভি তুম জান তো পয়লা বাঁচাও।'

প্রত্যেক গ্রামীণ পরিবারের আবালবৃদ্ধবনিতা পর্যায়ক্রমে জ্বরে ভুগে কম্বল মুড়ি দিয়ে ওষুধের শিশিহাতে কাঁপতে-কাঁপতে ডাক্তারবাড়ি দৌড়োয়। কোনও গ্রামে পাশ-করা ডাক্তার নেই। অন্যদিকে ডি. গুপ্ত কোম্পানীর মালিক ওষুধ বিক্রি করে লক্ষপতি হন। হাড়জিরজিরে পেট-মোটা শিশুরা সংখ্যাহীন। নীল শিরায় তাদের দেহ ঢাকা। ক্ষীণ গলদেশে একরাশ মাদুলি। নোংরা একটি মাদুলি মুখে পুরে তারা চোষে।···বুড়োশিবের মাথায় ঢালা-জল চরণামৃত হয়ে নালা বেয়ে গর্তে জমেছে। মায়েদের বিশ্বাস ওই থকথকে পোকাপড়া পাদোদক শিশুদের পান করালে তারা ব্যাধিমুক্ত হবে। বহু গ্রামের নাম তখন তে-এঁটে গ্রাম। অর্থাৎ একজন মরলে পর-পর তিন ব্যক্তি মরবে। কলেরা-রোগীর কাপড় পানীয় পুষ্করিণীর জলে ধৌত করতে বাধা নেই। বসন্তের টীকা নেওয়া বা দেওয়ার প্রশ্ন সেখানে ওঠে না।

বিঃ দ্রঃ—বাঙালী কিন্তু ওই মহামারীতে মরে নি। তাদের শরীরে জীবাণু সম্পর্কিত ইমামিউনিটি তথা প্রতিষেধক ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়। অবশ্য এজন্য দু-পুরুষ অপেক্ষা করতে হয়েছিল। বহিরাগত ব্যক্তিরা গ্রামাঞ্চলে এলে মৃত্যু অনিবার্য ছিল।—ধন্যবাদ! ডাক্তার গোপাল চট্টোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ। তিনি একক প্রচেষ্টায় গ্রামে-

গ্রামে ম্যালেরিয়া-নিবারণ-সমিতি স্থাপন করেন। ছাত্রাবস্থায় আমি এ কাজে তাঁর অন্যতম সহকারী ছিলাম।
তাঁর পত্রিকা 'সোনার বাংলা'র আমি অন্যতম লেখক। নিজেদের গ্রাম সহ বহু গ্রামে ম্যালেরিয়া-নিবারণ-সমিতি স্থাপন করেছি। তরুণদের সংঘবদ্ধ করে জঙ্গল সাফ করেছি ও পুকুরে কেরোসিন তেল ঢেলেছি। এটিকে আমি আজও এক গর্বের বিষয় বলে মনে করি। ডাক্তার চট্টোপাধ্যায় গ্রামীণ সংস্কারগুলিতে বাধা দিতে মানা করতেন। তাঁর নির্দেশে শিবের চরণামৃতের গহ্বর ও তৎসংলগ্ন নালা সিমেণ্ট দিয়ে পাকা করে প্রতিদিন ওই জল বদলানোর ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামে-গ্রামে দাই-ট্রেনিং ও কালাজ্বর নিবারণ-কেন্দ্র স্থাপন করি। কলেরা ও কালাজ্বরের ইনজেকশনের ব্যবস্থা হয়। ডাক্তার, ঔষধ ও আনুষঙ্গিক ব্যয়বাবদ যা-কিছু খরচ তার অর্থ ডাক্তার চট্টোপাধ্যায় নিজে বহন করতেন। বক্তৃতায় পারদর্শিতার জন্য আমাকে তাঁর পছন্দ হয়েছিল।
[সেই কালে গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের সংস্পর্শে এসে বহু মহিলা-সমিতি স্থাপন করি। সরোজ-নলিনী ইনস্টিটিউটে স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত আমি কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ছিলাম। ওদের পত্রিকা 'বঙ্গলক্ষ্মী'-তে বেনামে লিখতাম। ডাক্তার চট্টোপাধ্যায়ের হোমক্র্যাফট এসোসিয়েশনেরও আমি কর্মী। এজন্য কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে সব্‌জির দোকান নেওয়া হ'ত। প্রত্যেক গৃহস্থের বাগানের তরকারি ও পোলট্রি-জাত দ্রব্য এই দোকানে পাঠানো হ'ত।]
এতেও কিন্তু প্রতিবন্ধকতার অন্ত ছিল না। পুকুরের পানা তুললে মালিক হুংকার দিয়েছে: 'কার হুকুমে পানা তুলছো? এ পানা আবার পুকুরে ফেল।' ম্যালেরিয়ানিবারণী সমিতির সভার আলোচ্য বিষয় সমূহের আলোচনা এক-বাড়িতে না হয়ে অন্য-বাড়িতে হ'ল কেন? ইত্যাদি। ওই সময়ে আমি গ্রামে একটি নাইট স্কুল, কিছু টিউবওয়েল, গ্রন্থাগার ও দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করি। এই স্কুল দুটির একটি পরে সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত হয়। মাদরাল-নারাণপুর ইউনিয়ন বোর্ডের নাম পরিবর্তন করে মাত্র নারাণপুর করা হলে আমি ডিসট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বারদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে পূর্বনাম বহাল করি। তখন জানা যায় যে জয়নগর-মজিলপুর প্রভৃতি বহু যুগ্ম নামের পৌরসভা ও ডাকঘর আছে। ওই কালে আমার উল্লেখ্য কাজ: স্বগ্রাম মাদরাল হতে নৈহাটী পর্যন্ত দু-মাইল দীর্ঘ রাস্তা তৈরি। নিজেদের বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত এজন্য ভূ-দান রূপে আমাকে দিতে হয়।
সে সময়ে সামান্য ভুলে আমার জীবনের গতিপথ সম্পূর্ণ বদলে গেল। আমি ও

আমার ভ্রাতা হিরণ্ময় হুগলীতে কাজী নজরুলের সঙ্গে দেখা করি। আমরা জানতাম না যে কাজীর বাড়িতে পুলিশ-পর্যবেক্ষণ আছে। যখন কলকাতায় ফিরলাম, উচ্চপদস্থ পুলিশ-কর্মী জ্যেষ্ঠতাত চিৎকার করে বললেন, 'আমি এখানে সশরীরে উপস্থিত রয়েছি, কাজীর বাড়ি যাবার আগে একবার জিজ্ঞাসা করতে পারলে না?'—পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট স্বয়ং তাঁর কৈফিয়ৎ চান। জ্যেষ্ঠতাত বলেন যে ওদের দুজনকে আর গ্রামের বাড়িতে পাঠাবো না। টেগার্ট মন্তব্য করলেন, 'নো নো। ছাট ডনট্ সল্‌ভ্ প্রবলেম। পুট দেম ইনটু পুলিশ।'

[গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর আমি সর্বভারতীয় তৃতীয় হয়েছিলাম। কিন্তু সাম্প্রদায়িক নিয়োগে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী বর্ণহিন্দু চাকুরি পেলো। আমার বহু নিম্নস্থান হতে খৃস্টান, অ্যাংলো ও মুস্লিমদের নেওয়া হ'ল। অথচ আমার তখন চাকুরি প্রয়োজন। সবে এম-এস-সি পাশ করে ডঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর অধীনে গবেষণা শুরু করেছি হেনকালে টেগার্ট সাহেবের ইচ্ছায় ও জ্যেষ্ঠতাতের নির্দেশে আমাকে কলিকাতা-পুলিশে ঢুকতে হ'ল। তবে ভ্রাতা হিরণ্ময় (পরে ডক্টর) সিভিলিয়ন হওয়ার অজুহাতে রেহাই পেয়ে গেল।

তৎকাল পুলিশ-ট্রেনিং স্কুলে জাত-বিচার ছিল অত্যধিক। অ্যাংলো সার্জেণ্টদের সঙ্গে দেশীয় অফিসরদের যথেষ্ট প্রভেদ। পুলিশ-ট্রেনিং স্কুলে অ্যাংলো উর্ধ্বতনরা শিক্ষার্থীদের নানাভাবে ক্লেশ ওজঘন্য গালি দিতো। দাস-মনোভাবে অভ্যস্ত করার জন্যেই এ-সবের প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন দশ মাইল দৌড় করানো হ'ত। অ্যাংলোরা মদ্যপানজনিত বাড়তি এনার্জির অধিকারী। তাই তারা শারীরিক পরিশ্রম কিছু বেশি সহ্য করতে পারে। উপরন্তু তাদের পড়াশুনা না থাকায় যথেষ্ট বিশ্রাম পায়। অত্যাচারের ফলে বহু দেশীয় কর্মী কাজে ইস্তফা দিতো। জাত তুলে গালি দেওয়ায় আমিও তাই করি এবং অভিযোগে মুখর হই। চার্লস টেগার্ট আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং আনুপূর্বিক সব শুনলেন। তারপর থেকে প্যারেডের ভার অ্যাংলোদের পরিবর্তে এক দেশীয় সুবাদারের উপর অর্পিত হ'ল। কনডেম্‌ড ও সাস্‌টেনডেড শিক্ষক-অফিসরদের বদলে দক্ষ কর্মীদের আইনের শিক্ষক করা হ'ল। টেগার্ট সাহেব আমাকে সরাসরি বড়বাজার থানার অফিসররূপে বহাল করলেন। এই রকম প্রত্যক্ষভাবে আমার পুলিশী জীবন শুরু হল।

[একালে রায়বাহাদুর কালীসদয় ঘোষাল, বৈদ্যনাথ মুখার্জি, কুঞ্জবিহারী মুখার্জি, পান্নালাল ব্রহ্মচারী, নারায়ণ চ্যাটার্জি, গগনেন্দ্রনাথ, রায়বাহাদুর নলিনী মজুমদার, রায়বাহাদুর বনবিহারী মুখার্জি, খানসাহেব মহম্মদ ইসমাইল, শামসুদ্দীন

জোহা, রায়সাহেব জগৎ বাগচি প্রভৃতি উল্লেখ্য অফিসর। এঁদের অনেকেই তখন অবসরগ্রাহী ও অন্যেরা একে-একে অবসর নিচ্ছেন। এঁরা প্রায় সকলেই ডেপুটি ও অ্যাসিসটেণ্ট কমিশনার হন।]

চার্লস টেগার্ট

ইনি কলিকাতা-পুলিশের সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য পুলিশ কমিশনার ছিলেন (১৯২৫-৩২)। এ সময় কলকাতার সমস্যা অধিকতর জটিল হয়। বিপ্লবীদের গোপন সংগঠন আরও জোরদার। এই বিপ্লবীদের রুখতে শান্ত-প্রকৃতির পূর্বতন কমিশনার ক্লার্ক সাহেব সক্ষম হন নি। চার্লস টেগার্ট পুলিশ কমিশনার হওয়ার পর তাঁদের দমনে আত্মনিয়োগ করলেন। প্রদেশ-পুলিশের (আই-বি) বিপ্লবী দমন বিভাগও তাঁর আজ্ঞাধীন। বাংলা-পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল লোম্যান সাহেবও তাঁকে সমীহ করতেন। বিপ্লবীরা এই লোম্যান সাহেবকে নিহত করে। কিন্তু বহুবার চেষ্টা সত্ত্বেও টেগার্ট সাহেবের মৃত্যু ঘটাতে পারে নি। স্যর চার্লস টেগার্টের আকৃতি ও প্রকৃতি দেখে একটিমাত্র উপমা মনে আসে, পুরুষ-শার্দূল। একটা অদ্ভুত-দর্শন কুকুর সর্বদা লেজ তুলে তাঁর সঙ্গে থাকে। এই জীবটি তাঁর আগে-আগে চলে। বিপদের গন্ধ পেলে সে তার লেজ নামায় এবং সকলকে সতর্ক করে দেয়। বাঙালী বিপ্লবীদের আক্রমণ থেকে এই কুকুর বহুবার তাঁকে রক্ষা করেছে।

তিনি মৌর্য-সাম্রাজ্যের সময় গুপ্তচর সংগঠনের পদ্ধতি ও প্রণালী সম্বলিত বহু ইংরাজি পুস্তক পাঠ করেন এবং তদানুযায়ী কলিকাতা-পুলিশে স্পেশাল ব্রাঞ্চে ও বাংলা-পুলিশে ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চে পরিবর্তন আনেন। বিপ্লবীদের মধ্য হতে অর্থ দ্বারা চর-সংগ্রহের আধুনিক রীতির তিনি স্রষ্টা। ওয়াচ করা তথা নজরবন্দী, ফলো করা তথা অনুসরণ, সোর্সদের সহিত গোপনে সাক্ষাতের রাজনীতি ডিসাইফারিং বিদ্যা, গুপ্তলিপি ও সংকেতলিপি প্রভৃতির তিনি প্রবর্তক। এই গুপ্তবিদ্যার ফলিতজ্ঞান পুলিশ-কর্মীদের তিনি উৎসাহ দিতেন। বাঙালী অফিসরদের এ বিষয়ে মগজ-ব্যবহারের স্বীকৃতিও দিতেন। তল্লাসীকালে কোটের নিচে লৌহবর্ম ও হস্তে ঢাল পিস্তল রাখার ব্যবস্থা তিনি করেন। অফিসরদের সহিত সশস্ত্র আর্দালি রাখা তাঁদের বাড়িতে সশস্ত্র প্রহরা, বাড়ির জানালা লৌহজালে আবৃত করার সুবন্দাবস্ত করেন। গুপ্তচরদের প্রাপ্য অর্থ সংগ্রহকারী কর্মী ঠিকমতো দিচ্ছে কিনা তা তিনি নিজে পরীক্ষা করতেন। এই সংবাদ-সরবরাহকারী চরদের

নাম ও নম্বর সংশ্লিষ্ট অফিসর (সংগ্রহকারী) ও তাঁদের ঊর্ধ্বতন ডেপুটিরা মাত্র জানতেন। বিভিন্ন সোর্স ও বিভিন্ন সূত্র হতে সংগৃহীত সংবাদ একরূপ হলে তা বিশ্বাস্য হ'ত। তখন তার উপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট বিপ্লবীকে আটক বা ডেটিনিউ করা হ'ত। একস্‌পোজড চরদের কিছু অর্থদান করে বাতিল করার নিয়ম। কখনও জেলে রেখে তাদের রক্ষা করা হয়েছে (ভারত রক্ষা আইনে)। বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন স্থানে গুপ্তচরদের সাথে সাক্ষাতের নিয়ম হয়।

এ বাদে আরও একটি উপায় টেগার্ট সাহেব আবিষ্কার করেছিলেন। তখন অনুশীলন ও যুগান্তর পার্টি দুটি পরস্পর বিবদমান ছিল। কোনো একদলের লোককে গ্রেপ্তার করা হ'ত না। কিংবা গ্রেপ্তার করেও তৎক্ষণাৎ জামীন দেওয়া হ'ত। (জামীনে মুক্তির পর গোপনে তার অনুসরণ করা হ'ত।) কিন্তু অন্যদলের লোকদের প্রায়ই গ্রেপ্তার করা হ'ত এবং জামীন পেত না। এতে একদল অন্যদলকে গুপ্তসংবাদদাতারূপে সন্দেহ করতো এবং তার ফলে পরস্পর পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে পুলিশকে সংবাদ দিয়েছে।

কিন্তু ও-রকম পন্থায় ফল শুভ হয় নি। কিছু দুষ্ট কর্মী একই সংবাদ স্ব স্ব সোর্সের মুখে দিতো। কিছু ক্ষেত্রে সোর্সরা (এজেন্ট প্রপোগেটর) নিজেরাই দল তৈরি দলের তরুণদের ধরিয়ে দিতো। নিজেদের আদর্শবান দলনেতাকে সন্দেহ করে তারা পৃথক দল তৈরি করতো। তখন শত চেষ্টাতেও কর্তৃপক্ষ আর তাদের সংবাদ পেতেন না। একস্‌পোজড চরেরা চাকুরি না-পেলে পুলিশের গতিবিধি ও ঘরোয়া তথ্য বিপ্লবীদের জানিয়ে দিতো। এই ব্যবস্থায় কিছু নির্দোষী তরুণ বাঙালী ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। হিসাববিহীন সোর্স মানিই (Scorce money) অফিসরদের দুর্নীতিগ্রস্ত করে। এর প্রতিবাদে জনসাধারণ নিম্নোক্ত গণ-গল্পটি সৃষ্টি করেছিল।

ক-বাবু খ-বাবু গ-বাবু তিন গোয়েন্দা। ক-বাবু বললেন, 'ভাই খ, তুই প্রতিদিন কত সংবাদ সংগ্রহ করিস। আমি তো কিছুই পারি না।' খ-বাবু : 'তুই কফিখানায় গেলে বহু সংবাদ পাবি।' ক-বাবু : 'আরে ভাই আমি ওখানে বহুবার গিয়েছি। কিন্তু আমাকে দেখলেই ওরা চুপ করে যায়।' খ-বাবু : 'আমাকে দেখেও ওরা তাই করে। কিন্তু আমি নিজেই বহু বিষয়ে কথা বলে ওদের দিকে তাকাই, জিজ্ঞাসা করি, 'কি মশাইরা, আমি ঠিক বলেছি ?' যে ব্যক্তি হুঁ বলে আমি তার নামেই ওই কথাগুলি চালাই।' গ-বাবু চুপচাপ সব শুনছিলেন এবার তিনি বললেন, 'আমি কিন্তু অত কষ্ট করি না। সকালবেলা খবরের কাগজ পড়েই জানতে পারি কোন্ কোন্ নেতা শহরে উপস্থিত রয়েছে। তারপর তাদেরই নামে সত্যমিথ্যা সংবাদ উপরে পাঠিয়ে দিই। এতে আমি প্রতিমাসেই বহু রিওয়ার্ড পেয়েছি।'

স্যর চার্লস টেগার্ট পোস্ট-অফিসে পত্র ইণ্টারসেপ্ট প্রথার প্রবর্তক। ভেপারের সাহায্যে সন্দেহজনক ব্যক্তির খাম খুলে পত্র বার করে তা পড়ে আবার আঁটা হ'ত। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা কিছু জানতে পারতো না, মাঝখানে চিঠি পড়া হয়ে যেতো। এই ব্যবস্থা ব্যাপক ভাবে চালু হলে অসন্তুষ্ট জনগণ নিম্নোক্ত গণ-গল্পটি প্রতিবাদস্বরূপ তৈরি করে।

আয়ারল্যাণ্ডে আইরিশ-বিপ্লবীদের ভয়ে ইংরাজরা অতিষ্ঠ। তবুও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (বাঙালীদের মতো) কিছু আইরিশ তরুণ ইংরাজপক্ষে ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে লড়তে যায়। এক আইরিশ তরুণ-সৈন্য দেশ হতে স্ত্রীর পত্র পেলো। তাতে লেখা আছে যে সমর্থ যুবক প্রায় সকলেই যুদ্ধে চলে গেছে, আমরা মেয়েরা জমি চষতে তো পারি না শুধু চষা-জমিতে আলু বুনতে পারি। এবার আলুর চাষ করা সম্ভব হ'ল না।—আইরিশ স্বামী তৎক্ষণাৎ লিখে পাঠালো: 'খবরদার: জমি খোঁড়াখুঁড়ি কদাচ নয়। আমাদের ক্ষেতে বহুস্থানে বিপ্লবী-বন্ধুরা বোমা ও পিস্তল পুঁতে রেখেছে।' কদিন পরে স্ত্রীর নিকট হতে স্বামী ভদ্রলোক আবার এক পত্র পেলেন: 'ওগো মহাসর্বনাশ! গতকাল ভোর হতে ট্রাকটার এনে পুলিশ সমস্ত জমি চষে বেড়াচ্ছে। আমরা ব্যাপার তো কিছুই বুঝছি না।'—স্বামীর উত্তর: 'তোমাদের বোঝবার কিছু দরকার নেই। ওরা চলে গেলে তোমরা জমিতে শুধু আলু বুনে দিও।'

বাংলার বিপ্লবীদের টেগার্ট সাহেব নির্মমভাবে প্রদমিত করেছিলেন। কিন্তু এর ফলাফল বিশেষ শুভ হয় নি। বহু বিপ্লবী গান্ধীবাদে বিশ্বাসী হন। প্রকৃতপক্ষে কতিপয় বিপ্লবীর কয়টি বোমা ও পিস্তলকে ব্রিটিশরা ভয় করেন নি। তাঁদের সাম্রাজ্যের বিপুল বাহিনীর নিকট তারা নগণ্য। ব্যক্তিগতভাবে মাত্র কজন ব্রিটিশ ও দেশীয় ক্ষতিগ্রস্ত। এতে ব্রিটিশরা উদ্ব্যস্ত হতে পারে, ভয় পেতে যাবে কেন? গান্ধীজীর অহিংস-আন্দোলন ব্যাপকভাবে জনগণের মনে শিকড় গাড়লে দূরদর্শী ব্রিটিশ প্রভুরা ভয় পেলো। এই আন্দোলন সমগ্র দেশে প্রসার লাভ করতে বেশি দেরি হয় নি।

১৯২৬ খ্রীঃ কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হ'ল। সেই সঙ্গে যা-কিছু রাজনৈতিক আন্দোলন নিস্তব্ধ। একটু সময় পেলে রাজনীতির ক্ষেত্রে সমস্ত দেশের চেহারা অন্যরকম হয়ে যেতো। কিন্তু ব্রিটিশ বিরোধীরা তখন আত্মরক্ষার্থে ব্যস্ত। আন্দোলনের তাবৎ নেতৃবৃন্দ সাময়িকভাবে পিছু হটে এলেন। (এ রকম বাংলাদেশে বহুবার ঘটেছে।) ইংরাজদের ইচ্ছা বিনা-আয়াসে সিদ্ধ হ'ত কিন্তু তাতে বাদ সাধলেন জনৈক দেশীয় উর্ধ্বতন পুলিশ-কর্মী।

[গভর্নরের কাউনসিলের প্রতিজন সদস্য পূর্বের মতো ইংরাজ সিভিলিয়ন। দুজন দেশীয় ব্যক্তিকে কাউনসিলে কো-অপ্ট করা হয়। তাঁদের একজন কৃষ্ণনগরের মহারাজা এবং অন্যজন স্যর আবদার রহমন। শেষোক্ত ব্যক্তি ওই দেশীয় পুলিশ-উর্ধ্বতনের উপর বিরূপ হলেন। কৃষ্ণনগরের মহারাজা তাঁকে রক্ষা করতে অক্ষম। তাঁর একমাত্র সমর্থক স্যর চার্লস টেগার্ট। টেগার্ট সাহেব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিষ্প্রয়োজন মনে করতেন। তাঁর মতে উভয়পক্ষই এতে গভর্নমেণ্টকে দায়ী করে।]

পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী

রায়বাহাদুর পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী কলিকাতা-পুলিশের প্রথম দেশীয় ডেপুটি কমিশনার। সমগ্র ভারতেও তিনি প্রথম উর্ধ্বতন দেশীয় পুলিশ সাহেব। তিনি কনস্টেবলের পদ হতে দ্রুত প্রমোশনে এতো উপরে ওঠেন। ওই যুগে এটা ছিল এক বিরাট বিস্ময়। উত্তর-কলকাতার উত্তর-বিভাগে তিনি তখন কর্তা (শহরের সর্বাংশ)। তাঁর অধীন থানা পুলিশে তখন বন্দুক ছিল না। গভর্নমেণ্টের মতামতের অপেক্ষা না-করে শুধু লাঠির সাহায্যে ওই দাঙ্গার মূলোচ্ছেদ করলেন। এমন-কি তিনি প্রকাশ্যে বললেন যে গান্ধী আন্দোলন দমনের জন্য ওই দাঙ্গা বাধানো হয়েছে। জ্যেষ্ঠতাত রায়বাহাদুর কালীসদয় ঘোষাল সেই একই প্রতিবেদন দিলেন। এতে পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ীকে চট্টগ্রামের (পদাবনতি) অ্যাডিশন্যাল সুপার করা হ'ল। এই বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ উদাত্তকণ্ঠে বললেন যে, চাকুরির শর্তানুযায়ী কলকাতার বাহিরে তিনি যাবেন না এবং পদাবনতি তিনি মানতে রাজী নন। তাঁকে পেনসন নিতে না দিলে তিনি আদালতে যাবেন। তাঁকে অবসর গ্রহণে বাধ্য করা হ'ল। রায়-বাহাদুর কালীসদয়েরও ভবিষ্যৎ-প্রমোশন বন্ধ।

তদবধি সমস্যা সংকুল উত্তর কলকাতায় শুধু ইংরাজ ডেপুটি কমিশনার থাকতেন। পূর্ণচন্দ্রের পদে রায়বাহাদুর ভূপেন ব্যানার্জি প্রমোটেড হলেও তাঁকে দক্ষিণ-কলকাতার ডেপুটি করা হয়। ভূপেন ব্যানার্জি পণ্ডিত ও গবেষক ব্যক্তি। পূর্ব-সিভিলিয়নদের মতো কলিকাতা-পুলিশের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে নথী উদ্ধার করেন।

[মধ্যে মধ্যে বাংলার অন্যত্রও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানো হয়েছে। ফলে জাতীয়-তার বদলে বারে বারে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়েছে। মুস্লিমদের বোঝানো হয়েছে যে হিন্দুরা দেশ স্বাধীন করলে তাদের বিপদ। জাতীয়তাবাদী মুস্লিমরা সংখ্যালঘু। অথচ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা হিন্দুদেরই পছন্দ নয়। এই সম্পর্কে প্রতিটি

প্রচেষ্টাতেই বাঙালী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে দেশ-বিভাগ প্রশস্ত হলেও স্বাধীনতা আটকায় নি।]

এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় বড়োবাজারের ব্যবসায়ীরা আত্মরক্ষার জন্য বহু মির্জাপুরী গুণ্ডা কলকাতায় আনে। প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে তাদের হাতে বিপুল অর্থ। আমড়াতলা প্রভৃতি স্থানের মুস্লিম ব্যবসায়ীরা একই উদ্দেশ্যে গাজীপুরী গুণ্ডাদের শহরে আমদানি করে। কিন্তু দাঙ্গা-উত্তরকালে তারা কেউই ওদের ভরণপোষণ করে নি। এবার উভয় সম্প্রদায়ের গুণ্ডাদের মধ্যে দারুণ ভাব। তারা দেশে না ফিরে পথচারীদের অর্থ ও দ্রব্য কেড়ে নেয় এবং নগর-জীবন বিপর্যস্ত করে তোলে। তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী বা ফরিয়াদী হলে নিশ্চিত মৃত্যু। নিম্নোক্ত ঘটনাবলী হতে তার ভয়াবহতা বোঝা যাবে।

জনৈক মীনার পেশোয়ারীর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও তৎসহ হুলিয়া বার হয়। ব্যারিস্টার সুরাবর্দি সাহেব তাকে টেগার্টের ঘরে আনলেন। অভিযোগ, ইনস্পেক্টর প্রভাতনাথ মুখার্জি তাকে উৎপীড়ন করেছে। প্রভাত মুখার্জি বললেন, 'এই সেই জেলা খারিজ প্রক্লেমড অফেণ্ডার কুখ্যাত গুণ্ডা।' গ্রেপ্তার এড়াতে মীনার পেশোয়ার দৌড়ে বার হ'ল। পশ্চাৎধাবনকারীদের উদ্দেশ্যে মুহুর্মুহু গুলিবর্ষণ করে নেমে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। সুরাবর্দি সাহেব (তাকে সৎব্যক্তি বলার জন্য) ক্ষমা চান ও তা তিনি পান।

একদিন এক গুণ্ডা আহীর নিরেট মাথার ঢুঁ মেরে জমাদারের মাথা ফাটিয়ে দিলো। পল্লীর গুণ্ডার বিরুদ্ধে এক মানী ব্যক্তি দরখাস্ত পাঠান। পরদিন ওই গুণ্ডা পুলিশ-অফিসে পাঠানো দরখাস্তটি তাঁর চোখের সামনে মেলে ধরে বললে, 'বাবুসাব, এ কেয়া বাত? হামিলোক অপকা লেড়কা।'—এরা মাথার ঢুঁ ও পদাঘাতে পুলিশ কর্মীদের ধরাশায়ী করতো। নিভৃতে ছুরিহাতে এক গুণ্ডা জনৈক উকিলকে পাকড়াও করলো। কিন্তু তাকে উকিল বুঝে ব্যাগ সমেত ২০০ টাকা ফেরৎ দিলো। পরে সেই উকিলের বাড়িতে সে একদিন সাহায্যপ্রার্থী হয়। উকিলবাবু ফি চাইলে সে বলে, 'কী? ফি তো সেদিন ময়দানে আপনাকে দিয়েছি।'

[কিন্তু নিজপল্লীতে কাউকে উৎপীড়ন না করে তাদের নিরুপদ্রবে রেখেছে। জেলাখারিজ হলে নিজ পল্লীর বাড়ি বাড়ি ঘুরে গলবস্ত্র হয়ে বিদায় নিয়েছে। কুলনারীদের ও শিশুদের তারা যথেষ্ট মর্যাদা দিতো। অন্যদিকে নিজেদের পল্লীর গৃহস্থদের রক্ষার্থে প্রাণপণ করেছে। এইজন্য মান্যগণ্যদের নিকট হতে প্রায়ই তারা প্রশংসা-পত্র পেয়েছে।]

স্যর চার্লস টেগার্ট বিপ্লবীদের মতো গুণ্ডাদেরও নির্মমভাবে প্রদমন করেন। এজন্য তিনি সরকার কর্তৃক গুণ্ডা-এক্ট পাশ করান। লালবাজারের প্রখ্যাত অফিসর প্রভাতনাথ মুখার্জির অধীনে গুণ্ডা-ডিপার্টমেণ্ট স্থাপিত হ'ল। গুণ্ডা-আইনে সাক্ষীরা আসামীর অসাক্ষাতে গোপন সাক্ষী দেবার অধিকারী। অপরাধ প্রমাণিত হলে অপরাধীকে জেলা-খারিজ তথা একস্ট্যাণ্ড করে বাংলার বাইরে পাঠানো হ'ত। তারা বিনা অনুমতিতে ফিরে এলে কঠোর সাজা।

এই গুণ্ডাদমনে টেগার্ট সাহেব জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় হলেন। জব চার্নকের মতো তিনি বাঙালীর নিকট 'হিরো'। হঠাৎ চতুর্দিকে গুজব রটে তিনি ছদ্মবেশে ধুতি পরে ঘোরেন। কিন্তু এর মধ্যে সত্য ছিল না। তিনি এভাবে বেরুতেন না। অহেতুক বিপদের ঝুঁকি নেওয়া ট্যাক্‌টলেস কাজ। তবে প্রয়োজনে তিনি অসম সাহসিকতা দেখাতেন। একবার তাঁর রটে যে আইরিশম্যান হওয়ায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তিনি প্রতিবাদ করে বলেন যে তিনি আইরিশম্যান নন, গুণ্ডা দমনার্থে বহাল তবিয়তেই আছেন।

টেগার্ট সাহেব বিপ্লীদের অর্থকরী প্রশিক্ষণের জন্য কয়েকটি কর্মপদ্ধতি ছকে রাখেন। দমদম ক্লাইভ-হাউসের ডেটিনিউদের ওরূপ কর্মশালা আমি নিজে দেখেছি। জ্যেষ্ঠতাত কালীসদয় ঘোষাল অবসর গ্রহণের পর তাঁদের অধিকর্তা হয়েছিলেন। জার্মানী হতে মূল্যবান মেসিন এনে তাঁদের সেগুলির মালিক করা হয়। বহু বিপ্লবী তরুণকে উচ্চশিক্ষার জন্যে তিনি সুদূর ইউরোপেও পাঠান।

তিনি ওই-সব দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের বোঝাতেন, ভারত সাম্প্রদায়িক-দোষে দুষ্ট এক বিরাট দেশ। এক অঞ্চলের সৈন্যদ্বারা অন্য অঞ্চল দমানো যায়। একবার কেউ এদেশ দখল করলে তাদের হঠানো কঠিন। তাই এভাবে দেশের স্বাধীনতা আনা কোনদিনই সম্ভব নয়। তিনি তাদের এও বলেছিলেন যে তিনি ভারতীয় হলে এই একই কাজ করতেন।

টেগার্ট সাহেব ফরাসী-চন্দননগরে অবৈধ-প্রবেশ করে পলাতক চট্টগ্রাম-বিপ্লবীদের ঘাঁটি দখল করেন। তাঁকে হত্যা করতে গিয়ে ভুলে এক নিরীহ ইংরেজকে হত্যা করেন বিপ্লবী গোপীনাথ। বিপ্লবীদের দ্রুত বিচারের জন্য ট্রাইবুন্যাল-প্রথা তাঁর আদেশেই সৃষ্ট হয়। এইরূপ আদালতের প্রেসিডেন্ট সর্বক্ষেত্রে একজন ইংরাজ হতেন।

[বিঃ দ্রঃ—একটি রিক্রুটিং বোর্ডের সভাপতি ছিলেন তিনি। আমি একবার তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হই। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'হোয়াট ইজ ইওর ন্যাশানাল সঙ?' —আমাদের জাতীয় সংগীত নেই কিংবা 'গড সেভস দি কিঙ'ই আমাদের জাতীয়

সংগীত বললে তিনি ধরে নিতেন আমাদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের অভাব। তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলাম : 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।' আবার প্রশ্ন : 'হোয়াই নট বন্দে মাতরম্?' প্রত্যুত্তর : 'ওটি একটি রাজনৈতিক পার্টির সংগীত। কিন্তু 'ধন ধান্য' সকল শ্রেণীর নাগরিকের গ্রহণযোগ্য।'—অন্য দুজন মেম্বারের মতামত তোয়াক্কা না করে তিনি বললেন, 'ওয়েল বয়, আই হ্যাভ টেকেন ইউ।' বস্তুতপক্ষে তাঁর ব্যক্তিত্ব অসাধারণ ছিল।

[শীঘ্রই বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে তাঁর ডাক পড়ল। প্যালেস্টাইনে ইহুদী ও আরব বিপ্লবীদের দমনে তিনি নিযুক্ত হলেন। প্যালেস্টাইন বিভক্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি উভয় সম্প্রদায়ের অবস্থান-ক্ষেত্রের মাঝামাঝি 'টেগার্ট-ওয়াল' তৈরি করেন। কিন্তু সম্প্রসারণকামী ইহুদীরা ওই টেগার্ট-ওয়াল বারুদের সাহায্যে উড়িয়ে দিলো।]

টেগার্ট সাহেব বাংলায় ও প্যালেস্টাইনে বিপ্লবী দমনের জন্য খ্যাত। অন্যদের মতে দুই স্থানেই তিনি বিপ্লবী-দমনে ব্যর্থ হন। ভারত-ত্যাগের পূর্বে তিনি আমাকে কলিকাতা-পুলিশে পুনর্নিয়োগ করে যান।

[বিঃ দ্রিঃ—এইকালে মহিলা-পুলিশ অকল্পনীয় ছিল। অপরাধিনী স্ত্রীলোকের দেহ-তল্লাসীর কাজে পথ থেকে ভুজাওয়ালীকে ডাকা হ'ত। এ সময়ে বিপ্লবিনী তরুণীরাও হত্যাকার্যে লিপ্ত হয়। চট্টগ্রাম ইংরাজ-ম্যাজিস্ট্রেটকে ওরাই হত্যা করে। কলকাতায় কনভোকেশন হলে গভর্নরকে লক্ষ্য করে বীণা দাস গুলি ছোঁড়েন। এই ঘটনার সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। বোঝা গেল যে তরুণী বীণা দাস পিস্তল ছোঁড়ায় ঠিক অভ্যস্তা নন কিংবা এই প্রথম পিস্তল ছুঁড়লেন। তাঁর হাত কাঁপছিল বলে পিস্তলের প্রতিটি গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছিল। এ অবস্থায় তাঁকে গ্রেপ্তার করার মধ্যে সাহসের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। তবু বহু ব্যক্তি খেতাব অর্জনের জন্য দাবীদার হয়। পুলিশের জনৈক উর্ধ্বতন কর্মীকে পুলিশ-কমিশনারের কাছে বলতে শুনেছিলাম, 'আই হ্যাভ গট হার, স্যার!'—ভাইস-চ্যানসেলর স্মরাবর্দি সাহেব ওই গ্রেপ্তারের জন্য দাবীদার হয়েছিলেন।

মহিলা-পুলিশ না-থাকায় পুলিশ-কর্মীদের আলোক-প্রাপ্তা কজন বধূকে পর বৎসর ওখানে ছাত্রী ও অন্য মহিলাদের মধ্যে বসানো হচ্ছিল। এঁরা ছাত্রী ও তরুণীদের পরিক্রমণের উপর লক্ষ্য রাখতো। এজন্য প্রতি বৎসর এঁদের সরকার হতে এক-জোড়া করে সোনার দুল উপহার দেওয়া হ'ত। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও প্রভুদের রাজত্ব আমরা শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারি নি।

১৯৩০ খ্রীঃ কলিকাতা-পুলিশের এলাকা ৩০'৮ স্কোয়ার মাইল। ১১,৬০,৪১০ ব্যক্তির সেখানে বসবাস। অফিসর ও কর্মীর সংখ্যা ৫৭৪৭ জন। তাদের জন্য

বাৎসরিক ব্যয় ৪৬,১২,৩০৪ টাকা। একজন কমিশনার, ৭ জন ডেপুটিকমিশনার। ১০ জন অ্যাসিসট্যাণ্ট কমিশনার। ৬৫ জন ইনস্পেক্টর, ১১৬ জন সাব-ইনস্পেক্টর। ২:৮ জন অ্যাংলো সার্জেণ্ট। ১৫২ জন অ্যাসিসটেণ্ট সাব-ইনস্পেক্টর ৪৩৩ জন হেড-কনস্টেবল (৫ জন অশ্বারোহী), ৪১৫৬ জন কনস্টেবল (৪৮ জন অশ্বারোহী) দ্বারা কলিকাতা-পুলিশ গঠিত। দুটি করে ডিভিশন-সহ কলকাতা-নর্থ ও সাউথ দুটি ডিসট্রিকৃট। তদতিরিক্ত ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্ট, স্পেশালব্রাঞ্চ, হেড-কোয়ার্টারস, ট্রাফিক ডিপার্টমেণ্ট ও পোর্ট-পুলিশ পৃথক ডিসট্রিক্টরূপে বিবচিত। কলিকাতা-পুলিশের 'পুলিশ-পাইক' তথা কনস্টেবলের ১৭৫২ খ্রীঃ ২ টাকা, ১৮৪৫ খ্রীঃ ৫ টাকা মাসিক বেতন ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে কনস্টেবলদের মাসিক বেতন ১১ টাকা এবং ১৯৩১ খ্রীঃ তা বেড়ে ২৫ টাকা হতে ২৯ টাকা গ্রেড হয়। উর্ধ্বতন পুলিশ-কর্মীরা কালানুযায়ী যথাক্রমে পালকি, টমটম, ঘোড়াগাড়ি ও মোটর-যোগে তদারকে যাবার জন্য ব্যবহার করেছেন। তাঁরা পূর্বে মাথায় খাটো পাগড়ি বা টুপি, ছোট বা লম্বা ঘণ্টি-বাঁধা কোর্তা, লাঠি ও তরবারি, বন্দুক পরে পিস্তল দ্বারা সজ্জিত হতেন। মধ্যবর্তী কর্মীদের কাঁধে রূপালি কর্ড বা স্ট্র্যাপের উপর নিকেল বোতাম, হেলমেট, নিকেল ও চেন-তরবারি দেওয়া হয়। আরও উর্ধ্বতনদের উর্দি জেনারেলদের মতো জমকালো ছিল। এই ঐতিহ্য হতে কলিকাতা-পুলিশকে অধুনা বঞ্চিত করা হয়েছে।

এ সময়ে (১) কলিকাতা থানা-পুলিশ নর্থ ও সাউথ দুটি ডিসট্রিক্ট-এ বিভক্ত।—প্রতিটি ডিসট্রিক্ট একজন ডেপুটি-কমিশনারের অধীন। প্রতি ডিসট্রিক্ট-এর দুটি করে ডিভিসন—একজন অ্যাসিসটেণ্ট-কমিশনারের অধীন। (২) পোর্ট-পুলিশ ডিসট্রিক্ট—জনৈক ডেপুটি-কমিশনারের অধীনে মাত্র দুটি থানা। (৩) হেড-কোয়ার্টারস রিজার্ভ ফোর্স। এর অধীনে পুলিশ-ট্রেনিং স্কুল। (৪) ট্রাফিক মাউন্‌টেড পুলিশ। (৫) ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্ট। (৬) স্পেশাল ব্রাঞ্চ (রাজনৈতিক), সিকিউরিটি কনট্রোল (বিদেশী সম্পর্কিত)। (৭) আর্মড বা সশস্ত্র পুলিশ। (৮) আর্মড এ্যাক্ট বিভাগ—এরা অস্ত্রশস্ত্রের লাইসেন্স দেন। (৯) পাসপোর্ট বিভাগ।—বিদেশ-গমনেচ্ছুকদের ছাড়পত্র দেন। (১০) মোটর-ভিহিকল।—এঁরা ট্যাকসি ক্যারেজ ও মোটর-গাড়ির হিসাব রাখেন ও তাদের লাইসেন্স দেন। (১১) মালখানা ও পাশ সেকসন।—এঁরা হোটেল ও কারখানার লাইসেন্স দেন। (১২) এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ।—এঁরা মজুতদারী, ভেজাল ও মুনাফা বন্ধ করেন। (১৩) সিটি আর্কিটেকৃট—এঁরা বেআইনী গৃহনির্মাণ বন্ধ করেন। এ ছাড়া পুলিশের অধীন দুটি ডগ্ পাউণ্ড ও দুটি ক্যাটেল পাউণ্ড আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ট্রেনিং স্কুলে অ্যাংলো-অধিকর্তার কটূক্তি সহ্য করতে না-পেরে চাকুরি ত্যাগ করি। কিন্তু বাইরে এসে দে'খলাম একজনের বদলে বহুজনের কূটক্তি শুনতে হচ্ছে। আমার চাকুরি-ত্যাগের এত বড়ো বীরত্বের কেউ মর্যাদা দিলো না। সকলেরই অভিমত : চাকুরি পাওয়া সহজ কিন্তু রক্ষা করা কঠিন। সৌভাগ্য এই-যে টেগার্ট সাহেব খবর পেয়ে আমাকে ডেকে পাঠালেন ও পুনর্বহাল করলেন। সেই সঙ্গে ট্রেনিং স্কুলে এদেশীয় লোকেদের উপর দুর্ব্যবহার বন্ধেরও ব্যবস্থা করলেন। আমার দীর্ঘ সুঠাম দেহ টেগার্ট সাহেবের বিশেষ পছন্দ। আমার চেহারা যে ভালো তা বহুলোকের মুখে শুনেছি।

ছেলেবেলায় আমার চেয়ে বয়সে বড়ো বন্ধুকে মহিলারা আদর করে কাছে টেনে বলতেন, 'এসো বাবা এসো।' আর আমি বয়সে ছোট হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা বলেছেন, 'একজন ভদ্রলোক এসেছে। ওঁকে বাইরের ঘরে বসতে দে।' বিবাহ উপলক্ষে কন্যাপক্ষ বলেছে যে পাত্রের বয়সটা বেশি। কিন্তু পুলিশে ওই দোষটাই আমার মহাগুণ হিসাবে পরিগণিত হ'ল।

এইভাবে পুনর্বহাল না-হলে ও পুলিশে না-থাকলে অপরাধ-বিজ্ঞানের গবেষণা কাজে অপারগ হতাম। এই বিজ্ঞান-বিষয়ের বহু মূলসূত্র তাহলে অজ্ঞাত থেকে যেতো। এজন্য টেগার্ট-সাহেবের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁর হাতে-লেখা একটি শ্লিপ নিয়ে উত্তর-কলকাতার ডিসট্রিকট অফিসে এলাম। এখান হতে ডেপুটি কমিশনার আমাকে থানায় বহাল করেন।

আমার খোঁজে জ্যেষ্ঠতাত রায়বাহাদুর কালীসদয় ঘোষাল আসেন। তিনি বিপ্লবী ভূপতি মজুমদার ও বিপিন গাঙ্গুলির প্রতি সহানুভূতিশীল এই অপবাদে তাঁকে স্পেশাল-ব্রাঞ্চে ডেপুটি-কমিশনার করা হয় নি। প্রতিবাদস্বরূপ তিনি তখন লম্বা ছুটি নিয়েছেন। আমার খোঁজ পেয়ে উত্তর-কলকাতার ডিসট্রিক্ট-অফিসে বসে তিনি কয়েকটি উপদেশ দিয়েছিলেন। যেমন : ইচ্ছা করে বদলি হয়ো না। মদ ও নারী সর্বদা বর্জন করবে। এক কপর্দকও উৎকোচ গ্রহণ কোরো না ইত্যাদি। পরে বলেছিলেন, ওরা আমাকে স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি-পদ থেকে বঞ্চিত করেছে, আশা করি দ্রুত প্রমোশন পেয়ে ওই পদে একদিন তুমিই বসবে।'

[তাঁর উপদেশ আমি সারা জীবন আক্ষরিক অর্থে পালন করেছি। আমি স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি-কমিশনারও হয়েছি। কিন্তু তখন পূর্বের মতো ওই পদের মর্যাদা ও জৌলুস ছিল না।]

বড়বাজার থানা

ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড়ো থানা বড়বাজার থানা। এক-এক ম্যানসনে মহকুমার মতো লোকের বাস। সেখানে থানার ইনচার্জ গরহাজির। এই থানার কাজকর্ম এমনই যে এখানে তালা-ভাঙা, হার-চুরি, ছেলে-চুরি, গাড়ির ধাক্কা, কুলি হারানো, বিড-গ্যাম্বলিং, ব্যাংক ফ্রড, বহু অভিযোগ। বড়ো বড়ো থানায় ঘটিবাটি বা ছোটখাটো চুরি গৃহীত হয় না। ওগুলি নথিভুক্ত করে অভিযোগ-কারীদের বিদায় দেওয়ারই রীতি। পেটি থেপ্‌ট-এনকোয়ারি রিফিউজ করা হয়। দুজন লিখিয়ে-বাবু মামলা লিখে-লিখে হিমসিম।

হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো বড়োসাহেব ডায়েরি ও ডেলি-রিপোর্ট দুইই এখনই চান। তিনি রাত্রে কোথায় নিমন্ত্রণে যাবেন। শুক্রল-সাহেবের ডায়েরি লেখা তখনও শেষ হয় নি। কলমের গতি একটু বাড়িয়ে তিনি মুন্সীবাবুকে বললেন, 'আরে ওঁকে বলে দাও, এখনই ডায়েরি আর ডেলি-রিপোর্ট পাঠাচ্ছি।'

টেলিফোন বেজে ওঠার বিরাম নেই তবু। আগুন লাগার খবর। সেখানে হাল্লা-বাহিনী ও অফিসর পাঠাতে হবে। ফের বড়োসাহেবের তাগিদ : ডায়েরি ও রিপোর্ট পাঠাও। টেলিফোনের ওপার হতেই তাঁর চিৎকার শোনা যাচ্ছে : 'কি হ'ল ? এখনও পাঠাচ্ছ না কেন ?' শুক্রল-সাহেব ডায়েরি লেখা থামিয়ে হুকুম দিলেন : 'ওঁকে বলে দাও ডাক বহুক্ষণ আগে চলে গেছে। এদিকে শিগগির একজন সাইকেল অর্ডারলিকে তৈরি করো।' আমি বুঝলাম আত্মরক্ষার জন্যে এগুলো এক ধরনের কৌশল।

'বাবুসাহেব : এক নোকর বিশ-হাজার রূপেয়া লেকে ভাগা।'—এক পাগড়িধারী মাড়োয়ারী থানায় ঢুকে বললে, 'নগীজমে যাট-হাজার রূপেয়া থে। লেকেন বুড়বাক কো উহো মালুম নেহি···'

'তুম ক্যা বোলোত ?'—এক অফিসর ডায়েরি লিখতে-লিখতে মুখ তুললেন : 'এইসেন বাত আছে'? নকোরকো ক্যা নাম ? উনকো গাঁও কাঁহা ?'

'উনকো নাম হুজুর', মাড়োয়ারী লোকটি এইবার একটু বিব্রত হন : 'উনে নাম বোলা থা···মতিহারী ইয়ে রামহরি। এতোয়ারী-ভি হো শেকথা। উসকো

গাঁওকো নাম বোলা খা···মত্তিহারী ইয়ে গাজীপুর। গাজিয়াঁবাদ-ভি হো শেকথা।'

তারপরই সেখানে একটি কুলি-হারানোর মামলা এসে গেল। চল্লিশ হাজার টাকার জিনিস-সমেত ট্রাঙ্ক নিয়ে কুলি উধাও। তার নাম ঠিকানা ও নম্বর ফরিয়াদীর জানা নেই।

'মশাই, মশাই, সর্বনাশ হয়েছে।'—এক প্রৌঢ় বাঙালী থানায় ঢুকে বললেন, 'আমার নাবালিকা স্ত্রীকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

একদল জুয়াড়ীকে ভেড়ার মতো তাড়াতে-তাড়াতে থানায় আনা হ'ল। হাত-গুলো জোড়ে-জোড়ে একসঙ্গে গামছা দিয়ে বাঁধা। দলে পরিচিত কিছু পুরনো পাপীও ছিল। থানার ভিতর ভীড় এবার আরও বাড়লো। গেটের পাহারাদার শান্ত্রী চিৎকার করে জানান দিলো: 'বড়োবাবু—বড়োবাবু—বড়োবাবু আ গয়া'। এই, সবকোই মু' সামালকে।' অর্থাৎ এবার সবাইকে মুখ বন্ধ করতে হবে আর তিনি মুখ খুলবেন এবং গালাগালি দেবেন।

ইনচার্জবাবু ঘরে ঢুকে তাঁর চেয়ারে বসলেন। ঘরে জুয়াড়ীদের দেখে তাঁর মেজাজ গরম। 'কে? কে এদের ধরে এনেছে? আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় নি কেন? জানো না যে নরম্যাল ওয়ার্কস সাসপেণ্ডেড? শুধু কংগ্রেসী ও পিকেটরদের ধরার হুকুম।'—তারপর চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে ওদের গালি দিতে শুরু করলেন। অশ্রাব্য গালির পর কিছু শ্রাব্য ভাষা শুরু হ'ল। তাঁর মুখ থেকে সেকেণ্ডে প্রায় কুড়িটি গালি বেরোয়। যেন অটোমেটিক পিস্তলের বুলেট। ফলে সব গালাগালি ফুরিয়ে গেল। তখন একটু দম নিয়ে বিচিত্র-সব শব্দ-নির্গত হতে লাগলো: 'ম্যাডাগাস্কার, ক্যামাসকাটা, হনুলুলু' ইত্যাদি। হঠাৎ একজন ইংরেজ মেমসাহেব ঢুকলেন সেই তোড়ের মুখে। তাঁর অভিযোগ এই-যে দোকানী তাঁকে কিছু পচা আঙুর বিক্রি করেছে।

ব্রেক কষলে গাড়ি থামে, কিন্তু গালাগালি থামানো সহজ নয়। গালি আপন-বেগে পাগল-পারা। অতএব কমপক্ষে দশটি গালি বর্ষিত হ'ল সেই মহিলার উদ্দেশ্যেও। ভাষা সঠিক অনুধাবন করতে না-পারলেও ওটা যে গালি তা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হ'ল না। মহিলার সাদা-মুখ রাগে লাল হয়ে উঠলো। এ যে রীতিমত অপমান! তিনি তৎক্ষণাৎ ফোনে ইংরেজ-ডেপুটিকে কিছু বলতে চাইলেন। ইনচার্জ-বাবু প্রমাদ বুঝে স্বর পালটে ফেললেন। তিনি বিনীত ভঙ্গিতে বুঝিয়ে বললেন যে সব কাজ তো একসঙ্গে করা যায় না, তাই শ্রবণেন্দ্রিয় সজাগ রেখে ওঁর কথা তিনি ঠিকই শুনেছেন কিন্তু বাক-সংযম করা যায় নি বলে দুঃখিত। প্রকৃতপক্ষে মেমসাহেব

মাস্তে বড়ো বলে মুখ ছিল তাঁর দিকে কিন্তু মুখের বাক্যরাশি নির্গত হয়েছে ওই নেটিভগুলোর উদ্দেশ্যে। মাননীয়া মহিলা যেন ক্ষমা করেন।

মহিলা ক্ষমা করেছিলেন এবং ইনচার্জবাবুর দেওয়া লেমনেড পান করে ফিরে গিয়েছিলেন।

আমি সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে তাঁর এই কাণ্ড-কারখানা দেখছিলাম। আমার আর বাক্যস্ফূর্তি হতে চায় না। এখান হতে সরে পড়াও সম্ভব নয়। অতএব নির্বাক বসেছিলাম। এবার তাঁর দৃষ্টি পড়লো আমার ওপর। ঘাড় কাত করে তিনি আমাকে দেখলেন এবং যথারীতি কণ্ঠস্বর চড়িয়ে বিকট গর্জন: 'কে মশাই আপনি? এখানে কি চান? কি জন্যে এসেছেন?'—নির্দোষ স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা, কিন্তু কণ্ঠস্বর এত চড়া আর উচ্চারণের ভঙ্গি এত কর্কশ যে চমকে যেতে হয়।

আমার আগমনের উদ্দেশ্য বলতে না-বলতেই উপরের কোয়ার্টার থেকে একটি বালক নেমে এসে অফিস-ঘরে ঢুকলো। তিনি চেঁচিয়ে এক অফিসরকে বললেন, 'রমেশ, এখানে আমরা 'মুখমিষ্টি' করছি, বাচ্চাদের অফিস-ঘরে ঢুকতে দাও কেন? ওরা গোল্লায় যাবে যে! এখনই ওপরে যেতে বলো।'—তিনি সমাদরে নিজের কাছের একটা চেয়ারে আমাকে ডাকলেন: 'আসুন মশাই, এখানে বসুন।'

'আজই গেজেটে আপনার নাম দেখেছি।'—তিনি বললেন, 'ডেপুটি-সাহেব ফোনে আমাকে সব বলেছেন। আমার কোয়ার্টারের পাশেই আপনার কোয়ার্টার। সুইপার দিয়ে পরিষ্কার করানো আছে। একটা কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড কুক্ বা চাকর রাখবেন। ফ্যামিলি থাকলে না-আনাই ভালো। এই কদিন থানা বড়ো গরম। কংগ্রেসীদের পিকেটিং সম্প্রতি বেড়েছে। ডেপুটিদের মাথা তাতে দারুণ উত্তপ্ত। আপনাকে এই পিকেটিং-করা লোকেদের ধরার ডিউটি দেওয়া হয়েছে। আপনি এবার জেনারেল ডায়েরিতে লিখুন: 'জয়েণ্ট দিস থানা (পি. এস.)। মে গড্ হেল্প মী। আজকের দিনটা বিশ্রাম করুন, কাল সকাল ছটার সময় থানায় নামবেন।'

তাঁর নির্দেশমতো কোয়ার্টারের উপরে উঠে বারান্দায় দাঁড়ালাম। হঠাৎ নিচের অফিসে একটা সোরগোল: 'বড়োসাহেব—বড়োসাহেব—বড়োসাহেব এসেছেন।' গরুর পালে যেন বাঘ পড়লো। পরক্ষণেই নিচের অফিসে দারুণ চেঁচামেচি ও টেবিল ঠোকাঠুকি। বড়োসাহেব থানা-ইনস্পেকসনে এসে কিছু ভুল ধরেছেন। একটা ছোট ছেলে উপর থেকে নিচে নেমেছিল। সে একবার থানার অফিস-ঘরে উঁকি দিয়েই দৌড়ে উপরে উঠে মা-কে বললে, 'মা' একজন সাহেব এসে বাবাকে বকছে।'—আমি কৌতূহলী হয়ে বড়োসাহেব-জীবটিকে দেখতে নিচে

নামছিলাম। হঠাৎ দেখি এক অফিসর নিচে হতে দৌড়ে ওপরে উঠছেন। বড়ো-সাহেব একটি থানা-পরিদর্শন সেরে বার হওয়া মাত্র সেখান হতে ফোনে খবর এসেছে যে ওই থানার একজন কর্মীকে কাজে গাফিলতির জন্য সাসপেণ্ড করা হয়েছে এবং তাঁর গাড়ি এইদিকে ঘুরেছে। তার মানে এখানেও ওই রকম কিছু ঘটতে পারে এই আশংকায় অফিসরটি জেনারেল ডায়েরিতে সিক্ রিপোর্ট লিখে উপরে উঠছিলেন। তাঁর কাগজ-পত্র ঠিকমতো তৈরি হয় নি। আমাকে নিচে নামতে দেখে পথরোধ করে বললেন, 'মশাই, এখন নিচে নামবেন না। ওঁর সামনে পড়লে পানিসমেণ্ট অবধারিত।'

[কলিকাতা-পুলিশে অ্যাসিসটেণ্ট কমিশনারদের বড়োসাহেব এবং তাঁদের উর্ধ্বতন ডেপুটি-কমিশনারকে ডেপুটি-সাহেব বলার রীতি। ওই যুগে বড়োসাহেবের চোখ দিয়েই উপরওয়ালারা অধীনস্থ অফিসরদের বিচার করতেন। ইংরাজ-ডেপুটিরা এই দেশীয় অকিসরটির উপর নানা বিষয়ে নির্ভরশীল। নিয়মানুবর্তিতার নামে ওঁদের তদারকি কিছু কড়া ধরনের হ'ত। আত্মরক্ষার জন্যে দিবারাত্র ব্যস্ত থাকতে হ'ত বলে অধীনস্থ কর্মীদের পক্ষে উৎপীড়ক হওয়ার বা উৎকোচ গ্রহণের সময় বা সুযোগ বিশেষ ছিল না। তবে এই পরিদর্শন প্রায়ই গঠনমূলক না-হয়ে ধ্বংসাত্মক হ'ত। ক্ষমা নামক শব্দটি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ডেপুটি-সাহেবদের ক্ষমতা তখন বড়োসাহেবরা নির্বিচারে প্রয়োগ করতেন। তবে সেই-সব ক্ষেত্রে ভ্রান্তি বা গণ-অভিযোগ থাকা চাই। নইলে উর্ধ্বতনরা নিম্নপদস্থদের আনীত অভিযোগেরও বিচারে বসবেন।]

[বিঃ দ্রঃ প্রথম জীবনের এই-সব অসুবিধা, পদ্ধতি ও প্রকরণ আমার স্মরণ ছিল। আমরা ক্ষমতায় অসীম হলে এগুলি সম্পর্কে সচেতন হই। অধীনস্থ কর্মীদের ভুল শুধরে দিতে সাহায্য করতাম। তাঁদের সকলের প্রতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সৌজন্য-বোধ ফিরিয়ে আনি ও আচরণবিধি সৌষ্ঠবপূর্ণ করে তুলি। তাঁদের পারিবারিক বিষয়েও আমরা সাহায্য করেছি। পারিবারিক ক্ষেত্রে অশান্তি ও অসুবিধা থাকলে সরকারী কাজে কিছু ভুল-ভ্রান্তি হওয়া সম্ভব। তাঁরা অসংকোচে অসুবিধার কথা আমাদের জানাতো এবং আমরা তাঁদের পরামর্শ দিতাম। ফলে পুলিশী কাজে সহযোগিতা ও দক্ষতা অনেক বেড়ে যায়।]

সকালবেলা য়ুনিফর্ম পরে অন্যদের মতো নিচে নামলাম। অফিস-ঘরে জনগণের ভিড় আরও বেশি দেখলাম। একই রকম ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি মাত্র। ওদিকে আইন-অমান্য আন্দোলন আরও বেড়েছে। থানার উল্টোদিকে সদ্য গড়ে-ওঠা একটি নতুন থানা দেখা গেল। কংগ্রেসীরা ঘর-ভাড়া করে পাণ্টা থানা করেছেন।

পাবলিক প্রসিকিউটর তারক সাধুর মতামত তখনও আসে নি বলে ওটা ভেঙে দেওয়া হয় নি।
এক অ্যাংলো অফিসর চেঁচিয়ে জনৈক অভিযোগকারী ব্যক্তিকে বললেন, 'যাও, গান্ধী মহারাজকো থানা মে যাও।'—অভিযোগকারী ভদ্রলোকের বাড়ি থেকে দশ হাজার টাকার গহনা চুরি গেছে। একজন বাঙালী অফিসর বিনয়ের সঙ্গে নতুন স্থাপিত কংগ্রেসী থানা দেখিয়ে দিলেন। (মেদিনীপুর ছাড়া অন্যত্র কংগ্রেসী থানা সফল হয় নি।) পরে ফরিয়াদীর অভাবে সব থানাই আপনা হতে উঠে যায়।
অন্য-এক দারোগাবাবু ভদ্রলোককে দরোয়ান রাখার উপদেশ দিলেন। ভদ্রলোক চলে যাবার পর আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আচ্ছা, উনি দরোয়ান রাখার পরও যদি চুরি হয়?'—তিনি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'তাহলে আমরা তাঁকে দরোয়ানের সংখ্যা বাড়াতে বলবো।'
সকলেই তখন ইংরাজ-প্রভুদের সাম্রাজ্য সামলাতে ব্যস্ত। সাধারণ চুরি-ডাকাতি তদন্তের ব্যাপারে তাঁদের সময় কই। কোন্ ফাণ্ড হতে জানি না, বাড়তি-কাজের জন্য অফিসরদের ওভার-টাইমও দেওয়া হচ্ছে। পদ-নির্বিশেষে প্রত্যেক কর্মী তখন অত্যন্ত ক্লান্ত। ফলে, অতি-পরিশ্রমে অনেকেই অসুস্থ। আন্দোলন আরও বেশি-দিন চললে ওদের মনোবল ভাঙতো। এজন্য কর্তৃপক্ষ অফিসরদের রীতিমত আস্কারা দিচ্ছেন। পূর্বে এরূপ গাফিলি ঘটলে তাঁরা বরখাস্ত হতেন। এই সময় অসাধুতা, চুরি, ডাকাতি, জুয়া ও কোকেন ব্যবসা বেড়ে যায়।
সন্ধ্যাকালে বড়োসাহেব যথারীতি থানা-পরিদর্শনে এলেন। প্রত্যেক বন্দীকে তাঁর সুমুখে হাজির করা হ'ল। বন্দীদের কারো বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকলে তিনি তা শুনতেন। অন্য থানাতেও তিনি এই-রকম সান্ধ্য-পরিদর্শন করেন। এক থানার সংবাদ শুনে তিনি অন্য থানাকে ওয়াকিবহাল করেন। এভাবে অপরাধী ধরা পড়লে তিনি তাকে চিনে নিতেন।
আমার সঙ্গে তাঁর ব্যবহার খুবই ভালো। কথাপ্রসঙ্গে জানালেন যে তিনি আমার জ্যেষ্ঠতাতের অধীনে কিছুকাল কাজ করেছিলেন। এখন আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বুঝলেন যে জ্যেষ্ঠতাতের মতোই আমি বলবান ও দীর্ঘদেহী। আমাকে পছন্দ হওয়ায় তিনি খুশি হয়ে বললেন, 'তোমাকে দিয়ে আমি উৎকোচ-গ্রহণ বন্ধ করে এই এলাকার নোংরা-আবহাওয়া দূর করবো। তোমার জ্যেষ্ঠ-তাতের মতো তুমি সন্দেহাতীত অনেস্ট হবে আশা করি। বড়বাজারে প্রথম ও জোড়াসাঁকোতে দ্বিতীয়বার পোস্টেড হলে জীবনে উন্নতি হয়। তোমাকে এরপর জোড়াসাঁকোতে সত্যেনের কাছে পাঠাবো। এই দুই থানায় টিঁকে গেলে তোমার

উন্নতি অনিবার্য।' তিনি ইনচার্জবাবুকে সযত্নে কাজ শেখাতে বলে আমাকে পিকেটার ধরার ডিউটি দিলেন।

[নবীশ-অফিসরদের কাজ শেখানো ইনচার্জ-অফিসরদের পবিত্র দায়িত্ব। ইনচার্জ-অফিসররা তদন্তে বেরুবার সময় নবীশদের সঙ্গে নিতেন এবং ডিক্টেকৃট করে ডায়েরি লেখাতেন। খুউব বাছা ও তুঁদে ব্যক্তিকে থানা-ইনচার্জ করা হ'ত। নবীশদের উপযুক্তরূপে গড়ে তুলতে সক্ষম হলে ইনচার্জদের কৈফিয়ৎ তলব করা হ'ত।]

পুরানো-যুগ সদ্য-বিদায়ের পর নতুন-যুগের সূচনা হয়েছে। তাঁর স্মৃতিস্বরূপ প্রবেশ-পথে হেড-জমাদারের পুরু তক্তাপোষ ও তার উপরের গদী তখনও দেখা যায়। গদীর উপর একটি নিচু ডেস্কে নথী রেখে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে ওঁরা গড়গড়ায় মুখ রেখে বসতেন। এরকম ব্যবস্থা থানার অফিস-ঘরে অফিসরদের জন্যও ছিল। ছোট জলচৌকির উপর নথী রেখে ভুষি-কালি ও সরের কলমে তক্তাপোষে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে লেখালেখির কাজ হ'ত। এখন সেখানে কেদারা ও সেজ অর্থাৎ টেবিল-চেয়ারের ব্যবস্থা। সম্প্রতিকালেও এই সব লেখালেখি বাংলার বদলে ইংরাজিতে হয়।

তখনও থানার কাজে বহু দেশজ শব্দের ব্যবহার ছিল। যেমন : পেটি অর্থাৎ বেল্ট, উর্দি, তদন্ত, দারোগা, কৈফিয়ৎ, গাফিলতি, সরেজমীন তদন্ত, থানা-তল্লাস, দায়রা-আদালত, টুলি অর্থাৎ ট্রুপ, সেরেস্তা, হাজতঘর, মেয়াদ, লালকেত্তাব অর্থাৎ স্ট্যাটিস্টিকস্, হাতকড়ি, মুন্সিবাবু, ময়না-তদন্ত অর্থাৎ পোস্টমর্টম, চেরাই-ঘর অর্থাৎ মর্গ, হুকুমৎ, সোপার্দকরণ, গ্রেপ্তার, অকুস্থল প্রভৃতি। এমন-কি ইংরাজি শব্দগুলিকেও সিপাহী জমাদাররা নিজস্ব ভাষায় আত্মসাৎ করেছে। যেমন : পিনসিন, রোঁদ অর্থাৎ রাউণ্ড সাসপিন, দলীল অর্থাৎ ড্রিল ইত্যাদি। প্রতিটি থানা-অঙ্গনে ওরা একটি বটগাছ, শিবলিঙ্গ ও কুস্তির আখড়া তুলবেই। এ বিষয়ে ওদের রুখবার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের কারোরই নেই।

দরবার করে থানায় উৎকোচ বা উপঢৌকন গ্রহণের রীতি আর নেই। শুনলাম, পূর্বে কোকেন ও জুয়ার ডেন্ হতে টাকা তুলে বিচিত্র ভাগে শেয়ার ভাগ হ'ত। যেমন : লায়ন শেয়ার, টাইগার শেয়ার, লেপার্ড শেয়ার, জ্যাকেল শেয়ার ও তার-পর ক্রমানুসারে ক্যাট, র‍্যাট ও ব্যাট শেয়ার। লায়ন অর্থাৎ সিংহ ভাগ নির্দিষ্ট বড়োসাহেবের, টাইগার—ছোটসাহেবের লেপার্ড—বড়োবাবুর এবং তারপর যথাক্রমে মেজ সেজ ছোট ও মুন্সিবাবুর মধ্যে বাকি শেয়ারগুলি ভাগ হ'ত। আমি ছোটবাবু অর্থাৎ মর্যাদার দিক থেকে র‍্যাট, যদিচ কোনোদিনই ওদের

তালিকাভুক্ত হই নি। রাত্রে রোঁদে বেরিয়ে কোকেন ডেন, পরিদর্শন করে সকলেই প্রাপ্য গ্রহণ করতেন ছোটো-বড়ো পদমর্যাদা অনুযায়ী; কুড়ি দশ পাঁচ বরাদ্দ হিসাবে। কারো-কারো কাছে জুয়াড়ীরা শীল-করা খামে প্রাপ্য পাঠিয়ে দিতো। সিপাহী-জমাদাররা ঠাট্টা করে এঁদের বলতো : 'খানেওয়ালা বাবু।'

কংগ্রেসী আন্দোলনে উর্ধ্বতনরা ব্যস্ত থাকার ফলে তদারকী-ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে নি। এজন্য কিছু কর্মী অধঃপতিত হওয়ায় এরূপ ঘটনা মধ্যে-মধ্যে ঘটতো। রাজনৈতিক আন্দোলনে পুলিশ-কর্মীদের আস্কারা দিলে এরকম অবস্থা হয়েথাকে। এজন্য বহুদেশে সাধারণ-পুলিশকে রাজনৈতিক আন্দোলন-দমনে নিযুক্ত করার রীতি নেই।

কিছু পুলিশ-কর্মী এই সুযোগে প্রলোভন ইত্যাদির শিকার হন বটে কিন্তু অন্য-দিকে ওঁরাই আবার বহু প্রশংসীয় গুণের অধিকারী ছিলেন। চোর ও গুণ্ডাদের প্রতি তাঁরা অত্যন্ত কঠোর ও নির্দয়, কিন্তু ভদ্র-গৃহস্থদের সেবায় তাঁরা কখনও কপর্দকও উৎকোচ গ্রহণ করেন নি। বরং দরিদ্র ও অনাহারী ব্যক্তিদের কিছু কিছু দানধ্যান করেছেন। জুয়া ও কোকেন ব্যবসাক্ষেত্র হতে ওঁরা কেউ-কেউ অর্থের ভাগ নিতেন, দুর্বৃত্তদের এই-সব স্থানে আনাগোনা থাকায় তাদের জানতেন ও চিনতেন। এজন্য অপহৃত দ্রব্যাদি দ্রুত উদ্ধার করে অপরাধের কিনারা করতে সক্ষম ছিলেন। অবশ্য কোকেন জুয়া ও সরাবের জন্য অপ্রত্যক্ষ অপরাধ বাড়তো ও গৃহস্থেরা ক্ষতিগ্রস্ত হ'ত।

[ওঁদের বৃহৎ গুণ এই-যে ওঁরা নারীদের সম্মান করতেন ও শিশুদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। হারানো শিশুরা সপ্তাহ-ভর থানায় থেকেছে, তাদের খেলনা আহার ওঁরা কিনে দিতেন। খোঁজাখুঁজি করে ওদের অভিভাবকদের ডাকা হ'ত। হারানো-শিশুদের সংবাদ তৎক্ষণাৎ প্রতিটি থানায় জানানো হ'ত। প্রতিদিন জমাদার ওই শিশুদের সঙ্গে বেরিয়ে তাদের বাড়ির হদীস নিতো।]

কিন্তু টেগার্ট সাহেবের সরেজমীন দৌরাত্ম্যের ফলে এইভাবে উৎকোচ-গ্রহণ বন্ধ হয়ে যায়। আমার জ্যেষ্ঠতাত ও অন্যেরা এবিষয়ে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। একবার বড়োদিনে আতর-ভিজানো তুলো ধুনে সিল্কের ওয়াড় দিয়ে লেপ তৈরি করে অফিসররা অন্য দ্রব্যাদি সহ মিছিল করে জনৈক ইংরাজ-ডেপুটিকে উপহার দেন। চার্লস টেগার্ট অল্প সময়ের মধ্যে তা জেনে টেলিফোনে সেই ডেপুটিকে দূর-স্থানে বদলি করেন।—কোনও এক নিম্নপদস্থ কর্মী জুয়াড়ীদের ধমকে ধমকে বলেছিলেন, 'কাহে নেহি কাম চালাতা? এই লেও রূপেয়া। চালাও।' ভদ্রলোকের এইভাবে দাদন দিয়ে এলাকার মধ্যে জুয়ার আড্ডা বসানোর সংবাদ

তাঁর কাছে পৌঁছুতে বেশি দেরি হয় নি। তিনি মাত্র সন্দেহের বশবর্তী হওয়ায় তাঁকে কর্মচ্যুত করেছিলেন।

[এই পাপ কর্মগুলি শহর হতে উচ্ছেদ করতে প্রভাত মুখার্জি, সত্যেন মুখার্জি সহ আমাকে ও অন্য একজনকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। আমরা সবাই মিলিত প্রচেষ্টায় ওই কর্মগুলি এলাকা হতে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করেছিলাম। তার পরোক্ষ প্রভাবে শহর হতে অপরাধের সংখ্যা অত্যন্ত কমে যায়। আমার বৃহৎ প্রতিবেদনের পর সরকার ডেঞ্জারাস ড্রাগ এ্যাক্ট বিধিবদ্ধ করেন। কোকেনের প্রত্যক্ষ কুফল সম্বন্ধে ওই প্রতিবেদনাটি ছিল আমার একটি উল্লেখযোগ্য থিসিস।]

থানার বড়োবাবু আমাকে অনেক কিছু বললেন ও শোনালেন। তিনি একটি পুলিশী প্রবাদ উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'কাক কখনও কাকের মাংস খায় না। থানার ভিতরের খবর যেন বাইরে না যায়। এখানে দেওয়ালেরও কান আছে। অতএব চোখ আর কান খোলা রাখবে কিন্তু মুখ বন্ধ রাখবে সর্বদা। মুরুব্বীর জোর যতোই থাকুক ফর্জেন্টির আশ্রয় কদাচ নয়। এখানে ক্ষমা নামক কোনো বস্তু নেই। বাগে পেলে কেউ কাউকে ছাড়ে না।'

থিওরিটিক্যাল শিক্ষা আমার শেষ হ'ল। এবার ফিল্ড ওয়ার্ক-এ যেতে হবে। বড়োবাবু আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলেন। চিৎপুর রোড ধরে আমরা এগিয়ে চলেছি। রাস্তার দু'ধারে ঠোঁটে-রঙ গালে খড়ি পরনে সস্তা জাপানী সিল্কের শাড়ি শীর্ণকায়া হত ভাগিনীরা অপেক্ষারতা। এ অঞ্চলে আমি আগে কখনও আসি নি। বড়োবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এরা কারা?'—বড়োবাবু আমার দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকালেন এবং পাল্টা প্রশ্ন করলেন এই-যে, আমার বয়স কতো এবং আমি কতোদিন এই শহরে আছি। আমি উত্তর দেবার আগেই একজায়গায় একটা ভিড় দেখে তিনি ঠেঙাতে শুরু করলেন। শুনলাম, ওরা টপ্‌কা ঠগীর দল। শিকারের জন্য ওখানে অপেক্ষা করছিল। আমাদের সাথী হাফ-উর্দি সিপাহীর দল ওদের কজনকে ধরে বেঁধে ফেললো।

বড়োবাবু এবার আমাকে বুঝিয়ে বললেন, 'ঠেঙাতে মায়া করবেন না। নচেৎ এলাকার ক্রাইমের সংখ্যা বাড়বে। তাতে উর্ধ্বতনদের কৈফিয়ত দিতে হয়। তবে লোক চিনে ও বুঝে ও-সব করতে হয়। স্যুট-পরা ঠগীও কিছু-কিছু থানায় আসে। আগান্তুক বড়ো অফিসর নাকি মামুলি ব্যক্তি, ইনসিওরেন্সের এজেন্ট নাকি সে এক প্রতারক তা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বোঝা চাই। প্রয়োজনে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলবে। ওটা হচ্ছে একধরনের ট্যাক্‌ট অর্থাৎ কায়দা। ওর মধ্য হতে এক ঝুড়ি যত্নে সংগ্রহ করে রাখবে কোয়ার্টারে স্ত্রীর নিকট সাপ্লাইয়ের জন্যে। ক্লিয়ার?'

আমি বিধিবদ্ধ আইনের প্রশ্ন তুললে তাঁর ব্যাখ্যা : 'ল' আর মেনি বাট্ ক্বিউ আর ফলোড্। অনেষ্টি বস্তুটা ইন্-পারপাস থাকলেই হ'ল। ল'-এর ওয়ার্ডিঙ না-নিয়ে ওর স্পিরিটটা শুধু নেবে। মামলা সত্য বোঝার পর সাক্ষীর অভাবে যেন মুক্তি না পায়। মোড়ে-মোড়ে পানওয়ালা, ভুজাওয়ালা ও গরীব বাড়িওয়ালা আছে। প্রয়োজন-মতো ওদের সাহায্য নেবে। উন্নাসিক ভদ্রলোকের কোনও সাহায্যেই আসে না। এক-পা থানায় আর অন্য-পা জেলখানায় রেখে আমরা কাজ করি।'

এ-সব তত্ত্বকথায় আমি মুষড়ে পড়েছিলাম। বড়োবাবু আমার পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন, 'ডোণ্ট ওরি। তুমি ঠিক টিঁকে যাবে।'

রাস্তার ওপারে রঙমাখা নারীরা পুলিশ দেখে ঘোড়দৌড় শুরু করে দিলো। কেউ আছড়ে ফুটপাতে পড়লো, উঠে আবার সে দৌড়োয়। পুলিশ তাদের জাপটে ধরে একজায়গায় জড়ো করে। একজন ঘরের তক্তাপোষের নিচে লুকিয়েছিল। তাকে পাঁজাকোলা করে বাইরে আনা হ'ল। চোখের জল ওদের গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু মুখে প্রতিবাদের ভাষা নেই। হতভাগিনীরা দরিদ্রতম রূপোপজীবিনীর দল। অভিজাত বেশ্যা-রমণীদের মতো এদের বাঁধা উকীল নেই। এরা খরিদ্দারের অপেক্ষায় রাস্তার ধারে দাঁড়ায়। তাই রাস্তাবন্দীর অপরাধে অপরাধিনী। মোক্তার ও দালাল এসে ওদের জামিন হবে। কোর্টে গিয়ে পরদিন এরা জরিমানা দেবে। দৈনিক উপার্জনের দশগুণ গুণাগার। ফলে তাদের উপর্য্যুপরি কয়েকদিন অনাহার। বাড়িউলির কাছে দেহগুলি শুধু বন্ধক থাকবে। সেই দেনা বহুকাল পরিশোধও হবে না। ওদের হাড়-জিরজির দেহ। হাত দিলে ব্যথা লাগে। এই-সব পেটিকেস হতে সরকারের বড়ো-রকম আয়। থানার স্ট্যাটাসটিকস্ ঠিক রাখতে হলে এর প্রয়োজন। মামলার সংখ্যা কমলে কর্তৃপক্ষের নিকট বড়োবাবুকে কৈফিয়ত দিতে হবে।

আমি এই কুলটা নারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ি। শীতের রাতে ওদের গায়ে পাতলা শাড়ি আর পুলিশ মোটা বনাতের ওভারকোট পরে ওদের ধরেছে, শীতে এবং ভয়ে ওরা কাঁপছে। রাত দশটা পর্যন্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে দু-টাকাও উপার্জন হয় না। পুলিশের হল্লার ভয়ে প্রধান খরিদ্দার মুটে-মজুরেরা ও-পথ মাড়ায় না।

থানায় পশুক্লেশ নিবারণী অর্থাৎ ঘা-ওয়ালা পুলিশকে (সি এস পি সি এ) দেখেছি। গবাদি পশুদের জন্য এক শ্রেণীর লোক চিন্তা করে। কিন্তু এই পশুদের প্রতি সকলের শুধু ঘৃণা ও অবজ্ঞা। এদের পুনর্বাসনের বা আশ্রয়ের চিন্তা কারোরই নেই। আমার মনোভাব ও বিষণ্ণতা বড়োবাবুর নজর এড়ায় নি। তিনি অল্পক্ষণ কি-যেন ভাবলেন তারপর একটু ইতস্তত করে জমাদারকে বললেন, 'এই ছোট-

বাবু বহুৎ ঘাবড়া গয়া। আজ উনলোককো ছোড় দেনে বোলো।'—ছাড়া পেয়ে চটিজুতোর পটপট শব্দ করে ওরা দৌড়ে যে-যার ঘরে ঢুকলো। ওদের ছেড়ে দিতে পেরে সিপাহীরাও খুশি। (পরে, চেষ্টা করেও আমি এই প্রথা উচ্ছেদ করতে পারি নি।)

প্রতিদিন থানায় দলে-দলে ফুটপাত-অবরোধী সব্জীওয়ালা ফলওয়ালা ফুচকা-ওয়ালা ভুজাওয়ালা প্রভৃতিকে সিপাহীরা ধরে এনে হপ্তাপূর্তি করে। ঝুড়ি ও চুবড়িতে থানার মেঝেগুলি ভর্তি। পচনশীল দ্রব্য থাকায় ওগুলো থানাতেই নিলাম হবে। উচিত-মূল্যের সিকিভাগও ওঠার সম্ভাবনা নেই। ওগুলি সবই আইনমত বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল।

আদালতে 'হাঁ' বলবার আগেই ওদের জরিমানা হয়ে যায়।

'আসামী মাথুরাম বাপকো নাম নাথুরাম রাস্তামে ফল বিক্রি কিয়া ?'

'নেহী হুজুর'

'দো রুপেয়া'

কোথাও কমা পূর্ণচ্ছেদ নেই। এক বাক্যে ও এক নিশ্বাসে বিচার শেষ। বেশি কথা কইলে জরিমানার বহর বাড়ে। মামলা লড়লে পড়তা পোষায় না। তাই সকলে দোষ কবুল করে ঝঞ্ঝাট এড়ায়। এটা ওদের কাছে ফুটপাত ভাড়ার মতো। আমি বড়োবাবুকে এই বিষয়ে কিছু বলেছিলাম। ফুটে বসার আগেই তো ওদের সরানো যায়। ভোরবেলা লোক পাঠিয়ে তাড়ানো হয় না কেন ? এতদিনে তাহলে ওরা বিকল্প জীবিকার সন্ধান করতো এবং পেয়ে যেতো। এখন অযথা পুনর্বাসনের প্রশ্ন উঠবে। পথ-অবরোধ বন্ধ করার এখন একটিমাত্র উপায় ক্রেতাদের ধরে থানায় আনা। তাহলে ক্রেতার অভাবে ওরা এমনি অন্যত্র চলে যাবে।

বড়োবাবু একটু ভেবে আমাকে তত্ত্বকথা ভুলে যাবার জ্ঞান দিলেন। তিনি আরও বললেন যে আমি ওয়েলার্স হর্স। কিন্তু এখনও যথাযথভাবে ব্রেক পাইনি। —আমি অবাক হয়ে ভাবি যে ফুটপাতে বসতে দেবো অথচ তারপর ধরবো। মদ যথেচ্ছ বিক্রি করবো, অথচ মাতাল হলে তাকে ধরবো, এ কেমন রীতি। বড়োবাবুর মতে ওগুলো সরকারের দ্বিমুখী আর্থিক আয়ের ব্যবস্থা মাত্র।

[ক্ষমতায় আসার পর আমার এলাকায় মুচী ও নাপিত গ্রেপ্তার বন্ধ করি। পরে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয়তা বুঝে ওদের পথ অবরোধের আওতা থেকে মুক্তি দেন।]

হঠাৎ আমার থানার কাজ শেখা বন্ধ হ'ল। আমাকে পিকেটিঙ ডিউটিতে না-দেওয়ায় কর্তৃপক্ষ রুষ্ট। শুনলাম, 'আই অ্যাম আনডার ওয়াচ।' পরদিন হতে সদাসুখ ও মনোহর দাস কাটরা অঞ্চলদ্বয়ে আমার ডিউটি পড়লো।

বিঃ দ্রঃ—বড়বাজারে মহিলা ও বালক-পিকেটারদের সংখ্যাই বেশি। অ্যাংলো-সার্জেন্টদের বিরুদ্ধে অশালীনতার কিছু অভিযোগ আসে। এজন্য একজন সচ্চরিত্র ও ভদ্রকর্মীকে এই কাজে নিযুক্ত করার হুকুম। কিন্তু এজন্য আমাকে কেন বাছা হ'ল তা বুঝলাম না। আমি নিজে যা-দেখেছি ও করেছি এবং যা-শুনেছি তা-ই মাত্র এখানে উল্লেখ করবো। কলকাতা-সহ বাংলার অন্যত্রও এরকম ঘটনাই ঘটে থাকবে। এ হতে আইন-অমান্য আন্দোলনের একটি নিখুঁত চিত্র পাওয়া যাবে। বড়বাজার তখন ভারতের সর্বপ্রধান বস্ত্র-ব্যবসায় কেন্দ্র। এখানকার প্রতিটি ঘটনার প্রতিক্রিয়া সমগ্র ভারতে পড়তে বাধ্য। বোম্বে আমেদাবাদ প্রভৃতি দেশীয় বস্ত্রের মিলগুলি তখনও যথেষ্ট জোরদার নয়। বিলাতী বস্ত্রের প্রতিযোগিতায় তারা টিঁকে থাকতে চায়। তাই বড়বাজারের আন্দোলনে তারা কেউ-কেউ যথেষ্ট টাকা দিতো। মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এই আন্দালন দেশপ্রেমের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু বড়বাজারে অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত। তবু ব্যবসায়ীরা মজুত-মাল নষ্ট হতে দেবে না। ওদিকে ম্যাঞ্চেস্টারের স্বার্থে ব্রিটিশ-শাসকরা উদগ্রীব। তাই মূল সংঘাত বড়বাজারের বিপণন কেন্দ্রগুলিতে বেশি হয়।

আইন অমান্য

এইদিন থানায় বহু কংগ্রেসী পিকেটার বালকদের ধরে আনা হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেরই বয়স দশ-বারো মাত্র। উঁচু লরীতে তারা নিজেরা উঠতে পারে না। দু'হাতে এক-একজনকে তুলে লরীর ভিতর ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছিল। ভিতরের পাটাতনে পড়ে ওরা যন্ত্রণাদায়ক কোঁক কোঁক আওয়াজ করছিল। লরী ভর্তি হলে ওদের কোনও দূরস্থানে ছেড়ে দেওয়া হবে। কারণ জেলখানায় আর তিল-ধারণের জায়গা নেই। গন্তব্য স্থানে নিয়ে গিয়ে এমনি করে আবার পথের ওপর ছুঁড়ে ফেলা হবে। আমি এতটা সহ্য করতে না-পারায় অ্যাংলা-সার্জেন্টদের সঙ্গে কলহ শুরু হ'ল। একজন সার্জেন্ট তো চেঁচিয়েই বললে, 'দেন্ জয়েন দি আদার ক্যাম্প।' বড়োবাবু আমাদের উভয়কে শান্ত করে আমাকে একান্তে ডেকে বললেন, 'মাথা গরম কোরো না। সাহেবদের কানে উঠবে। গোপন নথীতে দাগ পড়বে: সিমপ্যাথেটিক।'

থানা-বাড়িতে একদিকে কংগ্রেসী পিকেটার ও অন্যদিকে সাধারণ আসামী। খোঁয়াড়ের হাঁসমুর্গির মতো ঠাসাঠাসি সকলে মেঝের উপর বসে। সাধারণ আসামীরা দলে-দলে জামীনে বেরিয়ে গেল। কিন্তু কংগ্রেসী পিকেটারদের কেউ

জামীনে মুক্তি চায় না। তাঁরা জেলগুলি ভর্তি করতেই এসেছেন। তাঁদের স্থান সংকুলানের জন্য চোর ও বদমায়েসদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। জেলে পাঠানোর আগে পঞ্চাশ-ষাটজন পিকেটার সকলেরই বিবৃতি লিখতে হবে।

কিন্তু কাজটি অন্যক্ষেত্রে দুরূহ হলেও এঁদের বেলায় খুবই সহজ। এঁরা নিজেদের নামটি শুধু বলবেন, পিতার নাম ও ঠিকানা উহ্য থাকে। অতএব শুধু একটি করে ইংরাজি ছত্র লিখলেই কাজ শেষ। নিচে মন্তব্য: 'দে রিফিউজড্ টু মেক্ স্টেটসমেণ্টস।' অর্থাৎ এঁরা কেউ বিবৃতি দিতে রাজী নন। পঞ্চাশ-ষাটটি নাম লিখে মাত্র দুটি পাতায় ডায়েরি লেখা শেষ হ'ল।

সার্জেণ্ট সাহেব কিন্তু আমার নামে রিপোর্ট করেছিলেন। ইংরাজ ডেপুটি-কমিশনার আমাদের উভয়কে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, 'ডোণ্ট কোয়ার্লস্ অ্যামঙ্গ ইয়োরসেল্ফ।'—সার্জেণ্ট সাহেব আমার সঙ্গে সেকহ্যাণ্ড করে বললেন, 'ফরগিভ অ্যাণ্ড ফরগেট।'—ট্রামে-বাসে আমাদের দুজনের মধ্যে কিছুটা আলাপ হ'ল। উনি তাঁর ইংল্যাণ্ডবাসিনী মায়ের কথা শোনালেন। ভারতে আসার সময় ওঁর মা নাকি দুটি উপদেশ দিয়েছিলেন। উপদেশ দুটি হ'ল এই: 'কিপ্ ইওর হেড কভার্ড অ্যাণ্ড ইওর বাওয়েলস্ ক্লিন্ড।'—মাথা ঢেকে রাখবে এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখবে।

সদাসুখ ও মনোহরদাস কাটরার বিলাতী বস্ত্রের দোকানগুলিতে পিকেটারদের দৌরাত্ম্য বেশি। সমগ্র ভারতে এখান থেকেই বিদেশী বস্ত্র সরবরাহ হয়। দোকান-গুলিকে অবরুদ্ধ করে রাখাই তাদের উদ্দেশ্য। তাহলে অন্য-কোথাও বিলাতী বস্ত্র পাঠানো সম্ভব হবে না।

কিন্তু আশ্চর্য এই-যে পিকেটিঙের স্থানে প্রাপ্তবয়স্ক কোনও পুরুষ নেই। কেবল নারী ও শিশু, বালক ও কিশোর। বহু নারীর ক্রোড়ে শিশু। বয়স্করা ইতিমধ্যে জেলখানা ভর্তি করেছে। মেদিনীপুরের বহু নারী ট্রেন-বোঝাই হয়ে শহরে আসে। বাকী গুজরাটী নারী আর বাঙালী মহিলা।

শহরের মধ্যে বহু হল ও ঘর ভাড়া নেওয়া হ'ত। এগুলোকে বলা হ'ত—সিক্রেট ক্যাম্প। এই-সব ক্যাম্পে বালক ও কিশোরদের এনে জমা করা হ'ত আর এখান থেকেই তারা পিকেটিঙে বেরুতো। ধরা না-পড়লে ফিরে আসতো এই-সব জায়গাতেই এবং পরদিন আবার পিকেটিং। ওদের আহার কারা যোগাতো কেউ তা জানে না। এই সিক্রেট ক্যাম্প আবিষ্কার করতে পারলে অফিসররা ক্যাম্প-প্রতি একশ টাকা বকশিস পেতেন।

বিঃ দ্রঃ—আমি খবর পেয়ে অন্যদের সঙ্গে ভোররাত্রে একটি সিক্রেট ক্যাম্পে হানা

দিয়েছিলাম। একটি হল-ঘরে কজন কিশোর ধরা পড়ার পর আর কাউকে পাই নি। ওদের কিছু বালক হুজুগে মেতে এসেছিল। গৃহ-পলাতক বালকের সংখ্যাও কম নয়। একজন তার বন্ধুকে ফেলে জেলে যেতে চায় নি। সে আমাকে চুপিচুপি ছাদের অন্য এক কক্ষে যেতে বললে। সেখানে গিয়ে আমরা তার বন্ধু-সমেত আরও আটজন বালককে ধরতে পেরেছিলাম।—কিন্তু ওই হল-ঘর কারা ভাড়া করেছে তা বহু চেষ্টা সত্ত্বেও জানতে পারি নি।

মহিলারা কিন্তু এভাবে একস্থানে জমায়েত থাকতো না, অন্য কোথা হতে আসতো। বয়স্ক-পুরুষেরা তাদের লরী-ভর্তি করে ভোররাত্রে আনতো এবং সুবিধা-জনক স্থানে নামিয়ে দ্রুতগতিতে সরে পড়তো। তাদের কেউ-কেউ ট্রামে-বাসেও আসতো। কিন্তু বাড়ির ঠিকানা তারা কখনও কাউকে দেয় নি।

ওঁর সকলেই নিরুপদ্রব অসহযোগী ও আইন অমান্যকারী। ওঁদের গ্রেপ্তার করে থানার ঠিকানা বলে দিলেই হ'ল। সঙ্গে করে কাউকে থানায় যাবার প্রয়োজন নেই, ওঁরা নিজেরাই সংশ্লিষ্ট থানায় উপস্থিত হতেন।—একদিন এই প্রথার ব্যতিক্রম ঘটলো। দোকান-মালিকের নিয়োজিত কুলিরা বিলাতীবস্ত্রের গাঁট ঠেলাগাড়িতে তুলছে, একদল হিন্দীভাষী মহিলা তাদের আটকে দিলেন। তাঁরা গ্রেপ্তারও হবেন না। মহিলাদের গায়ে হাত দেবার রীতি নেই। অথচ তাঁদের গ্রেপ্তার করতে হবেই। দূর হতে অ্যাংলো-সার্জেন্টরা আমাকে ওয়াচ করছে। কাছেই বাঙালী মহিলাদের একটি দল পিকেটিং করছিলেন। কিছু নাবালিকা এবং শিশুক্রোড়ে মহিলাও আছেন সেই দলে। তাঁদের নেত্রীদের নিকট আমি সাহায্য চাইলাম। গান্ধীজীর নীতির বিষয়েও আমি তাঁদের বোঝালাম।

নেত্রীদ্বয় মোহিনী দেবী ও প্রতিভা দেবী এসে ওঁদের কিছুটা বকলেন। ওঁদের সাহায্যকারিণীদেরও আমি পুলিশ-ভ্যানে তুললাম। জনৈকা বৃদ্ধা উঁচু ভ্যানগাড়িতে উঠতে পারছিলেন না দেখে তাঁর সাহায্যার্থে একটি নিচু টুল এনে দিলাম। এক-জনের একপাটি শ্লিপার ভ্যান হতে নিচে পড়ে গেল। চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে কেউ দেখছে কিনা তারপর চট করে শ্লিপারটি গাড়িতে তুলে দিলাম।

এই সময় থানার এক উর্ধ্বতন-অফিসর পরিদর্শনে এলেন। জেলখানা থেকে আপত্তি এসেছে সেখানে ছোট শিশু বা কমবয়সী বালক যেন পাঠানো না হয়। এই সাহেব একজন বাঙালী মহিলাকে বললেন, 'আপনার খোকার বাবার নাম বলুন। খোকাকে তাঁর কাছে রেখে আসবো।'—কিন্তু ভদ্রমহিলা স্বামীর নাম বা বাড়ির ঠিকানা বলতে অস্বীকার করলেন, তিনি ওই শিশুপুত্র ক্রোড়েই জেলে যেতে বদ্ধপরিকর। অফিসরটি ভীষণ রেগে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এই কে আছো, এ-

দিকে এসো। বাচ্চাটাকে ট্রামের তলায় ফেলে দাও।'—ভদ্রমহিলা শিউরে উঠেও সামলে নিলেন। অকম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'ঠিক আছে। তাই হোক। গোলামের সংখ্যা না-ই বাড়লো।'—একটি বালক তার মাসীর আঁচল কিছুতেই ছাড়বে না। সে কান্না শুরু করে দিলো। মাসীর সঙ্গে সে জেলে যাবে। জনৈক সার্জেণ্ট তার সেই আঁচল চেপে-ধরা হাতে উপর্যুপরি বেত্রাঘাত করলো। তবু সে হাত সরালো না। এদিকে জেলখানায় দারুণ স্থানাভাব। অন্যদিকে বালক ও শিশুরদল জেলে যাবার জন্যে আবদার ও কান্না আরম্ভ করেছে। বলা হ'ল যে পরদিন তাদের জেলে পাঠানো হবে, তবু তারা থানা পরিত্যাগ করতে চাইলো না। তখন তাদের রুলের গুঁতো দিয়ে ঠেলে থানা থেকে বার করে দেওয়া হ'ল।

অ্যাংলো-সার্জেণ্টরা ঠেঙাতে ওস্তাদ হলেও ফরিয়াদী হতে নারাজ। পরদিন সারাক্ষণ আদালতে থাকতে হবে। সাক্ষী দিয়ে ফিরতে দেরি হয়ে যায়। তাতে তাদের বলড্যান্স ও ককটেল পার্টি মাটি। বড়োই অসুবিধা। তবে আদালতে অভিযুক্তদের কেউ বড়ো-একটা আত্মসমর্থন করেন না। সংশ্লিষ্ট পুলিশ-কর্মীর জেরাহীন সাক্ষ্যতেই তাঁদের ছমাস জেল।

থানায় নাবালক-সাবালক বাছাও মুশকিল হচ্ছিল। সেজন্য মাপকাঠি হিসাবে একটি কচি বাঁশ আড়াআড়ি টাঙানো হ'ল। কারো মাথা তাতে আটকালে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ত। কিন্তু যাদের মাথা ঠেকে গেল তাদের সাবালক বুঝে ঠেঙিয়ে হাজতে পুরে দেওয়া হ'ল। গান্ধীজীর মন্ত্রমুগ্ধ সমগ্র দেশটাই তখন জেলে যেতে উৎসুক। ওদিকে জেল-কর্তৃপক্ষ বারে বারে বলে পাঠাচ্ছেন: 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট এ তরী।'

প্রতি সন্ধ্যায় বহু মহিলাকে থানায় আনা হয়। নিজেদের ব্যয়ে তাঁদের ও তাঁদের বাচ্চাদের চা লস্যি মিষ্টি ও লজেন্স দিই। টেবিলের চতুর্দিকের বিশখানি চেয়ারে লাল নীল ও সবুজ শাড়িতে ভর্তি হয়ে যায়। পরের দিন ওদের কোর্টে পাঠানো হবে। আত্মপক্ষ সমর্থন না করলে ওদের প্রত্যেকের ছমাস জেল বরাদ্দ।

[কোনও পিকপকেটার ধরা পড়লে সে বলতো: 'হুজুর, হামকে পকেটমারীমে মাত ভেজিয়ে, হাম লোককো পিকেটিংমে দে দিয়ে। ইস্‌মে ভী ছ' মাহিনা উসমে ভী ছ' মাহিনা, লেকেন উসমে থানা আচ্ছা মিলতা।']

ফুটফুটে চৌদ্দ বৎসরের এক বালিকা মহিলাদের মধ্যে ছিল। তার উপর আমার একটু মায়া হ'ল। তাকে এক বাটি দুধ খাওয়ালাম ও বললাম, 'খুকি, বাড়ি যাও। তোমাকে আমরা চাই না। জেলে গেলে তোমাকে কেউ বিয়ে করবে না।' —আমি ভালো মনে কথাগুলি বললেও বালিকাটি ক্ষেপে উঠে বললে, 'আমার

ওপর এতো দরদ কেন? গভর্নমেণ্ট অফিসরকে বিবাহ করতে আমরা তৈরি হই নি। আমাদের বিবাহ করবার জন্যে অন্য বহুলোক আছে।'

পরদিন আদালতে হাকিম ওয়াজেদ আলীকে আমি বলেছিলাম যে ওই নাবালিকা-টিকে মুক্তি দিলে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু তার জেলে যাবার বড়ো ইচ্ছা। সে অদ্ভুতভাবে ক্ষেপে উঠে প্রকাশ্য আদালতে বললে, 'গ্রেপ্তার করার পর থেকে আমার প্রতি ওঁর বড়ো দরদ। কী মতলব উনি স্পষ্ট করে বলুন।'—আদালত-সুদ্ধ লোক হতবাক। কেউ-কেউ হেসে উঠলেন। হাকিম-সাহেব মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'ষ্টিল ইউ রেকম্যাণ্ড হার রিলিজ?' পরে কি-ভেবে ওই বালিকাকে তিনি মুক্তি দিয়েছিলেন। মেয়েটি কবার আমার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে তাকালো তারপর গজগজ করতে করতে নিচে নেমে গেল।

[বিঃ দ্রঃ—উপরোক্ত ঘটনার প্রায় ছ'বছর পর কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ একটি মোটর কিছুদূরে ব্রেক কষে থেমে গেল। একটি সুশ্রী সুবেশ যুবক গাড়ি হতে নেমে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্যার, আপনার নাম কি মিঃ ঘোষাল? ছ'বছর আগে আপনি কি বড়বাজার থানায় ছিলেন? আমার স্ত্রী ওই গাড়িতে বসে রয়েছেন, তিনি আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চান। আপনার গল্প তিনি প্রায়ই আমাদের বলেন।'—তাঁর কথা শুনে আমি তো অবাক। গাড়ি হতে নেমে শাড়ি-সিঁদুরে ঝলমলে এক বধূ আমার পায়ের ধুলো নিলো। পরে তার পরিচয় পেয়ে আমি সত্যই বিস্মিত। শুনলাম, ওর স্বামী একজন মুনসেফ। তখন হেসে তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে মুনসেফ কি গভর্নমেণ্ট সার্ভেণ্ট নন?'

মহিলাটি আমার সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নি। লজ্জায় তাঁর মুখ লাল। সময়ের ব্যবধানে তাঁর ব্যক্তিত্বের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ওঁরা আমাকে ওঁদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু ওঁদের ঠিকানা নেওয়া সত্বেও সেই নিমন্ত্রণ আমি আর রক্ষা করতে পারি নি।]

জনৈকা বিদুষী কুমারী তরুণী একদিন রাস্তার মোড়ে শুয়ে পড়লেন। স্বরাজ না-পাওয়া পর্যন্ত তিনি এইভাবে পথ অবরোধ করে থাকবেন। ভদ্রঘরের সুন্দরী বাঙালী তরুণীকে সিপাহীদের দ্বারা সরাতে বিবেকে বাধলো। আমার ডান হাতে ষ্টিক্ ছিল, বাম হাতে তাঁর হাত ধরে ফুটে তুললাম। মেয়েটি ফুটপাতে উঠলো, কিন্তু আমার পিছন ছাড়তে চায় না। আমার সঙ্গে সঙ্গে আসে আর বলতে থাকে: 'আমার হাত যখন ধরেছেন তখন আমাকে সঙ্গে করে নিতে হবে।' ব্যাপার দেখে অন্যান্য মেয়েরাও হইচই করে উঠেছে। চট করে মাথায় একটা বুদ্ধি

এসে গেল। আমি বেশ জোরেই বললাম, 'আমি আপনাকে বামহাতে ধরেছি, ডানহাতে নয়। সুতরাং আপনার কোনও ক্লেম্ থাকতে পারে না।'—ওদের সকলকে অতঃপর ভ্যানে পিক্আপ করে থানায় এনেছিলাম। পরদিন হাকিম অবশ্য সাবধান করে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

কদিন বাদ ওই মেয়েটি একগোছা নিষিদ্ধ প্রচারপত্র-সমেত ধরা পড়লো। সে আমার হাতে কিছু লিফলেট গুঁজে দিয়ে বললে, 'চলুন। থানায় চলুন।' এই শ্রেণীর মেয়েরা সাধারণতঃ বাড়ির ঠিকানা বলে না বলে' আমাদের খুব সুবিধা। বাড়ি তল্লাসীর হাঙ্গামা থেকে রেহাই পেয়ে যাই। কিন্তু এই-প্রথম তার ব্যতিক্রম ঘটলো। সে সহজভাবেই ঠিকানা বললে। ওটা নারী-কর্মীদের একটি সিক্রেট ক্যাম্প। ক্যাম্পের সভ্যারা সবাই জেলে, নেত্রীরূপে সে-ই শুধু বাইরে।

একটা নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি ও তার সংলগ্ন কাঠের বারান্দা। সিঁড়িতে ভারী শরীরের ভার সহ্য হয় না। সিপাহী দুজনকে নিচে রেখে বারান্দায় উঠে এলাম। হঠাৎ একটি স্থান মচ মচ করে উঠলো। রেলিঙটা একপাশে কাত হয়ে পড়লো। আমি ভয় পেয়ে বললাম, 'ভেঙে পড়বে না তো।'—সে কাছে এগিয়ে এসে হাসি-মুখে বললে, 'এইবার যদি আপনাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিই?' মেয়েটির আগমনে সত্যি সত্যি রেলিঙ কাঁপতে লাগলো। আত্মরক্ষার জন্যে আমি হাত বাড়িয়ে ওকে ধরে ফেললাম। সে কাছে এসেছিল আমাকে সাহায্য করবে বলেই, আমি ক্ষমা চাইলাম অহেতুক ভয়ে ওকে জড়িয়ে ধরবার জন্যে। সে একটু হেসে বললে, 'এবার কিন্তু আপনিই অপরাধী।'

তার কক্ষে কোনও নিষিদ্ধ প্রচারপত্র পাওয়া যায় নি। মেয়েটি বললে যে সে চা তৈরি করবে এবং আমাকে খেতে হবে। আমি অস্বীকৃত হলে মেয়েটি শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বললে, 'যা বলি শুনুন। নইলে চেঁচাবো।'—ক্ষিপ্রহাতে সে স্টোভ জ্বেলে চা তৈরি করলো এবং আমাকে তা গ্রহণ করতে হ'ল অনন্যোপায় হয়ে। ভাঙা-সিঁড়ি বেয়ে সাক্ষীরা ও সিপাহীরা উপরে উঠতে পারে নি। আমি তখন মেয়েটির হেপাজতে অসহায়।

তাকে আর না-ঘাঁটিয়ে আলাপ শুরু করলাম। জানা গেল, সে ধনাঢ্য জমিদার ও ব্যবসায়ীর অতি-আদরের একমাত্র সন্তান। গ্র্যাজুয়েট। ঢাকায় ও কলকাতায় ওদের কয়েকটি বাড়ি আছে। পরিশেষে হেসে যা বললে তার অর্থ এই : এখন সে আমাকে দাদা বলছে বটে কিন্তু পরে এই সম্বোধন থাকবে কিনা নিশ্চয়তা নেই। —বেশ প্রাণোচ্ছল ও স্পষ্ট-চরিত্রের মেয়ে। দুঃসাহসিকাও বটে।

এই সময়ে জেলে স্থানাভাব হওয়ায় মুচলেখা লিখে বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হ'ত।

আমি প্রস্তাব দিলাম। সে বললে, 'সংগঠনের পক্ষে নিয়ম-বহির্ভূত হলেও আমি এই প্রস্তাবে রাজী।'—প্রকৃতপক্ষে সে এসব ছেড়ে পড়াশুনায় মন দেবার পক্ষপাতী। তাদের বালিগঞ্জের বাড়ির ঠিকানা দিলে, বললে, 'আমাদের বাড়িতে অবশ্যই একদিন যাবেন। নইলে এপথে আমি আবার নামবো।'—রীতিমত হুমকি। সাংঘাতিক মেয়ে! এই ধরনের মেয়েদের কাছ থেকে দূরে থাকাই উচিত। কিছুদিন পরে যথারীতি ঘটনাটি আমি ভুলে যাই।

[বিঃ দ্রঃ—এর বেশ কিছু পরবর্তীকালের ঘটনা। শহরে ১৪৪ ধারা জারী হয়েছে। পথে মিছিল নিষেধ। আমি অন্যদের সাথে প্রতিরোধার্থে ডিউটিতে আছি। দেখলাম একটি বিরাট মিছিলের সঙ্গে মারমুখী জনতা। সম্মুখে একটি মেয়ে পতাকা-হাতে নেত্রীত্ব দিচ্ছে। ওদের রোখা শক্ত বুঝে হেড-কোয়ার্টারসে ফোন করলাম: এফেকৃটিভ ফায়ারিঙ ছাড়া রোখা অসম্ভব।—হুকুম আসার পূর্বেই ইষ্টক বর্ষণ শুরু হয়েছে। জনা-দশেক সশস্ত্র শান্ত্রী আহত। হতাহতের সংখ্যা বেশি হলে বাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়বে এবং ওরাও আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। দলনেত্রী মেয়েটি প্রাণপণে জনতাকে শান্ত করতে চাইছে। কিন্তু তারা তখন আর আয়ত্তে নেই।

ওদের ভয় দেখিয়ে পিছু হটানোর উদ্দেশ্যে হুকুম দেওয়া হ'ল: 'টু স্পেসেস্ স্টেপ ব্যাক। ওনলি টু রাউণ্ড। ওপেন ফায়ার।'—পূর্বাপর ঘটনায় আমরা কিঞ্চিৎ নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম, ফলে অসতর্ক মুহূর্তে একটা গুলি ছিটকে বেরিয়ে অঘটন ঘটালো। জনতা তখনই ছুটাছুটি হাওয়া। একমাত্র দলনেত্রী মেয়েটি পথে মুখ থুবড়ে লুটিয়ে পড়েছে। তাকে দেখে আমার আর বাকস্ফূরণ হয় না। একটা চলন্ত গাড়ি থামিয়ে দুহাতে তার রক্তাপ্লুত দেহটা তুলে সেই গাড়ির মধ্যে রাখলাম। সে চোখ মেলে অস্ফুটস্বরে বললে, 'আপনি? আপনার কোনো ক্ষতি হয় নি তো! আপনি ভালো আছেন?'

রাত্রে হাসপাতালে তার স্টেটমেণ্ট নিতে নিজেই গিয়েছিলাম। অপারেশন সাকসেসফুল হলেও সে তখনও অর্ধ-অচৈতন্য। তার কপালে হাত রেখে বুঝলাম ক্ষতের জন্য জ্বর এসেছে। সে একবার চোখ মেলে আমার হাত মুঠি করে চেপে ধরলো। একজন নার্স ছুটে এসে আপত্তি জানিয়ে বললে, 'ওঁকে এখন বিরক্ত করবেন না। এখন ওঁর বিবৃতি দেবার কোনও ক্ষমতা নেই।'—খাতা-পেনসিল গুটিয়ে নিয়ে আমি থানায় ফিরে এলাম।

দুদিন পরে টেলিফোনে জানলাম যে মেয়েটির জ্ঞান ফিরেছে এবং কথা বলছে। এখন তার বিবৃতি নিতে কোনও অসুবিধা নেই। হাসপাতালে তখন তার বহু

আত্মীয়-স্বজন। হাসপাতাল-সংলগ্ন রাস্তায় মোটর গাড়ির সারি। ওদের ম্যানেজার-ভদ্রলোক ছুটাছুটি করছেন। আমাকে দেখে ওর পিতা উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'ইউ—ইউ—ইউ আর দ্যাট ইনস্পেক্টর।' মেয়েটি ক্ষীণকণ্ঠে বাধা দিয়ে বললে, 'ওর দোষ নেই বাবা, উনি গুলি ছোঁড়েন নি।' কন্যার কাছেই মাতা দাঁড়িয়ে-ছিলেন। জগদ্ধাত্রীর মতন চেহারা। তিনি বললেন, 'ওদের আর দোষ কি। ওরা পেটের দায়ে চাকরি করে। বাবা, তুমি এমন সুন্দর ছেলে, এই নোংরা চাকরি ছেড়ে দাও।'

বহিপ্রাঙ্গণে তখন তরুণ কংগ্রেসী নেতারা চিৎকার করছিল: 'বন্দে মাতরম।' আমারই সম্পর্কিত পিতামহ এই মন্ত্র দেশকে দিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু তা উচ্চারণ করার অধিকারও আমার নেই। আমি অধোবদনে ওদের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এলাম। ডাক্তারদের অভিমত: মেয়েটি বাঁচবে না। ('এজন্য আমরা কি নারী-হত্যার জন্য দায়ী বলা যায়?')

ওদিকে বড়বাজারে পিকেটিং এতটুকুও বন্ধ হয় না। কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই বুঝলেন যে গ্রেপ্তার করে আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না, অন্য ব্যবস্থা প্রয়োজন। দলে দলে পিকেটার-বালকদের থানায় আনা হচ্ছিল। অ্যাংলো-সার্জেণ্টদের হাতে মোটা খেঁটে। পরক্ষণে মার-মার-মার। ওরা অজ্ঞান হয়ে পড়ছিল। 'জল আন, জল আন।' ফার্স্ট এড-ও দেওয়া হচ্ছে। চকমিলান থানা-বাড়ির উপরের তলগুলির চতুর্দিক ঘিরে অফিসরদের কোয়ার্টারস। সেখানে জানলায়-জানলায় পুলিশ-গৃহিণীরা দাঁড়িয়ে নিচের উঠোনে কাণ্ড দেখছেন ও ডুকরে কেঁদে উঠছেন। গৃহিণী-দের কারো-কারো হাতে সুতা-কাটা তকলি দেখা যায়। পুত্রেরা গোপনে বাড়িতে চরকাও এনেছে। গান্ধীজীর ডাক পুলিশ-পরিবারের অন্তঃপুরেও পৌছেছে। রক্তাক্ত কলেবর বালকের দল জ্ঞান ফেরামাত্র চেঁচিয়ে উঠলো, 'বন্দে মাতরম।' আবার মার, আবার তারা অজ্ঞান। বারে বারে একই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। তাদের মুখের হাসি কিন্তু প্রতিবারেই অটুট থেকেছে। কাউকে কটূক্তি করতে পর্যন্ত শোনা যায় নি।

যারা এমনি করে চুপ করে মার খেতে পারে তারা একবার ঘুরে দাঁড়ালে নিশ্চয়ই দুর্বার হ'ত। কিন্তু ওদের মধ্যে এতটুকু বিদ্বেষের ভাব দেখি নি।

অধিকাংশ দেশীয় অফিসররা নীরব দর্শক। (অবশ্য তা বলতে বিবেকে বাধে।) একটা শুকনো বেতের ছড়ির মাঝখানটি আমি চিরে রেখেছিলাম। কর্তাদের হুকুমে যদি মারতে হয় তাহলে বিশেষ লাগবে না, অথচ ফটাফট শব্দ বের হবে। তাতে সাহেবরা বুঝবেন যে অন্যদের মতো আমিও একজন লয়েল-অফিসর। ক্রমে

ক্রমে পুলিশ-কর্মীরাও ওদের প্রতি সিমপ্যাথেটিক হয়ে উঠেছে। (সিমপ্যাথেটিক শব্দটি পুলিশে তখন শোধনবাদী শব্দের মতো ভয়ংকর।) ওদের তাড়া করে ধরতে বললে সিপাহীরা লাঠি ঠুকে কিছুদূর এগোয় ও ফিরে এসে বলে, 'না মিলি। ক্যা করু।' মুস্লিম-সিপাহীরা নির্লিপ্তভাবে মুখ ঘুরিয়ে বলেছে যে এখন তাদের রোজা, মিথ্যে সাক্ষী তারা দেবে না।

[আশ্চর্য !—এই বে-আইনী মারধোরে আদালতে কজন পুলিশ-কর্মী দণ্ডিত হন। জনৈক প্রধান-হাকিম আমাকে বলেছিলেন, 'আস্ক ইওর অফিসর টু বি কেয়ার-ফুল।' আমাদের অধিকর্তা ইংরাজ ডেপুটি-কমিশনার সম্পর্কেই তিনি একথা বলেছিলেন। এই-সব হাকিমদের দূর চট্টগ্রামে বদলী অনিবার্য ছিল।]

একদিন সন্ধ্যায় বিশজন মহিলা-সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করে থানায় এনেছিলাম। অভিযোগ-বইয়ে ওঁদের নাম লিখতে হবে। কিন্তু ওঁরা অসহযোগী হওয়ায় নাম বলতে নারাজ। পীড়াপীড়ির ফলে একজন বলেন, 'আমার নাম—শ্রীমতী ব্রিটিশ-শত্রুনী দেবী।' অন্যজনের উত্তর : 'আমার নাম—কুমারী সাম্রাজ্য-ধ্বংসী দেবী।' —কী সাংঘাতিক ! এই-সব শব্দ কানে শোনাও মহাপাপ। বাধ্য হয়ে আমরাই ওঁদের একটি করে নাম রাখি। যেমন—ললাটিকা, ললন্তিকা, মহাশ্বেতা, নবনীতা ইত্যাদি। পরিশেষে ভালো নাম ফুরিয়ে গেলে এই-সব নাম রাখি : জগদম্বা, ক্ষেমৎ-করী, নৃত্যকালী, মহাকালী ইত্যাদি। কিন্তু আদালতে এই-সব নামে ওঁরা সাড়া দিতেন না। ফলে, পরদিন সনাক্ত করাও আমাদের পক্ষে মুশকিল হ'ত।

একদিন বড়বাজারে সোরগোল পড়ে গেল।—চামুণ্ডা দেবী ! চামুণ্ডা দেবী ! মহাবলী গোরা-সার্জেণ্টরাও তাঁর ভয়ে ভীত। এক অ্যাংলো-সার্জেণ্টের ঘড়িসুদ্ধ কবজি একবার তিনি চেপে ধরায় হাতটি ফ্র্যাকচার হয়ে যায়। দুবার বন্দে-মাতরম বলার পর সার্জেণ্টটি মুক্তি পান এবং হাসপাতালে ভর্তি হন। ছ'ফুট লম্বা এই দেহাতি মহিলার মধ্যে-মধ্যে আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু কোথা থেকে এসে কোথায় চলে যান কেউ তা জানে না। তাঁর হাতে হাণ্টার থাকতো বলে তখন তিনি সাধারণভাবে হাণ্টারওয়ালী নামে পরিচিতা।

হঠাৎ তিনি বড়বাজারে কাটরা-অঞ্চলে এসে উপস্থিত। বিলাতী বস্ত্রের গাঁট-বাহী কুলিদের পিঠে গুম করে কিল বসিয়ে তাদের পিঠ দুমড়ে দিচ্ছিলেন তিনি। আমরা ব্যাপার দেখে একটা ভারী শতরঞ্চি তাঁর মাথার উপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে সকলে চেপে ধরলাম। তিনি সব কজনকে শতরঞ্চি-সহ উল্টে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন এবং কুলিদের পিঠে আবার গুম গুম কিল বসাতে লাগলেন। জনৈক কংগ্রেসী নেতা সেই সময় সেখানে এসে পড়েছিলেন। তাঁর বোঝানোর ফলে

তিনি গ্রেপ্তার হতে সম্মত হন। আমরা তাঁকে থানায় নিয়ে এলে তিনি পুনরায় নিজমূর্তি ধরে টেবিল-চেয়ার উল্টাতে আরম্ভ করে দিলেন।

আমাদের ইনচার্জবাবু গোলমাল শুনে তাঁর ঘর হতে বেরিয়ে এলেন এবং আসামীকে দেখে বললেন, 'আরে ওঁকে ধরেছো কেন? ওঁকে গ্রেপ্তার করা বারণ। এখনই সব চেয়ার-টেবিল ভেঙে তছনছ করে দেবে।'—বড়োবাবু কংগ্রেসী ফাণ্ডে দশ টাকা চাঁদা তাঁর হাতে দিলেন এবং তিনি থানা হতে বেরিয়ে গেলেন। ওঁর টাকার দরকার পড়লে এইভাবে তিনি আবির্ভূতা হন। শুনলাম যে জেল-কর্তৃপক্ষও ওঁকে জেলে রাখতে চান না। তাই গ্রেপ্তার না-করে কোনোমতে তাড়িয়ে দেওয়াই হুকুম। একবার তো বেয়নেটের খোঁচায় তাড়াতে হয়েছিল।

কোনো স্থানে একজোড়া তরুণ-তরুণী ঘনিষ্ঠভাবে বসে পিকেটিং করছিল। আমি প্রত্যহই তাদের দুজনকে একসঙ্গে একই স্থানে পিকেটিং করতে দেখি। বিচিত্র ভাবের বশবর্তী হয়ে আমি অভিভাবকের ভূমিকা গ্রহণ করে একদিন বলি, 'উহুঁ। এটা ঠিক হচ্ছে না। আপনারা একটু দূরে দূরে বসবেন।' ওরা অপ্রতিভ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েছিল। বেশ কিছুকাল ওদের আমি প্রতিটি কাটরায় বৃথাই খুঁজেছি। দিন-পনেরো পর ওদের আবার একসঙ্গে পিকেটিং করতে দেখলাম। সেদিন মেয়েটির সিঁথিতে সিঁদুর আর ছেলেটির হাতে কাঁচা দুর্বার রাখী দেখে সদ্যোবিবাহিত দম্পতি বুঝে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

এই সময় পুলিশ এবং পিকেটারস ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটি অলিখিত ভদ্রলোকের চুক্তি গড়ে ওঠে। সন্ধ্যার পর পিকেটিং হবে না, দোকানীরা দোকান বন্ধ রাখবেন এবং পুলিশও বিশ্রামার্থে নিজ-নিজ থানায় ফিরবেন—এই হ'ল চুক্তি। কিন্তু লোভাতুর কিছু ব্যবসায়ী দোকান সামান্য ফাঁক করে ভিতরে বসে থাকতেন খরিদ্দারের আশায়।

জনৈক প্রৌঢ় রায়বাহাদুর এক দোকানে গোপনে কিছু বিলাতী বস্ত্র সওদা করতে এলেন। পুলিশ এবং পিকেটাররা চুক্তিমতো অনুপস্থিত। চতুর্দিকে বিজলী-বাতিগুলি নিবছে একে-একে। লোকজনের কলরব স্তিমিত।

'আমার দাদু আপনাকে ডাকছেন। তিনিও কাপড় কিনতে এসেছেন।' একটি চতুর্দশী বালিকা যুক্তিগ্রাহ্য ভাবে তাঁর কাছে নিবেদন করলো: 'দাদুর পায়ে গাউট হয়েছে বলে তিনি দোকান থেকে উঠে আসতে পারলেন না, আমাকে পাঠালেন। আমার সঙ্গে আপনি ওদিকের দোকানে গেলে তিনি খুশি হবেন।' দাদুর নাম শুনে তিনিও খুশি। ওঁরা উভয়ে বন্ধু এবং উচ্চপদস্থ অবসরভোগী রায়বাহাদুর। অতএব উৎসাহিত হয়ে তিনি বালিকাটির সঙ্গী হলেন এবং তাঁর

নির্দেশমতো একটি গলির মধ্যে প্রবেশ-মাত্র অপেক্ষারত ছেলের দল তাঁকে পাকড়াও করলো। একজন নাপিত তাঁর সযত্ন-লালিত দীর্ঘ সাদা দাড়িগোঁফ খরখর করে কামিয়ে দিলো। তাতে বাটির জল যতো-না ছিল, চোখের জল মিশে-ছিল তার চেয়ে বেশি। ওদের প্রত্যেকের হাতে ধারালো ছুরি। অন্য-একজন তো চটপট তাঁর কান বিঁধিয়ে এবং আয়োডিন লাগিয়ে প্রতি-কানে একটি করে পিতলের মাকড়ি এবং দুহাতে কিছু কাচের চুড়ি পরিয়ে দিলো। বাকী ছিল পরনের ধুতি। সাজ সম্পুর্ণ করার জন্যে সেই ধুতি খুলে শাড়ি ও ব্লাউজ পরিয়ে তাঁকে একটা রিকশায় তুলে দিলো এবং চালককে নির্দেশ দিলো তাঁকে যেন নিকটবর্তী থানায় পৌছে দেওয়া হয়।

ভদ্রলোক তো থানায় এসে উপস্থিত। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই তিনি হাঁউমাউ করে বললেন, 'মশাই, আমি স্ত্রীলোক নই। আমি রায়বাহাদুর অমুক চন্দ্র অমুক।'—থানায় তৎক্ষণাৎ হুলুস্থুল পড়ে গেল। এমনটি এই এলাকায় কখনও ঘটে নি। তাঁর প্রতিবেদনে ডাকাতি-মামলা রুজু করা হ'ল। বড়োসাহেব ছুটে এলেন এবং কিছুক্ষণ চেঁচামেচি করলেন। সংবাদ পেয়ে ডেপুটি-সাহেব এলেন ওসব দেখে অবাক হলেন। কোয়ার্টারস হতে ওঁর জন্যে ধুতি ও চাদর আনা হ'ল, তিনি শাড়ি ও ব্লাউজ পরিবর্তন করলেন। আমি দৌড়ে ঘটনাস্থলে গেলাম এবং সেখান হতে তাঁর ক্ষৌরীকৃত দাড়ি ও গোঁফ সংগ্রহ করে আনলাম। সেগুলি একত্রে একটা তার দিয়ে বেঁধে তাতে লেবেল এঁটে লেখা হ'ল: একস্‌জিবিট নং ১। শাড়ি ব্লাউজ ও চুড়িগুলিকে দুভাগে আলাদা করে যথাক্রমে লেখা হ'ল দুই ও তিন নম্বর একস্‌জিবিট। অন্যগুলিকে চার নম্বরের একস্‌জিবিটের টিকিট সাঁটা হ'ল।—পরে আদালতে কেস উঠলে মামলার প্রদর্শনী দ্রব্যরূপে এগুলো দেখানোর সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থা।

একদিন এলাকায় হরতাল ডাকা হয়। অজুহাত—পুলিশী জুলুম। হ্যারিসন রোড হরতালের জন্য ফাঁকা। ফুটপাতে চেয়ার ও বেঞ্চি পেতে বসে আমরা অপেক্ষা করছি। সিপাহীরা এখানে-ওখানে বসে গোঁফে তা দিচ্ছে, খৈনি খাচ্ছে, জমাদাররাও আছে। আমাদের আশংকা, মিছিল যদি আসে তাহলে এলাকা নিরুপদ্রব না-ও থাকতে পারে।

পুলিশ-ঘেঁষা লোক সব সময় কিছু না-কিছু থাকে। সেই রকম এক পরিচিত ভদ্রলোক সেখানে এলেন। পুলিশী-ভাষায় এঁদের বলা হয়: পুলিশ ফ্রেণ্ড। ইনি ধনীর পুত্র, নিজস্ব গাড়ি ও বাড়ি দুইই আছে। গাড়িটি কেউ চাইলেই ব্যবহার করতে দেন। প্রয়োজনে পুলিশের পক্ষে সাক্ষী হন। তাঁর রায়বাহাদুর পিতার মতো তিনিও

বিশেষভাবে রাজভক্ত। পরনে ফিনফিনে বিলাতী ধুতি ও পাঞ্জাবি। তিনি একজন হেড-কনস্টেবলের কাছে গিয়ে ভাব জমালেন এবং বললেন, 'ইনে লেড়কা লোককো পিটনে চাহী। ইংরাজলোক হামলোককো কিত্‌নী উপ্‌কার কিয়া। এহী বেইমান লোক উন্‌কো হটানে মাঙতা।'—জমাদার ওসব শুনে গোঁফ মুচড়ে যা উত্তর দিলো তা এই-যে সেকথা তো ঠিকই, কিন্তু আপনিও একজন বাঙালী। কোনও বাঙালীর মুখে এরকম উক্তি জমাদারের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল।—একটু দূরে এক অ্যাংলো সার্জেন্ট ওদের কথাবার্তার ধরন লক্ষ্য করছিল। এইবার তিনি কাছে এগিয়ে এসে জমাদারকে জিজ্ঞাসা করলেন যে ওই বাবু তোমাকে কী বলছিল? জমাদার দাঁড়িয়ে উঠে সত্যি কথাই বললে, 'উনি স্বদেশীদের সম্বন্ধে কিছু কথাবার্তা বলছিলেন।' আর যায় কোথা! সার্জেন্ট সাহেব তাই শুনে দারুণ ক্ষেপে তার গালে এক চড় কষিয়ে দিলেন এবং তাতেও তৃপ্ত না-হয়ে মাটিতে ফেলে ক্রমাগত বুটের ঠোক্কর দিতে লাগলেন। আমি দূর থেকে হাঁ-হাঁ করে ছুটে আসছিলাম, কিন্তু তার আর দরকার হ'ল না। ঘটে গেল একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা।

কংগ্রেসী ষাঁড়

একটি প্রকাণ্ড ষাঁড় বড়বাজারের ফুটপাতে নির্বিবাদে ঘুমুচ্ছিল। এক কংগ্রেসী বালক মজা করবার জন্যে কাগজে করে একমুঠো কড়া নস্যি তার নাকের নিচে ধরলো। ঘুমন্ত ষাঁড় ঘন নিশ্বাসে তার সবটুকু নাকের মধ্যে টেনে নিলো এবং শুরু হ'ল প্রতিক্রিয়া। যাকে বলে এলাহী কাণ্ড। ষাঁড়টি ক্ষেপে গিয়ে কেবল হাঁচে আর দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়োয়। সে প্রথমেই ওই সার্জেন্ট সাহেবকে গুঁতিয়ে চিৎ করে ফেললো। তারপর পরোয়া না-করে বন্দুকধারী শান্ত্রীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। পালাও—পালাও। বন্দুকধারী শান্ত্রীদের সকলেই হিন্দু ও গুর্খা—হাতে অস্ত্র থাকা-সত্ত্বেও তাদের কেউ গো-বধে রাজী নয়। ফলে, ষাঁড়টির লম্ফঝম্ফ একটুও কমলো না। তার লাল-পাগড়ির উপরেই যেন বেশি রাগ। ভয়ে পুলিশও দৌড়োয় জনতাও দৌড়োয়। হ্যারিসন রোড কয়েক মুহূর্তে একেবারে জনমানবশূন্য।

কী বিচিত্র শিক্ষা! সার্জেন্ট সাহেবটি তো ঢিট হলেনই, পরদিন সেই রাজভক্ত ভদ্রলোকটিকে দেখে আমি তো অবাক। পরিবর্তন তাঁর মধ্যেও। ফিনফিনে বিলাতী ধুতি ও পাঞ্জাবির পরিবর্তে আজ তার পরনে মোটা খদ্দরের ধুতি আর মাথায় খাদি গান্ধীটুপি। ষাঁড়ের অযাচিত শিক্ষা তিনি এমনভাবে গ্রহণ করেছেন যে

সেদিন থেকেই তাঁকে কংগ্রেসের বিশ্বস্ত কর্মী হতে দেখা গেল। এমন-কি মোটা অঙ্কের চাঁদাও তিনি কংগ্রেস ফাণ্ডে দিয়েছিলেন।

বিঃ দ্রঃ—প্রকাশ্যে প্রহার দ্বারা নিয়োগকারীদের যথেষ্ট ক্ষতি করা হয়েছিল। এই প্রহার যারা দেখে বা শোনে তারাও ব্রিটিশ-বিরোধী হয়। প্রহৃত ব্যক্তির মতো তার বন্ধু, আত্মীয় ও পড়শীরাও গভর্নমেন্ট-বিরোধী হয়। এযুগের পুলিশ-কর্মীদেরও তা স্মরণ রাখা উচিত। শৈশবে আমি এক থানায় এক নারীর চুল ধরে এক দারোগাকে প্রহার করতে দেখেছিলাম। তাতে আমার মনে পুলিশ-বিরোধী মনোজটের (কমপ্লেক্স) সৃষ্টি হয়েছিল। পরে বহু উৎপীড়ন ও প্রহারাদি দেখেছি কিন্তু শৈশবে-দেখা সেদিনের ঘটনাটাই আমাকে বেশি ব্যথিত করে। এজন্য শিশুদের সম্পর্কে পুলিশদের বেশি সাবধান হওয়া উচিত।

আমাকে একদিন জনৈক ইংরাজ উর্ধ্বতন অফিসর বলেছিলেন, 'তোমাদের মতো ভদ্র ও সদ্ব্যবহারকারী কর্মী যতো বেশি হবে আমাদের জনপ্রিয়তা ততো বাড়বে। আমাদের রাজ্য-শাসনও ততো দীর্ঘায়িত হবে। কিন্তু উৎপীড়ক ও প্রহারকারী অফিসররা প্রকারান্তরে আমাদের বিদায় ত্বরান্বিত করবে। এদের ব্যবহারের জন্যই তোমাদের দেশ তাড়াতাড়ি স্বাধীন হবে। প্রকৃতপক্ষে ওরাই এই ঘুমন্ত দেশকে পিটিয়ে জাগিয়ে দিচ্ছে।'

থানা-বাড়িতে আচমকা ভূতের উপদ্রব শুরু হ'ল। 'ঠিক দুক্কুর বেলা ভূতে মারে ঢেলা' নয় বরং 'ঠিক দুক্কুর রাতে ভূতে ঢেলা নিয়ে মাতে'-গোছের ব্যাপার। চকমিলান থানা-বাড়ির উঠোন ইঁটের টুকরোয় ভরে যাচ্ছিল। মাঝরাত থেকে ভোররাত পর্যন্ত ক্রমাগত ইষ্টক বর্ষণ। কিছু কর্মী তাতে জখম হয়। প্রতিবেশীদের ছাদে পাহারা বসানো হ'ল। তীব্র সার্চলাইট জ্বেলে চতুর্দিক খোঁজা হয়েছে। কিন্তু ইঁট উৎক্ষেপের উৎপত্তির স্থান বুঝতে পারা যায় নি। আমরা থানা-বাড়ির উঠোনটা তারের জাল দিয়ে আবৃত করলাম, তবু প্রতিরোধ করা গেল না। এক জমাদার তো ভূতের ওঝা ডেকে আনলো, মাঝরাতে তার সে কী মন্ত্র আউরানো! আশ্চর্য, তাক করে ঠিক তার মাথাতে ঢিল। মন্ত্র-টন্ত্র সব ভণ্ডুল। প্রাণ বাঁচাতে সবাই অস্থির। অতএব ভূত ধরা সম্ভব হ'ল না।

ডেপুটি-সাহেব সব শুনে আমাকে বললেন, 'বাট ইউ আর এ সায়ান্স স্টুডেণ্ট।' —তার নির্গলিতার্থ ছাড়াও আমি বুঝেছিলাম যে অত্যন্ত চতুর কংগ্রেসী কর্মী-দের দ্বারাই এ অ-ভূতকর্ম। পরখ করবার জন্য কজন ধরা-পড়া পিকেটার বালককে উঠোনে সারারাত্রি বসিয়ে রাখা হ'ল। ব্যস! সেই রাত থেকেই ইঁট-বর্ষণ বন্ধ। এই বুদ্ধি বার করার জন্য আমি কুড়ি টাকা পুরস্কার পেয়েছিলাম।

একবার একটি বে-আইনী কংগ্রেসী মিছিল জোর করে ভেঙে দেওয়া হয়। ক্রুদ্ধ একদল জনতা থানার সামনে এসে ইষ্টক বর্ষণ শুরু করলো। তখনও পুলিশের পক্ষ থেকে গুলি-বর্ষণের রীতি নেই। থানায় কোনপ্রকার আগ্নেয়াস্ত্র থাকতো না। লাঠিই ভরসা। ওই অস্ত্রে দাঙ্গাকারীদের রুখতে কনস্টেবলরা প্রায়ই আহত হ'ত। পরে উভয়পক্ষ হাসপাতালের পাশাপাশি শয্যায় শুয়ে সুখ-দুঃখের গল্পও করেছে। পুলিশের জনৈক কর্তাব্যক্তি এসে হুকুম দিলেন, 'চার্জ লাঠি।' তারপর সাহেব বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আরে এ কী-রকম লাঠিচার্জ হচ্ছে। কেউই এখনও ইন্‌জিওর্ড হ'ল না। কারো এতটুকু রক্ত বেরুচ্ছে না। হাসপাতালে পাঠানোর মতো একটা কেসও তো নেই। হুম্। দেখছি, সবাই সিমপ্যাথেটিক।'

সাহেব কোমর থেকে নিজস্ব পিস্তল বার করলেন। এক কিশোর এগিয়ে এসে জামা খুলে বুক পেতে দাঁড়ালো। বললে, 'মারুন।'—সাহেব লজ্জা পেলেন এবং পিস্তলটি যথাস্থানে গুঁজে রাখলেন।

খবর পেয়ে কংগ্রেসী-কর্মীরা ছুটে এসে জনতাকে ঠাণ্ডা করলেন। ইঁট-বর্ষণ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। এইটুকু ভায়োলেন্সের জন্য কংগ্রেস-কর্মীরা দুঃখিত ও দারুণ লজ্জিত। ইংরাজ ডেপুটি-কমিশনার গাড়ি থেকে নেমে ভিড় ঠেলে থানায় ঢুক-ছিলেন। তাঁকে অপদস্থ না করে সসম্মানে তারা পথ ছেড়ে দিলো।

একবার এক পিকেটার-বালক এগিয়ে এসে একটা লজেন্স ডেপুটি-সাহেবের হাতে গুঁজে দিয়েছিল। ইংরাজ-সাহেব পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বলেছিলেন, 'সে কী! এটা তুমি আমাকে খেতে দিলে? আচ্ছা, আমি গ্রহণ করলাম।'—লজেন্সটি তিনি পকেটে পুরে রাখলেন। পিকেটার-বালকেরা আমাদের মুখে প্রায়ই লজেন্স গুঁজে দিতো ও বলতো, 'সেদিন বড্ডো মেরেছিলেন। এই নিন। আপনি একটা লজেন্স খান।'

কোনও জেলে তখন আর কয়েদী রাখার জায়গা নেই। স্থান-সংকুলানের জন্য পুরানো দাগী কয়েদীদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। তাতে এলাকায় চুরির সংখ্যা অসম্ভব বেড়ে যাচ্ছে। আমার উপর একদিন ঊর্ধ্বতন কর্তাদের হুকুম হ'ল, এক-দল মহিলা ও কিশোরীকে লরী করে দূরে কোথাও ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে। আমার সঙ্গে সেই রাত্রে একজন মাত্র ড্রাইভার ছিল। শহর থেকে ষোল-সতেরো মাইল দূরে এক জায়গায় ওদের আমি নামালাম। কিন্তু ওরা ওই জঙ্গলের মধ্যে কিছুতেই পড়ে থাকতে চাইলো না, সবাই মিলে আমাকে ধরে একটা সাঁকোর উপর বসিয়ে দিলো। একা আমি ও ড্রাইভার তাদের কবল থেকে মুক্ত হতে পারলাম না। ওরা আমাদেরই দেশের মা ও ভগিনী। উপরন্তু অতজনের সঙ্গে

লড়াই করাও অসম্ভব। সুতরাং ওদের সঙ্গে একটি গোপন-সন্ধি করতে হ'ল। আমরা নিকটের একটি রেল-স্টেশনে ওদের পৌছে দিলাম। আমাদের শর্তানুযায়ী দু'পক্ষের কেউই এ-ঘটনা কাউকে প্রকাশ করি নি।

[এইখানে তরুণ শিক্ষিত পুলিশ-অফিসরদের অসুবিধা বেশি হ'ত। লাঠিচার্জের হুকুম হলে জনতাকে তাড়া করা হ'ত। ওই জনতার মধ্য বহু আত্মীয়-স্বজন, সহ-পাঠী ও পরিচিত পড়শীদের মুখ দেখা যেতো। উদ্যত যষ্টি তাদের মাথায় বসানো সম্ভব হ'ত না।]

রাত্রিদিন অবিরাম ডিউটি। শরীর প্রত্যেকের ভেঙে পড়েছে। বহু অফিসর ও সিপাহী পীড়িত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। আন্দোলন আরও কিছুদিন চললে শাসন-ব্যবস্থা ভেঙে পড়তো। একদল মহিলা থানায় ঢুকে বন্দে মাতরম ধ্বনি তুললেন। জনৈক রাজভক্ত অফিসর তখন ক্ষেপে উঠে বললেন, 'মেথরানী! টাট্টিকো ঝাঁটা লে আও।' থানার মেথরানী ঝাঁটা নিয়ে এলো। কিন্তু তাঁর পরবর্তী আদেশ প্রতিপালন করলো না। এদিকে অন্য কজন অফিসর প্রতিবাদ করায় নিজেদের মধ্য কলহ বেধে গেল। সহানুভূতিতে দেশীয় কর্মীদের মধ্য আনুগত্যও প্রতিদিন কমে আসছিল।

প্রধান হাকিম ছুটিতে ছিলেন। তাঁর স্থলে এক সিনিয়র হাকিম কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর একমাত্র পুত্রটি প্রতি বৎসর পরীক্ষায় প্রথম হয়, কিন্তু পিকেটারদের সঙ্গে সে-ও গ্রেপ্তার হয়েছিল। ওই বিচারপতি তাঁর পুত্র সম্বন্ধে কি-রকম বিচার করেন তা দেখে একটা প্রতিবেদনের জন্য কর্তৃপক্ষ আমাকে আদালতে পাঠান। হাকিম-সাহেব একবার মাত্র নিজের পুত্রের পানে তাকালেন তারপর মুখে কলম কামড়ে একমুহূর্ত বোধহয় চিন্তা করলেন যে বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে কী বলবেন। তিনি অন্যদের সঙ্গে পুত্রটিকেও ছ'মাসের মেয়াদ দিয়ে টলতে-টলতে এজলাস ছেড়ে খাস-কামরায় চলে গেলেন। পর বৎসর দেখা গেল তিনি রায়-বাহাদুর খেতাব লাভ করেছেন।

সুসংবাদ এলো ৮ মার্চ ১৯৩১ গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট সমাপ্ত। অ্যাংলো-সার্জেন্টরা তাই শুনে ক্ষেপে উঠে বলেছিল, 'এরকম অপদার্থ বড়লাট ভারতে আগে আর-একজনও আসে নি।' আগের দিন বহু তেরঙা ঝাণ্ডা ও কংগ্রেসী ফেসটুন থানায় এনে বিনষ্ট করা হয়েছিল, আজ সেই-সব পতাকা ও ফেসটুন ফেরত দেবার হুকুম এলো। অগত্যা রঙিন কাগজ কিনে তাই দিয়ে পতাকা ও ফেসটুন তৈরি করে ওদের ফেরত দেওয়া হ'ল। কিছু পরে বড়বাজারের শিখাধারী কংগ্রেসী-কর্মীরা ঝুড়ি-ঝুড়ি মিঠাই এনে আমাদের বিতরণ করলো।

আইন-অমান্য আন্দোলন তখন সম্পূর্ণ বন্ধ। কিন্তু সিক্রেট ক্যাম্পগুলিতে তখনও বহু বালক মজুত। এদের মধ্যে অনেকেই গৃহ-পলাতক বালক। বাড়িতে ওদের আশ্রয় নেই। তারা খায়-দায় আর জেলখানা ঘুরে আসে। এখন মুশকিলে পড়লো। এখন তাদের কেউ আর খবর নেয় না। পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থাও নেই। নেতা ও উপনেতাদের তারা পাত্তা পায় না। কোনো কাজ নেই। না-লেখাপড়া না-গৃহপ্রত্যাবর্তন। ফলে কিশোর-অপরাধীদের সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে গেল।

এই বে-ওয়ারিশ বালকদের সম্বন্ধে আমি সরকার-বরাবর একটি প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলাম। ওদের সে-সময়ে বাড়ি-ফেরার গাড়ি-ভাড়াও নেই। আমি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে কয়েকজনকে রেলভাড়া দিয়েছিলাম। পরে গভর্নমেণ্ট থেকে ওদের সংগ্রহ করার হুকুম আসে। কিন্তু তখন কাউকেই আর খুঁজে পাওয়া যায় নি।

এই আন্দোলনে পুলিশদেরও যথেষ্ট আস্কারা দেওয়া হয়েছিল। তাদের মারমুখী স্বভাব সংযত করা কঠিন হয়ে ওঠে। পূর্বস্বভাব ফিরিয়ে আনতে কর্তৃপক্ষকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। বহুদিন পর্যন্ত ওদের আইনানুগত করা সম্ভবপর হয় নি। প্রকৃতপক্ষে পুলিশ দিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন দমন করতে গেলে এ রকমই হয়ে থাকে।

কার্যোদ্ধার সম্পূর্ণ হয়ে যাবার পরদিনই দেখা গেল ইংরাজ-উর্ধ্বতনরা ভিন্নমূর্তি ধরেছেন। ৮ মার্চের দিনই রিপোর্ট রুমে একজন অ্যাংলো অ্যাসিসটেণ্ট কমিশনার জনৈক নতুন ভর্তি স্নাতকোত্তর তরুণ কর্মীকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, 'ইয়া! ইউ আর এম-এ-সা (এম-এস-সি)। ইউ মাস্ট আন লার্ণ হিয়ার হোয়াট ইউ লার্ণড দেয়ার।'—সেই সঙ্গে তিনি আরও কয়েকটি আপত্তিকর কটূক্তি করেন। তরুণ-কর্মীটি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ স্বরূপ কর্মে ইস্তফা লিখে দিয়েছিলেন। উপস্থিত ইনচার্জবাবুরা তাঁকে বুঝিয়ে শান্ত করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন:

'আরে এ কী করছো! আমরা এখানে দশজন নিম্নপদস্থ কর্মচারী 'উপরওয়ালা যদি গালি দেয় তাহলে বিশটা পাবলিককে আমরা গালি দেব। তাতে নিদ্রাও ভালো হবে আর মনের জ্বালাও মিটবে।' অন্য একজন বাঙালী প্রৌঢ় ইনচার্জ সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'আরে শব্দ হচ্ছে ব্রহ্ম! তার কোনো আকার নেই, অর্থও নেই, যা-হোক একটা-কিছু মানে করে নিলেই হ'ল। জাপানে ড্যাম মানে গোলাপ ফুল, এখানে তার অর্থ গালাগালি। তাছাড়া গরু ডাকে, ঘোড়া ডাকে, বাঘ ডাকে। ডাকে তো? মনে করো এখানে সেই রকম কেউ-কেউ

ডাকছে। তাতে কী রাগ করতে আছে? ছেলেবেলায় বাবা আমাকে বকলে আমি কী ভাবতাম জানো?—ষাঁড় ডাকছে!'

[কোনও এক নতুন অফিসর সংস্কৃতে এম-এপাশ বলায় তাঁর প্রৌঢ় ইনচার্জ বলেছিলেন, 'সে কী! সংস্কৃত শিখে থানায় চাকরি করলে কার-কি উপকারে আসবে। তার চাইতে কোথাও একটা টোল খুলে বসলে না কেন?']

যাদের আত্মসম্মান জ্ঞান নেই তারা মানুষও খুন করতে পারে। উর্দ্ধতনরা এভাবে ওদের আত্মসম্মান বোধ বিনষ্ট করে অনেককেই তাদের মতো অসদ্ব্যবহারী এবং উৎপীড়ক করে তুলতো।

এতদিন বলা হ'ত নরম্যাল ওয়ার্ক বন্ধ করো। এখন নরম্যাল ওয়ার্ক না-করার জন্যে কৈফিয়ৎ। ওদিকে ইংরাজ-ডেপুটিরা ক্লাব-জীবনে ফিরে গেছেন। অফিসাররাও সিনেমা দেখতে ও নিমন্ত্রণ-রক্ষা করতে সক্ষম। কিন্তু শীঘ্রই বোঝা গেল যে পূর্বদিনগুলিই ছিল ভালো। বড়োসাহেব এসে থানার মালখানা পরিষ্কারের হুকুম দিলেন। চোখের সামনে এক নিদারুণ ঘটনা ঘটতে দেখলাম। বাংলায় লেখা বহু বাঁধানো কেতাব বাইরে এনে জড়ো করা হ'ল। ওগুলিতে সুন্দর হস্তাক্ষরে সরল পরিভাষা-সমূহ লেখা। কলিকাতা-পুলিশের স্থাপনা-কাল হতে ১৯১০ খ্রীঃ পর্যন্ত থানার কাজ বাংলা ভাষায় সমাধা করা হ'ত। নিষ্প্রয়োজন মনে করে ওগুলি প্রাঙ্গণে পুড়িয়ে ফেলা হ'ল। দুশো বছরের অমূল্য সম্পদ এভাবে ভস্মীভূত হতে দেখে আমি হতবাক।

[একই কেতাবে পর-পর নম্বর-সহ ভৃত্যচৌর্য, গৃহচৌর্য, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি বহু অপরাধের অভিযোগ। সিপাহীদের বেয়াদবী ও গাফিলতির বিষয় ওতাতে রয়েছে। কে কাকে কি গালি দিয়েছে বা কে হুকুম তামিল করে নি—কেতাবগুলির পাশে বাংলা ভাষায় উর্দ্ধতনদের লেখা মন্তব্যও ছিল।]

মা ঠিক সময়ে খেতে ও ঘুমাতে বলেছিলেন। কারো মনে কষ্ট দিতে ও মারামারির মধ্যে যেতেও তাঁর বারণ ছিল। কিন্তু এখানে তাঁর প্রতিটি উপদেশের বিপরীত কাজই করতে হয়। বিপদজনক কাজে ঝাঁপিয়ে কতবার জখম হয়েছি। মা-র নাগাল হতে ছেলে ছিনিয়ে কতবার গ্রেপ্তার করেছি। বাইরে বেরুলে লিখতে হ'ত কোন্ সময়ে বেরুলাম ও কখন ফিরলাম; কিজন্য কোথায় গিয়েছি ও সেখানে কি-কাজ করেছি। বেরুবার আগে ও ফিরবার পরে ডায়েরি বইয়ে ও প্রতিবেদনে তা লেখা চাই। দু-রাত্রি রাউণ্ডের পর একরাত্রি বিশ্রাম। ঢুলতে ঢুলতে যাওয়া এবং ঢুলতে ঢুলতে ফেরা। কখনও সারাদিন তদন্তে থাকি। সাক্ষী দিয়ে কোর্ট হতে বিকালে ফিরি। সকালের খাবার বিকালে খেতে হয়।

[পরে সাহেবদের বুঝিয়ে আমিই দু-রাত্রির বদলে একরাত্রি অন্তর রাউণ্ডের ব্যবস্থা করেছিলাম। এর আগে এবিষয়ে প্রতিবাদ করতে কেউ সাহসী হয় নি।]

বড়োসাহেব একবার থানায় এসেছিলেন। উনি দারুণ চেঁচামেচি করে গেলেন। জুনিয়র-অফিসর শুক্রল সাহেব বড়োবাবুকে বললেন, 'আপনি রোঁদে আছেন বললে উনি হয়তো বিশ্বাস করলেন না। চেঁচাতে দাও। ওতে মন শান্ত হবে।'—বড়োবাবু একটুও ভীত না-হয়ে বললেন, 'একসঙ্গে দুজনে আগে কাজ করেছি। এখন উনি উচ্চপদস্থ হলেও পরস্পরের দুর্বলতা জানি। জব্বরকে ডেকে বলো, কিছুদিন বন্ধ রাখুক। আমাকে উনি বেশি ঘাঁটাবেন না। তবে তোমরা একটু সাবধানে থেকো। এখন তিনি বাড়িউলি হয়ে পূর্বজীবন ভুলে গেছেন।' (এ রকম কথাবার্তা তখনও আমার কাছে দুর্বোধ্য।)

শীঘ্রই বুঝলাম যে পুলিশ-বিভাগ এক গহন সুন্দরবনের সঙ্গে তুলনীয়। সেখানকার কাঁকড়া-বিছা মাঝে মাঝে দংশন করবে। ডাঁশ মশার কামড়ে উত্যক্ত হতে হবে। শুধু দেখতে হবে সাপের দংশন বা বাঘের আক্রমণের মতো ফেটাল-কেস যেন না হয়। জরিমানা, ধমকানো ও বরখাস্ত ওখানে সাধারণ ঘটনা।

এছাড়া একপ্রকার অদৃশ্য জীবাণু আছে যা অজ্ঞাতে ফুসফুস ফুটো করে শরীরে অকেজো করে। ডাক্তারী শাস্ত্রে তার নাম যা-ই থাক্ পুলিশ-শাস্ত্রে তার নাম, গোপন নথী (C. C. Role), যা আরও সাংঘাতিক। কখনও কখনও বহুকাল পরে তার অস্তিত্ব ক্রিয়াশীল হয়।

পুস্তক-বিক্রেতা ভোলানাথ যেন এক মুস্লিম তরুণ কর্তৃক কলেজ স্ট্রীটে নিহত হলেন। তাঁর অপরাধ, তিনি ভুল করে একটি পুস্তকে হজরত মহম্মদের প্রতিকৃতি ছেপেছিলেন। শ্রীসত্যেন মুখার্জি ও আমি তাকে চিৎপুরের এক মসজিদ হতে গ্রেপ্তার করলাম। আমি অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে নিরস্ত্র করি। ফাঁসির হুকুম দিতে গিয়ে হাইকোর্টের ইংরাজ জজ লিখেছিলেন : 'সাম্প্রদায়িক বা রাজনৈতিক কোনও হত্যাতে রেহাই নেই।'

পর-পর কয়েকটি বড়ো অপরাধের সার্থক কিনারা করতে পারায় জোড়াসাঁকোর ইনচার্জ সত্যেন্দ্র মুখার্জি আমাকে তাঁর কাছে টেনে নিলেন। মৎপ্রণীত 'পকেটমার ও অন্ধকারের দেশে' রচনায় ওই সকল দুরূহ মামলার উল্লেখ আছে। বড়বাজার থানা হতে আমি জোড়াসাঁকো থানায় বদলি হলাম।

তৃতীয় অধ্যায়

জোড়াসাঁকো থানায় প্রবেশ করে বুঝতে পারি যে সেখানে পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এক-এক ইনচার্জের প্রমোশন এক-একরকম হয়। সত্যেন মুখার্জির মতো দুঁদে, কর্মক্ষম ও সেই সঙ্গে সৎ অফিসর সে-যুগে দুর্লভ ছিল। কড়া ও সৎ উর্ধ্বতনদের আমারও পছন্দ। এঁদের কাছে ভালো কাজের স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

'আমি কাঁচা খেয়ে ফেলবো। আজই একজনকে খাবো।'—ইনচার্জ-অফিসর সত্যেন মুখার্জি কজন নিম্নপদস্থ কর্মীর উদ্দেশে চেঁচাচ্ছিলেন, 'পারেন তো ছুটি নিন কিংবা বদলি হয়ে যান, নইলে আপনাদের খতম করে দেব। রহমত মিঁয়ার জুয়া ও কোকেন ব্যবসা চলছে কী করে—য়্যাঁ? আপনারা কিস্সু করেন না, কিস্সু দেখেন না।'

ইতিমধ্যে এক ধনীব্যক্তি মোটর থেকে নেমে, প্রদর্শনীর মতো আঙুলের হীরের আংটিগুলি উঁচিয়ে থানায় ঢুকলেন এবং সত্যেনবাবুকে বললেন, 'আপনি এ-থানায় এসেছেন শুনে আলাপ করতে এলাম। হে হে। আপনাদের ওপরওয়ালা-দের সঙ্গেও আমার খাতির আছে। আপনি নিশ্চয় আমার পরিচয় শুনে থাকবেন। আমি—' সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জি চেয়ার হতে লাফিয়ে উঠে তৎক্ষণাৎ বললেন, 'মশায়, আপনি তো একজন অ্যারিস্ট্রোকেট দালাল। নিম্নপদী ও নবাগত কর্মীদের নষ্ট করে চরিত্রহীন করাই তো আপনাদের কাজ। আপনি ফের এখানে এলে ফাটকে বন্ধ করে দেবো। এই দালাল-শ্রেণী আর বাস্তু-উকীলদের আমি থানায় ঢুকতে দিই না। ক্লিয়ার?' [থানা প্র্যাকটিশ-করা কিছু উকীল ছিল।]

জোড়াসাঁকো এলাকার মতো দুর্ধর্ষ গুণ্ডা-অধ্যুষিত এলাকা অন্যত্র ছিল না। রাত্রে একটি বাড়িতে তল্লাসীর জন্য প্রবেশ করলাম। হঠাৎ সিঁড়ি থেকে শক্ পেয়ে সিপাহীরা নিচে গড়িয়ে পড়লো। ওরা যেখানে হাত দিয়েছে সেখানে হাইভোল্ট ইলেকট্রিক সংযুক্ত ছিল। এরপরই ডালকুত্তাদের আমাদের উপর ছেড়ে দেওয়া হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টক-বর্ষণ শুরু। ফলে আমাদের বহুজনকে হাস-পাতালে যেতে হ'ল। পরে ওরা কৈফিয়তস্বরূপ বলে যে তারা আমাদের ডাকাত ভেবেছিল। জলের ঝারি করে ওরা কোকেন ড্রেনে ফেলেছে।

বাতাসী-বিবির ডেরাতে দুজন জোয়ান স্বামী কাম (Cum) রক্ষী ছিল। তাদের ঘরের দেওয়াল ঘুরিয়ে ওরা পালাতে পারতো। নিচে কোনও লোকজন নেই। একতলার ছাদ থেকে আঙটা টানলে দেওয়ালের চৌকো অংশসহ একটি মই নিচে নেমে আসে, অথচ মনে হবে ওই আঙটা কোনও-কিছু টাঙাবার জন্য তৈরি করা হয়েছে। উপর হতে নারকেল-মালা নেমে এলে কোকেন-খোর ব্যক্তি তাতে মূল্য রাখে। তারপর মালাটি উপরে উঠে গেলে মূল্য তুলে নিয়ে সেই পরিমাণ কোকেনের পুরিয়া নিচে নামে। মাঠকোটার দেওয়ালে ছোট ফুটো-মারফত কোকেন বিক্রি হয়। কে বা কারা বিক্রি করলো তা ওই বাড়িতে ঢুকে প্রমাণ করা যায় না। (সনাক্তির জন্য রঙ-ছোঁড়া পিচকারি ব্যবহার করতাম।) ...জনৈক নেতা শয্যায় দেহ এলিয়ে পিস্তলের গুলিতে বাল্‌ব ভেঙে আলো নেবাতেন। মৎপ্রণীত 'অধস্তন পৃথিবী,' 'খুনরাঙা রাতি' ও 'অন্ধকারের দেশে' প্রভৃতি রচনায় এদের বিষয় হুবহু বলেছি। বস্তি-অঞ্চলে ধরে এনে গুম-করা এদের সাধারণ ঘটনা।

কোনও এক গুণ্ডা-সর্দার উঠানে নিদ্রা যেতো। রৌদ্র উঠলে কেউ তার চোখে রুমাল চাপা দিতো। কিছু পরে চারজন তরুণী তাকে খাটিয়া-সুদ্ধ ঘরে তুলে নিয়ে যেতো। সেখানে সে খাটিয়ায় বসে গড়গড়া মুখে দিতো। তার পাঞ্জা দেখালে দলের লোকেরা তাকে মদত দিয়েছে।

একবার এক মুস্লিম গুণ্ডাকে নাম জিজ্ঞাসা করা হলে সে বললে, তার নাম সেখ করীম; বাবার নাম সেখ আবদুল। কিন্তু ঠাকুরদার নাম জিজ্ঞেস করলে সে বলেছিল, 'ওস্‌কো নাম ছোড় দিজিয়ে হুজুর। ও শালে হিন্দু থে।'...বন্ধু-কর্মী মহম্মদ মহসীন তা শুনে ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিল, 'দেখ। এদের মধ্যে এজেন্ট-প্রপোগেটর কাজ করছে।' হ্যালিডে পার্কে মুস্লিম এবং গিরিশ পার্কে হিন্দু বক্তা সাম্প্রদায়িকতা প্রচারে রত। বন্ধু মহসীনের সাত-পুরুষের ভিটায় পাতকুয়া খুঁড়ে বহু দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া যায়। বাড়ির লোকেরা মূর্তিগুলি লুকোবার চেষ্টা করলে সে বাধা দেয়। কলিকাতার প্রত্যেক পুলিশ-কর্মী অসাম্প্রদায়িক ছিল। কারণ, তারা নিজেদের হিন্দু বা মুস্লিম না-ভেবে কেবল পুলিশ হিসাবেই ভেবেছে, যার কোনো জাত নেই।

তবে জোড়াসাঁকোর মতো সমস্যা-সংকুল থানা গোটা ভারতে আর ছিল কিনা সন্দেহ। জনৈক তরুণ মুস্লিম দুহাত পেটে চেপে থানায় এসে বললে, 'মেরি বুনাই দিল্লাগি কর্‌কে ছুরি মার দিয়া।'—জোর করে তার হাত পেটের উপর থেকে সরানো মাত্র নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়লো। থানা-সুদ্ধ লোক অপ্রস্তুত,

হতভম্ব।…কোঁচড়ে ইঁট পুরে মাস্তানরা 'আফ্রিকা স্পিক্' ফিলিম দেখছে। হঠাৎ বাঘের গর্জন শোনা মাত্র 'মার্ শালে বাঘ' বলে কোঁচড় শূন্য করে ইঁট ছুঁড়লো। তাতে বাঘ অবশ্য মরলো কেননা পর্দা শতচ্ছিন্ন। তাই সত্যেন মুখার্জির মতো ব্যক্তিকে এখানে বহাল করা হয়েছিল।

এই এলাকায় আমার প্রধান আকর্ষণ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি। ওই বাড়ির ঠাকুর-দালানে আমি 'নটীর পূজা' নাটকে তাঁর অভিনয় দেখেছিলাম। এইখানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সুযোগ ঘটে। এই বাড়ির এক কক্ষে অবনীন্দ্রনাথ আমাকে ও হেমেন্দ্রকুমার রায়কে 'শব্দকল্পদ্রুম' প্রভৃতি কয়েকটি লেখা পড়ে শুনিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রাহ্মসমাজ শ্রমিক-সেবার পরিকল্পনা মতো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম জীবনে একটি শ্রমিক-সমাজের সভাপতি হলে ইংরাজ-বণিক-সভার বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তাঁর বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণও ব্রিটিশ-গভর্নমেন্ট পছন্দ করেন নি। ওঁরা রবীন্দ্রনাথের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখবার জন্য জোড়াসাঁকো থানার সারভেলেন্স-রেজিস্টারে তাঁর নাম নথিভুক্ত করেছিলেন। এ সম্বন্ধে কোনও এক ইংরাজ-রাজপুরুষ নিম্নোক্ত রূপ একটি প্রতিবেদন লেখেন :

'এই দীর্ঘকায় গৌরবর্ণের শ্মশ্রুযুক্ত ভদ্রলোককে হঠাৎ দেখলে যীশুখ্রীস্ট বলে ভ্রম হয়। এই একটিমাত্র কারণে তিনি বহু ইংরাজ-পণ্ডিতকে বিভ্রান্ত করতে পেরেছেন। বহু য়ুরোপীয় ভদ্রলোক না-বুঝে তাঁর বাড়িতে যাতায়াত করেন। তিনি স্বয়ং জমিদার হওয়া সত্বেও প্রজা-দরদী। ধনীপুত্র হয়েও তিনি বোলপুরে একটি ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন।'

একদিন এক জমাদার থানায় ফিরে এসে বড়োবাবুকে সংবাদ দিচ্ছিল : ৩ নং দাগী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাড়িতে হাজির নেই। এই-সময় জনৈক ভারতীয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থানায় উপস্থিত ছিলেন এবং তা শুনে স্যর যদুনাথকে গল্পচ্ছলে বলেন। ঘটনাটি প্রকাশ পেলে ইনচার্জ-অফিসরকে কৈফিয়ৎ দিতে হয় এবং তৎক্ষণাৎ কবিগুরুর নাম ওই তালিকা হতে বাদ দেওয়া হয়।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হেমেন্দ্রকুমার রায় ও কালিদাস নাগের মাধ্যমে আমার পরিচয়। ডঃ নাগের গ্রেটার ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টে আমি ছাত্রাবস্থায় যুক্ত ছিলাম। আমার পরিচয় দিতে সংকোচ হচ্ছিল। ডঃ নাগ তার কারণ বোঝাতে চাইলেন।

গুরুদেব তখন বললেন, 'মানুষের কাছে মানুষের পরিচয় দিতে লজ্জা হয় এমন কি ব্যাপার থাকতে পারে।' আমি স্থানীয় পুলিশ-কর্মী শুনে তিনি বলেছিলেন, 'থানা তো কাছেই ছিল। পুলিশ একেবারে বাড়ির ভিতর! অতঃপর থানা-পুলিশে জড়িয়ে না পড়ি।' তাঁর রসিকতা যাই হোক, উপস্থিত গুণীব্যক্তিদের জোড়া-জোড়া চোখ আমার দিকে নিবদ্ধ হ'ল। আমি বিব্রতবোধ করে একটু একটু করে পিছিয়ে সেই স্থান ত্যাগ করি।

তাঁকে কৈশোরে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ হল-এ প্রথম দেখি। 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সভাপতি ছিলেন। রামানন্দবাবু বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি যৌবনে বহু কবিতা লিখেছি। অতি অল্প সময়ে ওই কবিতাগুলি প্রশংসা-লাভ করে। কিন্তু আমার কবিতার খাতাটি হারিয়ে গেছে।'—রবীন্দ্রনাথের ভাষণটি আমার স্পষ্ট মনে আছে। তিনি বক্তৃতা দিতে উঠে বললেন, 'রামানন্দ-বাবুর কবিতাগুলি স্বল্পকালে প্রশংসিত হয়েছিল এবং স্বল্পকালেই লোকে তা ভুলে গেছে। এমন-কি খাতাটি পর্যন্ত তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু আমাকে কবিরূপে স্বীকৃতি পেতে চল্লিশ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়েছে। তাই স্বীকৃতি একটু দেরিতে আসাই ভালো। তাতে লেগে থাকা যায়, চর্চা করা যায়।'

রবীন্দ্রনাথ পুলিশের প্রতি স্নেহশীল ও সহানুভূতি ছিলেন। তাই 'মুকুট' নাটকে তিনি লিখে গিয়েছেন যে পুলিশ কারো পা জড়িয়ে ধরলে লোকে মনে করে জুতো-জোড়াটা সরাবার মতলবে আছে। পুলিশ-সম্পর্কে জনগণের অন্যায় সন্দেহ তাঁকে ব্যথিত করতো। অন্যদের মতো তাঁরও বহু অসুবিধা ছিল। তাই একটি পত্রে তিনি দুঃখ করে লিখেছিলেন: 'আমার মধ্যে যেটুকু আগুন আছে তা দিয়ে সারাবাড়ি আলোকিত হয় না, ঘরের কোণে একটি প্রদীপ মাত্র জ্বালানো যায়।'—তিনি শেষদিকে কথ্যভাষার পক্ষপাতী হন। সাধুভাষায় লেখা পুস্তক স্থায়িত্ব পাবে কিনা তাঁর সন্দেহ ছিল। 'নৌকাডুবি' সাধুভাষায় লেখা বলা হলে তিনি বলেছিলেন, 'তাহলে ওটা ডুবলো।' একটি সভায় (E. N. Club) কবি জসীমউদ্দীন ও অন্যান্য মুস্লিম কবি-সাহিত্যিকদের সভ্য করার জন্য ওঁকে বলতে শুনেছিলাম। শান্তিনিকেতনে তরুণ চিত্রশিল্পীদের তিনি বলেছিলেন, 'যদি আমপাতা এঁকে তলায় লেখো কাঁঠাল পাতা, তাহলে তা আমও নয় কাঁঠালও নয়, সে হবে তোমার মনের পাতা।'—তাঁর মুখনিঃসৃত প্রতিটি বাক্য অমৃত আস্বাদযুক্ত ছিল।

এক পত্রিকা-সম্পাদক তাঁর একটি কবিতা উদ্ধৃত করেন: 'তোদের চক্ষু যত রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে। তোদের বাঁধন যত শক্ত হবে মোদের বাঁধন টুটবে।'

তৎকালীন পুলিশ ওই সম্পাদকের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকেছে। কিন্তু মূল লেখক রবীন্দ্রনাথকে তার জন্য তারা বিরক্ত করে নি। (অধুনা পুলিশ-ক্লাব লাইব্রেরিতে একটি রবীন্দ্র-শাখা আছে।) রবীন্দ্রনাথ উঠে-যাওয়া পুরনো পত্রিকাগুলি পুনর্জীবিত করা পছন্দ করতেন না। তাঁর মতে ওদের কাজ শেষ হয়ে গেছে। মানুষের মতো ওদেরও জীবনদান অসম্ভব। তাতে পূর্বভাবধারা পুনঃপ্রবাহিত হয় না।

[অবনীন্দ্রনাথ আমাদের বলেছিলেন যে শেষ-জীবনে তাঁর আঁকা ছেড়ে লেখা এবং রবীন্দ্রনাথের লেখা ছেড়ে আঁকার ইচ্ছা। তিনি আরও বলেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের পরমায়ু তাঁর অপেক্ষা বেশি। কারণ, ওঁর মধ্যে মহর্ষির প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব রয়েছে।]

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের বহুবার বলেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ আমাদের জন্য লেখেন আর আমরা তোমাদের জন্য লিখি। উনি যুগের চাইতে বহুদূর এগিয়ে আছেন বলে তাঁর সব লেখা তোমাদের বোধগম্য হয় না।'

বিঃ দ্রঃ—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর উত্তরাধিকারীদের মুখে শুনেছিলাম, রবীন্দ্রনাথের প্রথম পুস্তক তাঁরাই প্রকাশ করেন। তৎকালে লেখকদের সংখ্যা অতি নগণ্য ছিল। তাঁরা এক-একজন লেখকের প্রাপ্য অর্থ এক-এক রঙের কৌটোয় রাখতেন। রবীন্দ্রনাথ পুস্তক-বিক্রির সংবাদ নিতে এলে তিনি বলেছিলেন, 'তুমি রবীন্দ্রনাথ ? ঠিক আছে। তাহলে হলদে কৌটো। একখানি পুস্তক বিক্রি হয়েছে। কমিশন বাদে তোমার প্রাপ্য দু-আনা।'—রবীন্দ্রনাথ নাকি সবিনয়ে বলেছিলেন, 'ক্রেতার নাম ও ঠিকানা যদি দেন তাহলে তাঁকে একদিন বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতাম।'

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাকালে আমি ডিউটিতে সেখানে ছিলাম। বক্তৃতার প্রারম্ভে বাংলাতেই তিনি বললেন, 'শ্যামা-প্রসাদের পিতা আশুতোষ স্নাতকোত্তর বিভাগে বাংলা ভাষা পাঠ্য করেন। এবার ভাইস-চ্যানসেলার হয়ে তিনি প্রথম বাংলা ভাষাকেই সমাবর্তনের আসরে টেনে আনলেন।' বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যানসেলার ইংরাজ লাটবাহাদুর তাঁর ভাষণে বলে-ছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক করার প্রশ্নে তিনি বাংলা ভাষায় পণ্ডিত নন বলে আপত্তি উঠেছিল।' কিন্তু পরবর্তীকালে বাংলা ভাষার স্রষ্টারূপে তিনি স্বীকৃত হয়েছিলেন। (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একবার আমাদের বলেছিলেন, 'রবিঠাকুরের সভায় গিয়ে লাভ হয় কী ? উনি নিজেই কথা বলেন আর সবাই চুপ করে তা শোনে। কিন্তু আমার বৈঠকে সকলের সমান অধিকার।' প্রকৃতপক্ষে অত বড়ো ব্যক্তিত্বের নিকট কোনো কথা বলা সম্ভব ছিল না।)

ঠাকুর-বাড়িগুলির মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অলংকৃত কাঠের সিঁড়িটি আমাকে মুগ্ধ করতো। উত্তরকালে ওই প্রাসাদের বিলুপ্তি আমাকে মর্মাহত করেছিল। তৎপূর্বে অবনীন্দ্রনাথের গৃহত্যাগকালে মর্মন্তুদ স্বগত-ভাষণটি কেউ জানে না। তিনি গৃহের প্রতিটি কক্ষের আসবাবাদি এবং উদ্যানের প্রতিটি বৃক্ষের নিকট গলবস্ত্রে ও করজোড়ে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন।—'হে লতা! হে বৃক্ষ! তোমরা আমাকে বিদায় দাও। হে মৃত্তিকা! হে ইষ্টক! তোমরা আমাকে বিদায় দাও।' উপস্থিত ব্যক্তিরা তা দেখে চোখের জল সংবরণ করতে পারেন নি।

ঠাকুর-বাড়ির ছুটি চুরির মামলার কিনারা করায় খুশি হয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে মিশনারিদের অপেক্ষা পুলিশের জনসেবার সুযোগ বেশি। আমি তাঁর এই বাণী স্মরণ রেখে এরূপ প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলাম।

এইকালে কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে পেশোয়ারীরা বাঙালীদের ফল-বিক্রয়ে বাধা দিতো। আমি ওখানে সিপাহী মোতায়েন করে বাঙালী তরুণদের দোকান বসিয়েছিলাম। মার্কেট-সুপারিনটেনডেণ্ড রঞ্জনবাবু এ-ব্যাপারে আমার সহায়ক হন। বাঙালী বেকার তরুণদের চা বিপণি ও হোটেলের অজস্র লাইসেন্স মঞ্জুর করি। রামবাগান বেশ্যাপল্লীর নারীদের সুরক্ষণ ও তাদের শিশুদের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলাম। জনৈক উৎপীড়ক অফিসরকে বড়বাজারে বদলি করে ওই এলাকার ভার আমাকে দেওয়া হয়। ওদের পুত্রকন্যাদের বিবাহ দিয়ে তাদের গৃহস্থ করার ব্যবস্থা আমি করেছিলাম। আমার কাজের স্বীকৃতি-স্বরূপ নিম্নোক্ত গানটি বেশ্যাপল্লীতে প্রায়ই গীত হ'ত। গায়িকা ইন্দুবালা এই গানটি প্রথম গেয়েছিলেন:

'বড়োবাজারে অমুকবাবু
খাচ্ছে বসে মেওয়া।
পঞ্চু ঘোষালকে করলে রাজা
রামবাগানের বেওয়া।'

থানার প্রবীণ সিপাহী ও জমাদাররা ওইকালে কর্মদক্ষ ছিল। বহু তদন্তে অফিসরদের সাহায্য করে ওরা তাঁদের সুনাম এনে দিতো। জনৈক স্নেহপ্রবণ জমাদার নিজে আমাকে বলেছিল, 'ছোটবাবু, কুছ কুছ ছোটউটি গাফিলি হামিলোককে লিয়ে করবেন। আপকো ভালাইকো বাস্তে ম্যায়লোক দলিল-খাট চুকেগা। নেহি তো ইসকো বাড়ে আপকো আপদ আসবে। আউর ইসমে বড়িয়া কৈফিয়ৎ দিতে

হবে।'—কোনও তরুণ অফিসরকে নারীর প্রতি মনোযোগী বুঝলে তারা বাধা দিয়ে বলেছে: 'উহু'। আপ বড়ি ঘরকি লেড়কা। ঘরমে আপকো বহু-বেটি আছে।' ...এদের নিকট পুলিশ-লাইনের কতকগুলি পরিভাষা আমি রপ্ত করেছিলাম যেমন ফর্জেণ্টি = উপর চালাক, হুদ্দো = এলাকা, মেরামতি = টাইট দেওয়া, খানে-ওয়ালা লড়নেওয়ালা ঝঞ্ঝাটিয়া রামধোলাই শ্যামধোলাই কোচোয়া ধোলাই। ফালতু আদমি, মোকা = কিল, হাফ উর্দি অর্থাৎ ধুতির উপর য়ুনিফর্মের কোট (জরুরি হাল্লাতে ওই ব্যবস্থা), পেটি = বেল্ট, বে-পেটি, বে-উর্দি, রেঁাদ অর্থাৎ রাউণ্ড ইত্যাদি।

[বহু কুসংস্কারও থানায় প্রচলিত ছিল। কারো হাত থেকে লাঠি বা হাতিয়ার মাটিতে পড়ে গেলে তার অর্থ—ঝামেলা বাড়বে। তখনই প্রতিষেধক হিসাবে ওতে জল ঢালা হ'ত। কারো সাসপেণ্ড বা বদলির পর নতুন অফিসর এলে তাঁর টেবিল অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিতেন।]

শিব্রাম চক্কোরবর্তী নামে এক তরুণ লেখক এলাকার এক মেস-বাড়িতে থাকতেন। স্বদেশী-ওয়ালা সন্দেহ করে তাঁর গতিবিধির উপর নজর রাখার হুকুম হ'ল। তাঁকে ফলো করে এক হোটেলে গেলাম ও একসঙ্গে কিছু খেলাম। পরে তিনিই একদিন আমাকে ফলো করে থানায় এলেন ও কিছু টাকা কর্জ চাইলেন। যাবার পূর্বে আপশোষ করে তিনি বললেন যে তাহলে পুলিশের পরই কাবুলিওয়ালার কাছে যেতে হয়। একদিন কাবুলিওয়ালা তাড়িত হয়ে তিনি থানায় আশ্রয় নিলেন। আমরা ওই কাবুলিওয়ালাকে চেপে ধরে হাজতে পুরলাম। ফলে ভারত-গভর্নমেণ্ট ও আফগান-গভর্নমেণ্টের মধ্যে পত্রালাপ শুরু হয়েছিল। কৈফিয়ৎ স্বরূপ আমি কাবুলিদের শতটাকায় শতটাকা সুদ ও তদজনিত অত্যাচারের ফিরিস্তি সহ প্রতিবেদন পাঠালাম। কিন্তু সুলেখক শিব্রামবাবু সাক্ষী দিতে চাইলেন না। তাঁর মতে ওরা জনগণের উপকারী বন্ধু। সেইদিন পুলিশ বিরূপ হলেও ওরা তাঁকে টাকা দিয়েছে। তাঁকে জবরদস্তি ডেপুটির কাছে হাজির করতে আদিষ্ট হলাম। কিন্তু ততদিনে তিনি নিখোঁজ হয়ে গেছেন।

এই উপলক্ষে কাবুলিদের উৎপাত সম্বন্ধে দেশব্যাপী তদন্ত চললো। গভর্নমেণ্ট আফগান মানি লেণ্ডিং অ্যাক্ট পাশ করলেন। তার কয়েকটি ধারায় উল্লেখ আছে উৎপীড়ন করলে তা পুলিশ-গ্রাহ্য অপরাধ-গ্রাহ্য অপরাধ রূপে গণ্য হবে। উচ্চহারে সুদ গ্রহণও তার দ্বারা বন্ধ করা হয়।

গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট ভেঙে গেলে কংগ্রেসকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছিল। সাব-ইনস্পেকটরদের ও তার উচ্চপদস্থ অফিসরদের নিকট ছাপানো কমিটেণ্ট

অর্ডারের বহু ফর্ম থাকতো। তাঁরা সন্দেহ হওয়া মাত্র যে কোনও ব্যক্তিকে হাকিমের নিকট উপস্থিত না-করে নিজেরাই তাতে সই করে জেলে পাঠাতে পারতেন। এত ক্ষমতা পুলিশকে আগে কখনও দেওয়া হয় নি। কিন্তু এই ক্ষমতা পাওয়া সত্ত্বেও আমরা কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে বেআইনী কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন বন্ধ করতে পারি নি। আমি বৃথা অপেক্ষা করে সিপাহীদের মধ্যাহ্ন-ভোজের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলাম। হঠাৎ বাজারের মধ্য হতে খালি-হাতে খদ্দর ও গান্ধী-টুপি পরা কংগ্রেসী প্রতিনিধিরা পথে নেমে সভা শুরু করে দিলেন। গান্ধী-টুপিগুলো পকেটে থাকায় আমি ওদের স্বরূপ বুঝতে পারি নি। ছুটে গিয়ে গ্রেপ্তার করার পূর্বেই সভাপতি মশাই তাঁর ভাষণের পুরোটাই পড়ে ফেলেছিলেন।
ওঁরা নির্বিবাদে থানায় এসেছিলেন। ইংরাজ ডেপুটি সংবাদ পেয়ে থানায় এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এদের বডিলি ট্রিটমেণ্ট করা হয়েছে?' আমি বিব্রত হয়ে মিথ্যা করে বলেছিলাম, 'হ্যাঁ।' নগ্ন-গাত্র সৌম্য-মূর্তি সভাপতি মশাই ডেপুটি-সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, 'আপনি ঠিকই আমাকে চিনেছেন, আমি বর্ধমানের সেই নটি-বয়।'—আমরা দেরি না-করে সবাইকে প্রিজন্ ভ্যানে পুরে লালবাজারে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।
নতুন আইনে সিমলা ব্যায়াম-সমিতি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ওরাই প্রথমে বারোয়ারির পরিবর্তে সর্বজনীন নামে দুর্গোৎসব করেন। ওদের সমিতিতে সর্বধর্মের লোক-গ্রহণে আপত্তি ছিল না। অথচ ভর্তির সময় হনুমানজির পূজা দেবার নিয়ম ছিল। আমরা ওদের প্রদর্শনী-ক্ষেত্র থেকে ব্রিটিশ-বিরোধী পুতুল-সহ বারবেল ডাম্বেল ও আসবাবপত্র তুলে এনে থানার সমুখে রাখলাম। বহুকাল ধরে বৃষ্টিতে ভিজে ওগুলো ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গিয়েছিল।
পরের দিন কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের দ্বিতলের একটি বিপণি হতে প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করে আনার হুকুম হ'ল। কিন্তু সেখানে গিয়ে অবাক হয়ে দেখি, অন্যদের সাথে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বসে রয়েছেন। মুন্সেফ চাকুরিতে মধ্যে মধ্যে ছেদ পড়লে তিনি ওখানে গিয়ে তাস খেলতেন ও বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতেন। শ্রদ্ধাস্পদ অচিন্ত্য বাবুর জন্যই আমি কর্তব্য সাধন না-করেই ওখান থেকে চলে এসেছিলাম।

কাজী নজরুল

প্রথম-রাত্রে রাউণ্ড পড়লে কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হ'ত। তিনি প্রায়ই গ্রামোফোন কোম্পানী হতে হেঁটে অত রাত্রে বাড়ি

ফিরতেন। চাঁদনি রাতে নয়া-রাস্তায় ফেলে-রাখা বিরাট পাইপগুলোর উপর বসে কিছুক্ষণ উভয়ে গল্প করতাম। আমার এক সহকর্মী তাঁর কন্যার সংগীত-শিক্ষকরূপে কাজী সাহেবকে রাজী করাবার জন্য আমাকে অনুরোধ করলেন। কাজী সাহেব রাজী হলেন। কিন্তু তাঁকে গোপনে পিছনের দরজা দিয়ে উপরে নিয়ে যেতে চাইলে তিনি রাজী না-হয়ে বলেছিলেন, 'আমি সর্বদা সদর রাস্তা দিয়ে হাঁটি। খিড়কির পথে আমার যাতায়াত নেই।' (সর্বসমক্ষে ওঁকে উপরে নিয়ে গেলে বিপদ হ'ত।)

এক সপ্তাহ পরে স্পেশাল ব্রাঞ্চ হতে মেসেজ এলো: এলাকার একটি বাড়ি ভোররাত্রে তল্লাসী হবে। গোয়েন্দা-পুলিশের রক্ষার্থে উর্দি-পরা পুলিশ যেন মজুত থাকে। গোয়েন্দা-কর্মীদের নির্দেশে কাজী নজরুলের বাড়িটি ঘেরাও করলাম। সুমুখের বাড়ির বারান্দা হতে জনৈকা বালিকাকে বলতে শুনলাম: 'ও দিদি, শাঁখ বাজাও। অতিথি এসেছে।' গোয়েন্দা-নেতা কাজী সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'ইনি বিখ্যাত বিপ্লবী-কবি কাজী নজরুল ইসলাম।' আমরা অবশ্য পরস্পরকে না-চেনার ভাব দেখিয়েছিলাম। প্রতিটি কক্ষের বাক্স ও শয্যা লণ্ডভণ্ড করে খোঁজা হ'ল। কিন্তু কোথাও একটি মাত্রও আপত্তিকর দ্রব্য বা পত্র পাওয়া গেল না।

হঠাৎ জনৈক অফিসর একটি তালাবদ্ধ পুরনো বাক্সের ডালা খুলতে চাইলেন। কাজী সাহেব তৎক্ষণাৎ শশব্যস্তে সেদিকে ছুটে গিয়ে বললেন, 'না-না-না।' অফিসররা তাতে সন্দিগ্ধ হয়ে ওই বাক্সটা ভেঙে উপুড় করলেন। কতকগুলি খেলনা, ছোট জামা ও অন্য দ্রব্য মেঝের উপর গড়িয়ে পড়লো। কাজী সাহেব তা দেখে আঁতকে উঠেছিলেন। তাঁর দুই চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল। আমরা সকলে অবাক। 'অগ্নিবীণা'র কবির চোখে আগুনের বদলে জল! ওইগুলি ছিল তাঁর মৃত-পুত্র বুলবুলের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি। তার মৃত্যুর পর এই প্রথম বাক্সটি খোলা হয়েছিল।

যামিনী রায়

এই উপলক্ষে অন্য একটি বিখ্যাত পুলিশী তল্লাসীর বিষয় উল্লেখ্য। পরবর্তীকালে আমি শ্যামপুকুর থানায় থাকার সময় সেটি ঘটেছিল। বাগবাজারে আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে এই রকম ভোররাত্রে গোয়েন্দা-পুলিশের সঙ্গে আমি একটি বাড়ি ঘেরাও করি। স্পেশাল ব্রাঞ্চের ইংরাজ ডেপুটি-কমিশনার স্বয়ং থানা-তল্লাসীতে উপস্থিত। সংবাদ: ওই বাড়িতে একজন মহাবিপ্লবী বাস করছেন। ভোররাত্রে নিচের

ঘরে আলো জ্বলতে দেখে ওরা বুঝলেন যে খবর ঠিকই পাওয়া গেছে। সকলে পিস্তল উঁচিয়ে হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকছিল, ইংরাজ ডেপুটি সাহেব বলে উঠলেন, 'আরে তোমরা এ কোথায় এসেছো ? এ যে একটা টেম্পেল (অর্থাৎ মন্দির।) ওপেন ইয়োর সু'স্ (জুতো খুলে প্রবেশ করো।)'

সমগ্র দেওয়ালে ও মেঝেতে অপূর্ব নকসা ও আলপনার কারুকাজ। বড়ো বড়ো জালা ও ঘটে এবং পিঁড়ির গায়ে লতাপাতা ফুল ও পাখি। বিচিত্র পদ্ধতিতে অংকিত দেবদেবীর মূর্তি ও ছবি থাকে-থাকে সাজানো। তাদের টানা-টানা চোখ, গোল-গোল মুখ। আর রঙের কী জৌলুস ! ডেপুটি-কমিশনার ওই মন্দিরের পুরোহিতের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। পুরোহিত-মন্য ব্যক্তিটি অত ভোরে চাদর-গায়ে নিবিষ্টচিত্তে ছবি আঁকছিলেন। প্রকৃত বিষয় প্রকাশ পেলে কমিশনার নিজেই বললেন, 'একেই বলে বেঙ্গল স্কুল অফ আর্টস।'

ডেপুটি সাহেব শিল্পরসিক ব্যক্তি। তিনি ওখান থেকে আর ফিরে আসতে চান না। অসংখ্য সুঅংকিত ছবি বাইরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। শিল্পী বললেন যে, 'একদিন মনে হ'ল ওগুলো ঠিক আঁকা হয় নি তাই বাইরে ফেলে দিয়েছি।' কিন্তু আমাদের চোখে ওগুলো অপূর্ব লেগেছিল। ডেপুটি সাহেব অফিসে ফিরে তাঁর প্রতিবেদনে লিখেছিলেন : 'হি ইজ এ রেভোলিউনিস্ট। বাট নট ইন আর্মস, হি ইজ সো ইন আর্টস।'—এই শ্রদ্ধেয় শিল্পী যামিনী রায়। তখন থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর আমি স্নেহধন্য ছিলাম।

[চারজন য়ুরোপীয় পণ্ডিত স্বাধীনতা-উত্তরকালে যামিনী রায়ের ঠিকানার খোঁজে কলিকাতা-কমিশনারের শরণাপন্ন হলে এক তরুণ দেশীয় ডেপুটি বলেছিলেন, 'আমাদের সর্বভারতীয় পরীক্ষায় প্রশ্ন ছিল, যামিনী রায় কে ? তিনি সিনেমা না থিয়েটারের আর্টিস্ট মনে করতে না-পেরে আমি শুধু লিখেছিলাম—আর্টিস্ট।'.. ডঃ বিনয় সরকারের নিকট শুনেছিলাম জনৈক পুলিশ-কর্মী তদন্তে এসে জানতে চেয়েছিলেন তিনি এ্যালাপ্যাথি না হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ?]

জোড়াসাঁকোয় প্রতিরাত্রে রাজনৈতিক তল্লাসী হচ্ছিল। কোনও এক প্রখ্যাত নেতা মাসিক প্রদেয় ৩০০্ টাকা গুনে নিতে-নিতে এক দেশীয় অফিসরকে উদ্দেশ করে বলতে শুনেছিলাম : 'দাদা-ভাই, একটু-একটু করে একস্পোজড হয়ে যাচ্ছি। আর দেরি না-করে কিছুদিন ঘুরিয়ে নিয়ে এসো।' পরদিন তাঁর বাড়ি তল্লাস করে, গদি ও বালিশ ছিঁড়ে, তাঁকে টেনে-হিঁচড়ে বার করে সর্বসমক্ষে আমরা গ্রেপ্তার করলাম। মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনি, লাজবর্ষণ ও বন্দেমাতরম ধ্বনির মধ্যে তিনি প্রিজন্-ভ্যানে উঠেছিলেন।

একদিন জনৈক নিম্নপদস্থ গোয়েন্দা-কর্মী পল্লীর এক নেতা কর্তৃক প্রহৃত হলে থানায় নালিশ জানালেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কর্মীটিকে ট্যাকৃটলেশ বলে প্রহার-কারীকে গ্রেপ্তার করতে মানা করেছিলেন। উক্ত নেতা সন্দেহ এড়াতে সর্বসমক্ষে বাহাদুরি নিয়েছিলেন। উনি পুলিশের চররূপে দলের লোককে গ্রেপ্তারে সাহায্য করে অর্থোপার্জন করতেন।

এই-সব নিম্নপদস্থ গোয়েন্দা-কর্মীদের জনগণ চিনে এবং সহকর্মীরা না-চিনে পীড়ন করেছেন। ফুটে দাঁড়িয়ে জানলার দিকে তাকাতে দেখলে তাদেরকে মস্তান ভাবা হয়েছে। কেউ বা নজর এড়াতে মূত্র ত্যাগের ছলে পথিপার্শ্বে বসলে টহলদারী সিপাহী তাকে রুলের গুঁতো দিয়ে থানায় এনেছে। পরদিন আদালতে জরিমানা দিলেও তাঁরা কিন্তু আত্মপরিচয় দেন নি। রোয়াকে উপবিষ্ট এক রুগ্ন বিপ্লবীর প্রতি নজর রেখে জনৈক গোয়েন্দা পানের দোকান থেকে পান ও চুন নিলেন তারপর কাশীর জর্দা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করে এদিক-ওদিক তাকিয়ে স্থানত্যাগ করলেন। ওই বিপ্লবী ফেরার থাকাকালে এক তরুণ গোয়েন্দা বন্ধু সেজে তাঁর স্ত্রীর সহিত ভাব জমানোয় উনি ক্রুদ্ধ। এই সময় একজন প্রকৃত নাগরিক তাঁকে একটি রাস্তার হদিস জিজ্ঞাসা করলে উনি খিঁচিয়ে উঠে বলেছিলেন, 'হারামজাদা! কতদিন তোর চাকরি হ'ল?' উভয়-পক্ষের গোপন-আহবে জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে বিপ্লবীদের প্রতিষ্ঠিত কোনো-কোনো আশ্রমে প্রবীণ পুলিশ-কর্মী না-জেনে গীতার ব্যাখ্যা শুনতে গিয়েছেন। ভগিনীর বিবাহের অলংকার-সহ এক বিপ্লবী গ্রামের নিরালা পথে বাড়ি ফিরছেন। তাঁর পিছু-পিছু অস্ত্রসহ ফ্রিগার্ড-রূপী গোয়েন্দাকে দেখে তিনি নিরাপত্তা বোধ করেছিলেন। বাড়ির নিকট এসে তিনি গোয়েন্দাটিকে সাদর নিমন্ত্রণ করে বলেছিলেন, 'মশায়, এত রাত্রে কোথায় যাবেন? আসুন, ভোজন করে ঘুমিয়ে কাল সকালেই বরং যাবেন। আমাদের বাড়ি তো আপনার দেখাই রইলো।'...তল্লাসীর জন্য বাড়ি ঘেরাও হলে কখনও-কখনও শিক্ষিত কুকুরের মুখে পিস্তলাদি গুঁজে নর্দমার বা গলির পথে বার করে দেওয়া হ'ত। তখন ওই কুকুর যথাকালে তাঁদের অন্য আড্ডায় দ্রব্যাদি পৌছে দিতো। পুলিশ-কর্মীদের মতো নেতাদেরও সশস্ত্র গার্ড ছিল।

জোড়াসাঁকো থানায় বহাল থাকাকালে গোয়েন্দা-পুলিশের একটি দক্ষতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। ঘটনাটি করুণ হলেও তাদের কৃতিত্ব আমি অস্বীকার করতে পারি নি। সেই ঘটনাটি সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'ল।

এক বিপ্লবী কিশোরকে স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশ জোড়াসাঁকো থানার হাজত ঘরে

পৃথক করে রেখেছিল। বহু অফিসর চেষ্টা করেও তার কাছ হতে স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারেন নি। তার সেই এককথা: রক্ত দিয়ে ভূর্জপত্রে প্রতিজ্ঞা লিপিবদ্ধ করে সে নিজেকে দেশমাতৃকার চরণে উৎসর্গ করেছে। তার জিহ্বা ছিঁড়ে নিলে বা চক্ষু তুলে নিলে কিংবা মস্তক চূর্ণ করলেও সে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না। এক অভিজ্ঞ প্রৌঢ় অফিসর তার পিতৃবন্ধু রূপে পরিচয় দিয়ে বললেন, 'বাবা, আমি পুলিশ-কর্মী হলেও তোমার পিতৃবন্ধু। খবরদার, কারো কাছে কোনও স্বীকারোক্তি কোরো না। এমন-কি আমার কাছেও বেফাঁস কিছু বোলো না।' পরদিন উনি তার পিতার সঙ্গে এক হাঁড়ি মিষ্টি নিয়ে দেখা করলেন। কিশোরটি বুঝতেও পারলো না যে ওইদিনই তার পিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। প্রত্যহই তিনি কাপড় বা মাথার তেল প্রভৃতি জিনিস এনে তাকে দিতেন। একদিন নিভৃতে ডেকে তিনি আঁতকে উঠে বলেছিলেন, 'বাবা, আমি আজ ফাইল দেখে অবাক। তোমাদের দলের বারোজনের মধ্যে তো 'আটজন তো আমাদের লোক।' বালকটি 'অসম্ভব' বলায় তিনি একটি নথি খুলে তাকে শোনাতে শুরু করেন: অমুখ তারিখে ভোর ছটার সময় তুমি অমুক দাদার তিনতলার ঘরে অর্গলবদ্ধ করে এই-এই দলনেতার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলে। তোমাদের মধ্যে কথাবার্তা পাকা হলে তুমি পত্র ও অস্ত্র অমুক দাদার কাছে পৌছে দাও এবং তিনি এই-এই কথা তোমাকে বলেন। ঠিক কিনা?…এভাবে ভদ্রলোক তার প্রতিদিনের প্রতিটি মুভমেণ্ট জানিয়ে দিলে সে কাঁপতে-কাঁপতে দলের সমস্ত সংবাদ তাঁকে বলে দেয়। রাত্রিকালে অনুতাপ আসায় বালকটি কাপড়ের খুঁট গলায় আর লকআপের শিকে বেঁধে আত্মহত্যা করেছিল।

কিছু কিশোরীও বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বাড়িতে যখন তল্লাসী করা হয় তখন পুলিশ-কর্মী ও তার সাক্ষীদের দেহতল্লাসে সেই বাড়ির লোকেদের আইনী অধিকার আছে। একদিন ইংরাজ-ডেপুটির নেতৃত্বে গৃহে প্রবেশ করলে এক বালিকা আমাদের বললে, 'পুরুষদের দেহ মেয়েরা তল্লাসে অক্ষম। অতএব মশাইরা, ওখানে সাতখানা গামছা আছে, পেণ্টুলন খুলে ওগুলো পরে ঘরে ঢুকুন।' এই-সব কথাবার্তার মধ্যে ওরা পিছনের দরজা দিয়ে মালপত্র পাচার করেছিল।

জনৈক ভদ্রলোক পুঁটলিতে বোমা বেঁধে হাওড়া স্টেশনে যাচ্ছেন খবর পেয়ে আমরা ওঁকে অনুসরণ করলাম। বাইরে থেকেই পুঁটলির ভিতরকার বোমার গোল-গোল আকার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। ভদ্রলোক থামলে আমরা থামি এবং তিনি চলা শুরু করলে আমরাও চলতে থাকি। ওদিকে টেলিফোন-যোগে সশস্ত্র

পুলিশকে পাঠাতে বলা হ'ল স্টেশনে। ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে পুঁটলিটি সজোরে আছাড় দিলেন, ভয়ে আমরা পূর্বশিক্ষামতো স্পিলিণ্টার এড়াতে প্ল্যাটফর্মে শুয়ে পড়লাম। পরে চোখ খুলে দেখি, না, আমরা কেহই আহত বা নিহত হই নি। ফুটি ও তরমুজের বড়ো-বড়ো কয়েকটা টুকরো শুধু চতুর্দিকে ছড়ানো। ওই ফলগুলি নষ্ট হওয়ায় ভদ্রলোক আমাদের কাছে মূল্যবাবদ দু-টাকা দাবি করেছিলেন।

অহেতুক ভীতি ও সন্দেহ অন্য ক্ষেত্রেও গোয়েন্দা-কর্মীদের বিব্রত করেছে। এঁরা কখনও এক পথ দিয়ে যাতায়াত করতেন না। মধ্যে-মধ্যে থমকে থেমে দাঁড়িয়ে পড়তেন। পিছনের পথিক সুমুখে এগোলে তবে তাঁরা চলা শুরু করতেন। আত্মীয়দের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করাও তাঁদের পক্ষে সম্ভব হ'ত না। একরাত্রে অন্ধকার ফুটপাতে চলতে-চলতে এক-ভদ্রলোক থেমে দাঁড়িয়ে মুখে মোটা পাইপ গুঁজে অগ্নিসংযোগ করতে যাচ্ছিলেন, তাই দেখে তাঁর গোয়েন্দা-শ্যালক পিস্তল উঁচিয়ে টিপ করেছিলেন। দেশলাইয়ের কাঠি ঠিক-সময়ে জ্বলে উঠে মুখ আলোকিত না-করলে ভগিনীপতি হত্যার জন্য ওই ভদ্রলোক দায়ী হতেন।

[কিন্তু ওই মৃত্যুঞ্জয়ী সর্বত্যাগী তরুণ-দলের অধিকাংশই যৌবনের প্রগাঢ় ভাবধারা প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে পারেন নি। পরবর্তীকালে তাঁদের কেউ-কেউ সাধারণ ডাকাত ও প্রবঞ্চকের মতো হয়ে উঠেছিলেন। সর্বস্বত্যাগের ব্যর্থতা কারো মধ্যে উন্মাদনা এনেছিল। কেউ-কেউ পার্টির সম্পদ তছরুপ করে অন্য সদস্য দ্বারা নিহত হয়েছেন, কেউ-বা সেই অর্থদ্বারা ব্যবসা ফেঁদে ধনী হয়ে জীবন সার্থক করেছেন। অনেকেই অবশ্য আদর্শ-নিষ্ঠ হয়ে পরবর্তী জীবনে দারিদ্র্য বরণ করে নিয়েছেন সন্তুষ্টচিত্তে। এঁদের কার্যকলাপ গোপনে সমাধা হওয়ায় সেই স্বার্থত্যাগ ও আদর্শনিষ্ঠার কোনও সংবাদই জনগণ বিশেষ জানতে পারেন নি।]

১৯৩৩ খ্রীঃ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে ফেরারী বিপ্লবীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষকালে আমি উপস্থিত থাকলেও এই অসম-সংগ্রামে আমি কোনও অংশগ্রহণ করি নি। বিপ্লবীদের মরদেহ জোড়াসাঁকো এলাকার পুলিশ-মর্গে রক্ষিত হ'ত। গভীর রাত্রে আমি ওঁদের মরদেহ সেণ্ট্রাল এভিনিউ ও বিডন স্ট্রীট ধরে নিমতলা ঘাটে পৌছে দিয়েছি। শবানুগামী তরুণদের পুলিশ-সম্পর্কিত উক্তিগুলি আমার কানে পৌছতো। এর আগে কোনও কটুক্তি আমার এতো ভালো লাগে নি।

কলকাতায় বহুকাল জুড়িগাড়ির প্রচলন ছিল। খপ খপ শব্দে এগুলো অশ্বদ্বয়ের সুমুখে একব্যক্তি ছুটতো ও চেঁচাতো : 'তফাৎ যাও! তফাৎ যাও!' এগুলির মধ্যে বনেদী বাড়ির একটি উল্লেখ্য ঐতিহ্য নিহিত ছিল।

কোনও এক বনেদী ধনীর বাড়িতে কেউ পায়ে হেঁটে এলে কোনও ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা তাঁর উপস্থিতি ঘোষিত হ'ত না। এক ঘোড়ার গাড়িতে কেউ এলে পেটা-ঘড়িতে একটি মাত্র ঘণ্টা পড়তো। সেই সংকেতে বাড়ির কর্তামশাই অভ্যর্থনার জন্য কেবল প্রস্তুত হতেন। দুই ঘোড়ার গাড়ি হলে দুটি ঘণ্টা এবং কর্তামশাই সিঁড়ি পর্যন্ত নেমে আসতেন। চার ঘোড়ার গাড়ি চড়ে কেউ এলে তিনটি ঘণ্টা এবং কর্তামশাই নিচে পর্যন্ত নামতেন।

কিছু ধনীব্যক্তির নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন শেষ সীমায় পৌছোয়। পূর্ব-পুরুষদের ব্যবসা-বাণিজ্য বহুকাল পরিত্যক্ত। তাঁদের উপার্জিত-বিপুল ধনরাশি উত্তরপুরুষেরা পাল্লা দিয়ে নিঃশেষ করতে চাইছিলেন। কোনও পরিবারের রক্ষিতার সংখ্যানুযায়ী তাঁদের মর্যাদার বিচার করা হয়েছে। তবে মন্দের ভালো এই-যে রক্ষিতাদেরও তাঁরা বাড়ি ও অর্থ দিতেন, তাদের পুত্র-কন্যাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। বিবাহিত স্ত্রীদের গর্ভজাত পুত্রগণ অপেক্ষা রক্ষিতাদের পুত্রেরা বহুগুণে সুশিক্ষিত ছিল। সেই-সব পুত্রদের মধ্যে বহুজনই নামী ও গুণীব্যক্তি হয়ে মূল সমাজে মিশে গিয়েছেন। বিধবা ও পরিত্যক্তদের আশ্রয় না-দিলে তারা বেশ্যা-সম্প্রদায়ভুক্ত হতে বাধ্য হ'ত। রক্ষিতা ও স্ত্রীদের মধ্যে পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ হলেও, এক বাড়ি হতে অন্য বাড়িতে তত্ত্বাদি ও উপহার পাঠানোর রীতি ছিল। এতে পুরুষদের মন সুস্থ ও আনন্দিত থাকায় তাঁরা যেমন দীর্ঘজীবী ও দক্ষ কর্মী হয়েছেন তেমনি উদার-মনা স্ত্রীগণকেও বেশি করে সুখী করেছেন। এঁদের সন্তানদের মধ্যে সেই একনিষ্ঠতা ও সমদর্শিতা না-থাকায় বে-দরদী নারীদের দ্বারা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন। শুধু অর্থদ্বারা প্রেম ও শান্তি মেলে না। এঁদের ক্রমিক অধঃপতনের ইতিহাস 'অপরাধ-বিজ্ঞানে' যৌনজ অপরাধ শীর্ষক নিবন্ধে বিবৃত করেছি। পরবর্তীকালে এঁদের বৃহৎ বাড়িগুলিতে নওসেরা-গ্যাঙের আড্ডা হয়।

[একালে ভদ্রনারীদের অত্যন্ত সম্মান করা হ'ত। ট্রামে বা বাসে মহিলারা উঠলে তাঁদের না-বসা পর্যন্ত পুরুষ-যাত্রীরা দাঁড়িয়ে থাকতেন। মহিলাদের জন্য আসন ছাড়তে ভদ্রজন মাত্রই ব্যগ্র হতেন।]

এই জোড়াসাঁকো থানা-বাড়িটিকে অভিশপ্ত মনে করা হ'ত। এখানে দুজন অফিসরের স্ত্রীবিয়োগ হবেই। জনপ্রবাদ : বহুপূর্বে এক দুঁদে ইনচার্জ এক দুর্ধর্ষ বিপুল-বপু গুণ্ডাকে সিঁড়ির নিচে পেড়ে ফেলে তার ভুঁড়ির উপর নাচতে শুরু করেন। তাতে যাবতীয় নাড়িভুঁড়ি গুহ্যপথে বার হলে তার মৃত্যু ঘটে। ইংরাজ ডেপুটি-কমিশনার বড়োবাবুকে খুনের মামলায় গ্রেপ্তার করতে এসে দেখেন যে

তিনি কোয়ার্টারে হার্টফেল করে মারা গেছেন। তারপরও, গভীর রাত্রে সিঁড়ির নিচে উভয়ে মারামারি ও দাপাদাপি করে থাকে। ওই সিঁড়িটা অফিসর ও সিপাহীরা রাত্রিবেলা ব্যবহার করে না।

নয়া-রাস্তার মোড়ে এক জবরদস্ত জমাদারকে ঘোড়ায় গুঁতিয়ে হত্যা করে। মৃত্যুর পরও, ওই জমাদার রাত্রে কোনও সিপাহী ঘুমালে তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। মৃত জমাদারের অদৃশ্য তদারকির ভয়ে কোনো সিপাহী ডিউটিতে ত্রুটি ঘটাতো না। অবশ্য এর প্রত্যেকটি ছিল ওদের অলীক কল্পনা মাত্র।

[পূর্বে এক দুঁদে অফিসর পুরাতন পাপীদের হাজত হতে বার করে দেহ মর্দন করাতেন। ঘুমের আমেজে তিনি চক্ষু মুদ্রিত করেছেন, সেই সুযোগে একজন আসামী পালালো। উনি কাগজে পত্রে তার মামলা ব্যারাকপুর কোর্টে ট্রানস্ফার করে, অন্যজনকে পলায়নে-প্রতিরোধ না-করার অপরাধে ঘুষি মারলেন। আচমকা ঘুষি খেয়ে লোকটা মাটিতে পড়লো এবং হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় মারা গেল। ইনচার্জবাবু তাতে না-ঘাবড়ে তাকে হাতকড়ি পরিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে তুলে তদন্তে বেরুলেন। হাওড়ার পোল বন্ধ থাকায় তিনি তাকে নৌকাতেও তুলেছিলেন। পরে থানায় ফিরে তার লাফ দিয়ে ডুব সাঁতারে পালাবার একটা প্রতিবেদন পর্যন্ত লেখেন। কিন্তু ওই মৃত আসামী মাঝে মাঝে রাত্রে থানায় এসে বড়োবাবুকে খোঁজে। তাই সর্বদা প্রতি ঘরে দুটো করে লাইট জ্বালিয়ে রাখার রীতি।]

কোনও এক প্রৌঢ় পুলিশ-কর্মী কয়েদীদের ডেকে উপরে নিজেদের কোয়ার্টারে ঠাকুর-ঘরের সামনে এনে বলতেন, 'ওই আমাদের লক্ষ্মী-মা আর ওই যে নারায়ণ, এঁদের দুজনকে স্পর্শ করে বলছি, তোরা স্বীকার করে জিনিসগুলো বার করলে তোদের মুক্তি দেবো।' কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাই প্রতিবার তিনি করতেন। সেই-সব পাপ থানা-বাড়ির ইঁটের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জমা ছিল।

এইরূপ বহুবিধ প্রবাদ-যুক্ত থানা-বাড়ি থেকে মুক্ত হতে অফিসররা ব্যস্ত হয়। তাঁদের স্ত্রীরা হিস্টিরিয়া-রোগে ভুগেছে। কারো-কারো দুরারোগ্য রোগভোগ বা মৃত্যু ঘটেছে। বড়োবাবু সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জি এ-সবে বিশ্বাস না-করলেও সঙ্গে দুজন সিপাহীকে মোতায়েন রাখতেন। কিছুদিন পরে তাঁর স্ত্রী হঠাৎ রুগ্ন হয়ে থানার কোয়ার্টারেই দেহত্যাগ করলেন। তার একমাস পরে সেকেণ্ড-অফিসর রহমন সাহেবের নব-পরিণীতা স্ত্রী জুবেদা বিবিও দেহরক্ষা করলেন।

[এরূপ অঘটন বন্ধের জন্য থানার মধ্যে মিলাদ শরীফ ও সত্যনারায়ণের পূজার রীতি ছিল। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তা বন্ধ করা হয়।]

আমরা কোয়ার্টারগুলির অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার বিষয় বিবেচনা না-করে শুধু প্রবাদ-

গুলির উপরই বিশ্বাস স্থাপন করলাম। সুজনের স্ত্রী-বিয়োগের পরই থানা হতে যথারীতি বদলির হিড়িক পড়ে। এবারও সেই পঞ্চবার্ষিক ইতিহাসের পুনরুক্তি ঘটলো। বহু স্মৃতিবিজড়িত জোড়াসাঁকো থানা ত্যাগ করে আমরা অন্যত্র বদলি হলাম। সত্যেন্দ্র মুখার্জি লালবাজারে গোয়েন্দা-বিভাগে এবং আমি শ্যামপুকুর থানায় যোগ দিলাম।

সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জি

তাঁর মতো সুদক্ষ পুলিশ-কর্মী শুধু ভারতে নয় পৃথিবীতে বিরল। শিকারী বিড়ালের মতো তিনি লহমায় অপরাধী চিনতেন। আমার সৌভাগ্য এই-যে আমার পুলিশী-শিক্ষা তাঁর নিকট পাই। ফলে, ইংলণ্ড ও মার্কিন দেশে প্রকাশিত পৃথিবীর উল্লেখ্য পুলিশী তদন্ত-পুস্তকে সাতটি ভারতীয় মামলার মধ্যে আমার তদন্ত-কৃত তিনটি মামলার স্থান পেয়েছে। তিনি অবসরগ্রহণ করলে তাঁর স্থলে আমি ডেপুটি পুলিশ-কমিশনার (I. P. S.) হই।

রায়বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জি কোচোয়া-ধোলাই ও সত্যেন-মিক্সচারের প্রবর্তক। প্রথমটির দ্বারা শহরের গুণ্ডারা বিলুপ্ত হয়েছিল। আর দ্বিতীয়টির দ্বারা স্কুলগামিনী বালিকাদের পশ্চাৎ-অনুসরণকারী মস্তানগণ নিশ্চিহ্ন হয়। তাঁর ভয়ে উৎকোচ-গ্রহণ-কারী ও অন্যায়কারী উর্ধ্বতনরা-ও সংযত হতেন। (অশ্ব বিষ্ঠা + গোময় = সত্যেন-মিক্সচার।)

কলিকাতা-পুলিশের মধ্যে বর্ণ-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে তিনি এবং তাঁর সহকারীরূপে আমি প্রথম প্রতিবাদ করি। ইংরাজ-অফিসর ও অ্যাংলো-সার্জেন্টদের ক্লাবে ভারতীয়দের প্রবেশ ছিল না। পুলিশ-অ্যাম্বুলেন্সেও দেশীয়দের উপযুক্ত মর্যাদা নেই। ভারতীয় ও ইংরাজদের বাথরুম ও ল্যাভেটরি পর্যন্ত পৃথক। ওদের সুযোগ-সুবিধাও বহু বিষয়ে বেশি।

আমরা উভয়ে একত্রে এগুলির প্রতিকারে সতর্কতার সঙ্গে নামি। আমাদের প্রচেষ্টায় পৃথক পুলিশ-ক্লাব সৃষ্টি হ'ল। তার অনুসঙ্গ হিসাবে ফুটবল-ক্লাব এবং পুলিশ-লাইব্রেরিও স্থাপিত হ'ল। কলিকাতাবাসী প্রায় প্রতিজন লেখক এই লাইব্রেরিতে পুস্তক-দান করেন। লাইব্রেরিটি আমার প্রচেষ্টায় সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠেছিল। আমরা পৃথক অ্যাম্বুলেন্স-ডিভিসনও তৈরি করলাম। পরে আমি তার কোর-সুপারিনটেনডেণ্ড হয়েছিলাম। সত্যেন্দ্রবাবু বাহিরের মহিলাদের সাহায্যে কর্মীদের অভিনয়ের প্রবর্তক। আমি 'কলিকাতা-পুলিশ জার্নাল' প্রকাশ করে

তার সম্পাদক হয়েছিলাম। (এটি ভারতে প্রথমপুলিশ-পত্রিকা।) এই পত্রিকায় স্তর যদুনাথ সরকার, ডঃ সত্য লাহা ডঃ নুরেন লাহা, ডঃ বিমল লাহা, ডঃ সুধীর মিত্র, ডঃ হরিপদ মাইতি, ডঃ অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সহ ভারতের ও পৃথিবীর বহু মনীষী প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথকেও আমরা লেখার জন্য অনুরোধ করি ও বলি : 'বাংলা-সাহিত্যে পুলিশ হরিজন হয়ে আছে। আপনার পূত-কলমের স্পর্শে তারা উদ্দীপিত হোক। আপনার কাছে তাদের জন্য স্পেশাল ফেবার চাই।' উনি লেখা দিতে না-পারলেও একটি উপদেশপূর্ণ পত্র পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেই পত্রে পুলিশের প্রতি এমন-কিছু উপদেশ ছিল যা তৎকালীন ইংরাজ-প্রভুরা মুদ্রণ করতে দিলেন না।

এরপর আমরা উভয়ে কলিকাতা-পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের সৃষ্টি করলাম। এতে অ্যাজিটেটররূপে উভয়ের কিছু বদনাম হলেও বহু ন্যায্য দাবি আদায় করা হয়। পরবর্তীকালে আমি তার অন্যতম প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলাম। এতদ্‌সত্ত্বেও আমি 'পুলিশ-মেডেল', 'সেবা-মেডেল' প্রভৃতি বহু পদকে ভূষিত হই এবং দ্রুতগতিতে পর-পর প্রমোশন পেতে থাকি। ইংরাজ-কর্তৃপক্ষের এই বিষয়ে উদারতা ও সহনশীলতা লক্ষণীয়। রায়বাহাদুর সত্যেনবাবুও সরকার-প্রদত্ত প্রতিটি ডেকরেশন প্রাপ্ত হয়ে সর্বোচ্চ পদে ওঠেন।

বাংলা-পুলিশ থেকেও একটি বেঙ্গল পুলিশ ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছিল। পরে, গভর্নমেণ্টের নির্দেশে উভয় পুলিশের পত্রিকা একত্রিত করে 'দি পুলিশ জার্নাল' বার হলে বাংলা-পুলিশের পক্ষে অমূল্য সমাদ্দার এবং কলিকাতা-পুলিশের পক্ষে আমাকে তার সম্পাদক করা হয়।

[স্বাধীনতার পর, ভারত-সরকারের কলিকাতাস্থ ডিটেকটিভ ট্রেনিং-কলেজে ও ফোরেনসিক ল্যাবরেটরিতে আমি ভারতের প্রথম ক্রাইম-মিউজিয়ম স্থাপন করি। আমার দীর্ঘকাল যাবৎ সংগৃহীত প্রদর্শনী-সম্ভার দ্বারা মিউজিয়মটি সজ্জিত করা হয়েছিল। পরে আমি মাউণ্ট আবু কেন্দ্রিয় পুলিশ-ট্রেনিং কলেজে এবং ব্যারাকপুরস্থ প্রদেশ-পুলিশের কলেজেও সেই সম্ভার পাঠিয়েছিলাম। গড়ের মাঠে পুলিশ-প্রদর্শনীতেও বহুবার এই দ্রব্যগুলি প্রদর্শিত হয়েছিল।]

রায়বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জির একজন ধর্মপ্রাণ আর্দালী ছিল। মাথার টিকিতে গিঁট বেঁধে, কপালে চন্দন লেপে সে পূজাকর্মে ব্যস্ত থাকতো। তাকে কোনও দিন পুলিশের ডিউটি দেওয়া হয় নি। প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করে ফেরার সময় সে একজন পকেটমারকে নামাবলীতে এবং দুজন ছিনতাইকারীকে কাপড়ের খুঁটে বেঁধে থানায় আনতো। এই লোকটির পুরানো পাপীদের চিনবার ক্ষমতা ছিল

অদ্ভুত। অনবরত মুখে সীতারাম-সীতারাম বলে সে ওদেরকে ধরে থানায় আনতো।

[বিঃ দ্রঃ—কিছু ধর্মপ্রাণ ইনস্পেক্টরও কলিকাতা-পুলিশে ছিল। অফিসে বসার পূর্বে জনৈক ইনচার্জবাবুর এক সিপাহী গঙ্গাজলের ঘটি হাতে অপেক্ষা করতো। ইনচার্জবাবু চেয়ারে ও টেবিলে গঙ্গোদক ছিটিয়ে আসন গ্রহণ করতেন। ডিস-পোজাল তথা মড়ার গতির কাগজে সই করতে হলে তিনি দুবার স্নান করতেন। প্রতি সন্ধ্যায় একজন মুস্লিম সিপাহী আমজাদিয়া হোটেল থেকে তাঁর জন্য মটন-চপ আনতো। সেটি ভক্ষণ করে গঙ্গাজলে শুদ্ধ হয়ে তিনি সান্ধ্যস্নান করতেন। ওই সিপাহীটি ছুটি নিলে পরবর্তী জন ভুল করে তাঁর জন্য বিফ-চপ আনতে থাকে। থানার হাবিলদার তা একদিন লক্ষ্য করে ধমকে বললে, 'আরে এ ক্যা করতা? তুহর নোকরি যাবে।'—ওই নতুন লোকটি ভুল শুধরে পূর্বের মতো মাটন-চপ নিয়ে এলে ইনচার্জবাবু চিৎকার করে বললেন, 'কাহে খারাপ চীজ লে আতা? তুম কভি আমজাদিয়া-মে গয়া নেহী।'…পরে অন্য এক সিপাহী সেই একই মাটন-চপ এনে দিলে তিনি সখেদে বলেন, 'নাঃ। আমজাদিয়া আর ভালো-জিনিস তৈরি করে না।']

ওই রকম ব্যক্তিগত কাজে সরকারী কর্মীনিয়োগ এবং সিপাহীদের আর্দালীরূপে ব্যবহার পরে আমি ও সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জি বন্ধ করে দিই। ওদের দ্বারা বাজার-করানো বা ছেলে-ধরানো কাজ করালে ওরা নির্ভয়ে উৎকোচগ্রাহী হ'ত। এমন কি উৎকোচগ্রাহীদের নিকট হতে তারা উৎকোচের ভাগ জোর করে নিতো। অন্তঃপুরের সঙ্গে যোগ থাকায় অফিসররা স্ত্রীদের ভয়ে ওদের কিছু বলতে সাহসী হতেন না।

জোড়াসাঁকো থানায় থাকাকালে পার্শ্ববর্তী সুকিয়া থানার বড়োবাবু কিছুদিন ছুটি নিলেন। তাঁর কাজ আমি করতাম প্রত্যহ জোড়াসাঁকো থেকে সুকিয়া থানায় গিয়ে। হঠাৎ একদিন ইংরাজ ডেপুটির আর্দালী ফোন করলো: 'তুম কাহে নেহি মুর্গি ভেজা?'…আমি রেগে প্রতিবাদ করে তাকে কটূক্তি করেছিলাম। একটু পরেই ডেপুটি-কমিশনার স্বয়ং থানায় উপস্থিত হয়ে আমাকে সেখানে দেখেঅবাক হয়ে বললেন, 'ওঃ তুমি! মমতাজ মিয়া ছুটিতে বটে। আমার আর্দালীকে তুমি কিছু বলেছো?' উত্তরে আমি বললাম যে ওর মুর্গির কথা কিছুই বুঝিনি।… শুনলাম, থানা হতে প্রত্যহ ওঁর কিচেনে একটি করে মুর্গি পাঠানো হ'ত। ডেপুটি-সাহেব স্থানত্যাগ করলে আমি থানার হাবিলদারকে হুকুম দিলাম: 'দেখো ভাই, বাজার-সে এক মুর্গি ভেজকে সাহেব-সে দাম লে লেও।' হাবিলদার আমার

ধৃষ্টতায় বিস্মিত হয়ে বললে, 'দাম দেগা তো উনে হী কোহিকো ভেজকে বাজারসে লে-লেতা। দাম-উম সব-কুছ আপ-হি কো দেনে পড়ে গা, বাবুসাব।'
মমতাজ মিয়া-সাহেব থানার প্রাঙ্গণে খোঁয়াড় করে কিছু লেগহর্ন মুর্গি পুষে-ছিলেন। বিদেশ হতে-আনা এই মুর্গিগুলির দাম সাধারণ মুর্গির চেয়ে অনেক বেশি। আমি ওগুলি হতে একটিকে তুলে সাহেবের কিচেনে পাঠিয়ে দিলাম। পরদিন পূর্বতন ইনচার্জের বিবি তা জেনে খোঁয়াড়ে চাবি দিলেন। আমার হুকুমে জনৈক সিপাহী রাত্রে বেড়া-টপকে অন্য একটিকে ধরে সাহেবকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। স্ত্রীর টেলিগ্রাম পেয়ে মমতাজ-সাহেব ফিরে এসে আমাকে বললেন, 'ঘুযুলবাবু, এ আপ ক্যা কিয়া? মেরি লেড়কা-লোককো জবাহ হুয়া।' আমি দুঃখিত হয়ে বললাম, 'জানি এরা লেড়কার মতো প্রাণের জীব। কিন্তু থানার চার্জ বুঝিয়ে দেবার সময় মুর্গির চার্জ বুঝিয়ে দেন নি কেন? মুর্গি কেনার মতো আমার অর্থ ছিল না।'
পরদিন পূর্বের মতো ছোট দেশী মুর্গি দেখে ইংরাজ ডেপুটি-সাহেব অগ্নিমূর্তি হয়ে মমতাজ মিয়া-কে ডেকে বললেন, 'নয়াবাবু অনেস্টম্যান হো-কে আচ্ছি স্টাফ ভেজনে শেখা। তুম ঘুষ খাতা তভি ওইসেন আচ্ছি চিজ নেহি ভেজা।' মমতাজ সাহেব কেঁউ কেঁউ করে অনুযোগ করে ফিরে এসে আমাকে বলেছিলেন, 'ঘুষুল-বাবু আপ মেরি সত্যনাশ কর্ চুকা।'
[এই সময় চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট পামার সাহেব পেশকারদের ঘুষ বন্ধ করতে সাইনবোর্ড টাঙিয়েছিলেন: 'অদ্য হইতে পেশকারদের আট আনা পয়সা ঘুষ দেওয়া চলিবে না।' পরদিন পেশকারবাবু মক্কেলদের ডেকে বুঝিয়ে বলে দিলেন: 'উহুঁ এখন থেকে আট আনার বদলে একটাকা। ওই দেখুন হাকিমের হুকুম। এখন রেট বেড়ে একটাকা হয়েছে।']
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই-যে পেশকারবাবুদের উৎকোচ গ্রহণ হাকিমদের নাকের ডগায় সমাধা হ'ত। বহু হাকিম অবসর গ্রহণ করে তাঁদেরই পেশাকারদের তৈরি বাড়িতে ভাড়াটিয়া হয়ে থেকেছেন।···হঠাৎ পেশকারের হাত থেকে একটি টাকা টঙ করে মেঝেতে পড়লে হাকিম ধমকে বলেছেন: 'কি হচ্ছে মশাই?' পেশকারবাবু 'কাগজ গুছাচ্ছি' বললে হাকিম আবার বলেছেন: 'মশাই, ভালো করে গুছান।'
থানার স্বল্পলোভী সিপাহী ও জমাদারদের রেট যথাক্রমে আট আনা ও একটাকা এবং সার্জেন্টদের পাঁচটাকা। এর কমে কেউ তাদের হাতে কিছু দিলে তারা অপমানিত বোধ করে তার নামে উৎকোচ-প্রদানের মামলা রুজু করতো।

শোনা গেছে, বহু বিট-কনস্টেবল গাড়োয়ানদের উদ্দেশ্যে বলেছে : 'এ গাড়োয়ান, একপাশ-মে সাদা বয়েল আউর একপাশ-মে কালা বয়েল না চলি।'

একরাত্রে জনৈক ডেপুটি-হাকিম এবং তার মুন্সেফ-বন্ধু ছুটিতে স্টেশন থেকে রিকশা করে বাড়ি ফিরছিলেন। জনৈক ডিউটি-সিপাহী রিকশাওয়ালাকে ডেকে বললে, 'এ গাড়িমে যাতা কোন?' এতে হাকিমবাবু ক্ষেপে উঠে সিপাহী-মহারাজকে ধমক দিয়েছিলেন। ভদ্রলোক বুঝে সিপাহী কিছুটা পিছু হটেছিল। কিন্তু তাঁর গালি না-থামায় সে-ও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঁদের দুজনকে রিকশা হতে নিচে নামিয়ে, দুজনের হাত রিকশা-চালকের গামছা দিয়ে বেঁধে, রদ্দা হাঁকাতে-হাঁকাতে থানায় আনলো। সেইরাত্রে থানায় আমি উপস্থিত ছিলাম। সিপাহীটি ওঁদের দুজনকে আমার সমুখে এনে একটা অদ্ভুত বয়ান দিয়েছিল :

'হম নয়া রাস্তা-মে দো ঘড়িসে চার ঘড়িতক্ ডিউটিল থা। রাত আড়াই বাজে আন্দাজ এহি দো পুরানো চোর উত্তর-সে দক্ষিণ-তরফ যাতি থি। হমকো দেখকে ১নং আসামী (ডেপুটি হাকিম) ঝপটসে লপট গয়া ফুটকো পর, যাঁহা কাঙালিলোক শুয়ে থে উনকো বিচমে। আউর দোনং আসামী (মুন্সেফবাবু) এহি গামছা-মে মুখ ছিপাকে গ্যাসকো অন্দর ঘুস গয়া। ওহি গামছা-সে দুনোকো পকড়কে তুরণ বাঁধ চুকা। নেহিতো রাতোমে এলাকামে এক বড়িয়া চুরিউরি হো যাতা থি।'

পরে এই সংশ্লিষ্ট উচ্চপদস্থ কর্মিগণও বিপদে পড়েছিলেন। কারণ, গভর্নমেণ্ট ওদের ট্যাকসির বদলে রিকশা ব্যবহার করায় অত্যন্ত বিরূপ হয়েছিলেন। [কোনও এক সিভিলিয়ন-সাহিত্যিক (I. C. S) অন্য কজন বন্ধু-লেখকের সঙ্গে চিনেবাদাম খেতে-খেতে দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রামে উঠলে আমরা গভর্নমেণ্টে রিপোর্ট পাঠাই। তাতে ভদ্রলোক চাকুরি-জীবনে আর একটুও সুবিধা করতে পারেন নি। এ সময়ে পদমর্যাদা-অনুযায়ী যানবাহন ব্যবহারে উচ্চপদস্থদের বাধ্য করা হ'ত।]

জনৈক ইংরাজ ডেপুটি-কমিশনার রাত্রে একজন সিপাহীকে পানের দোকানের সুমুখের বেঞ্চে পাগড়ি ও বেল্‌ট খুলে ঢুলতে দেখে মোটর থেকে নেমে সেগুলি তুলে গাড়িতে উঠলে, পান-বিক্রেতা সিপাহীটিকে জাগিয়ে দিয়েছিল। সিপাহী মোটরের নম্বরটি টুকে নেয়। তারপর সে উর্দিতে কাদা মাখিয়ে, জামার পকেট ছিঁড়ে, থানায় এসে এজাহার দিলো যে এক মাতোয়ালা-সাহেব তাকে মেরে মাটিতে ফেলে জামা ছিঁড়ে তার কোমরের বেল্‌ট ও মাথার পাগড়ি ছিনিয়ে মোটরযোগে পালিয়েছে। আমি কোনোমতে তার মোটরের নম্বর টুকে নিয়েছি।...

তদন্তের সময় তার বিবৃতির সমর্থনে একজন মুটে একজন পানওয়ালা ও দুজন ভুজাওয়ালাকে সাক্ষীরূপে পাওয়া গেল। থানায় মোটরের আরোহী সেই সাহেবের নামে হুলিয়া-সমেত পাগড়ি চুরি, রাহাজানি ও পুলিশ-কর্মীকে প্রহার প্রভৃতি অভিযোগও লিপিবদ্ধ হ'ল। পরদিন রিপোর্টরুমে ডেপুটি সাহেব মামলার বিবরণ ও সাক্ষীসাবুত শুনে অবাক হয়ে বলেছিলেন যে বিলাতে ছাত্রাবস্থায় ইণ্ডিয়ান পুলিশ সম্বন্ধে বহু বিরূপ মন্তব্য শুনেছিলেন বটে কিন্তু সেগুলি যে এত-দূর নির্মম সত্য তা তিনি কখনো কল্পনাও করেন নি।

অ্যাসিসটেণ্ট কমিশনার প্রভাতনাথ মুখার্জির নেতৃত্বে সত্যেনবাবু, আমিও নীহার এই-সব অনাচার ও উৎপীড়ন বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলাম। ফলে উত্তর-কলকাতা হতে উৎকোচ, জুয়া ও কোকেন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। জনসংযোগের ফলে ওগুলির প্রতিটি সংবাদ আমাদের গোচরে এসেছে। এক থানার কর্মীরা অন্য থানা-এলাকায় মুফতিতে ঘুরে সিপাহীদেরও উৎকোচগ্রহণ বন্ধ করেছিল।

তবে ভদ্র-মদ্যপদের প্রতি আমাদের ব্যবহার খারাপ ছিল না। ওইকালে উত্তর-কলকাতায় ৭৯২ জন ভদ্র-মাতাল ছিল। এরা উচ্চাঙ্গের কথা বলতো ও ব্যবহারেও খুব অশিষ্ট হ'ত না। আমরা এদের সাবধানে তুলে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছি। তখন লক্ষ্য করেছি যে ওদের প্রত্যেকের স্ত্রী সুন্দরী ও ভক্তিমতী। স্বামীদের জন্য ওই-সব সেবাপরায়ণা স্ত্রীদের ভাবনার অন্ত নেই। এতটা স্ত্রী-ভাগ্য অ-মদ্যপদের মধ্যে বড়ো-একটা দেখি নি। তৎকালে প্রবাদ এই-যে মাতালের স্ত্রীরা এবং পুলিশ-কর্মীদের মায়েরা অত্যন্ত সৎ ও স্নেহপ্রবণ হতেন।

একজন মদ্যপ-অভিনেতাকে রাজপথে চ্যালেঞ্জ করলে তিনি বলেছিলেন: 'খবরদার! হম আলমগীর হ্যায়।' অন্য এক অভিনেতা রিকশাচালককে দশটাকা দিয়ে তাকে ওই রিকশায় বসিয়ে নিজে গাড়ি টেনে এক পেট্রোল-পাম্পে এসে বলেছিলেন: 'এই গাড়িতে পেট্রোল দাও। ইঞ্জিন ভালো স্টার্ট নিচ্ছে না। গাড়ি বড্ডো টলছে।'...এক নবীন অভিনেতা ধাত্রীপান্না নাটকে অভিনয় করে স্টেজ হতে নেমে এক ব্যক্তির জামার কলার চেপে ছুরি উঁচিয়ে বলে উঠেছিল: 'এই শালা! বল্, উদয় কোথায়?'

একরাত্রে পুরু বনাতের ওভারকোট পরে দীর্ঘদেহ সোজা করে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছি। সেই শীতকালে হঠাৎ হাতের মুঠিতে শীকর-কণার স্পর্শে ফিরে তাকিয়ে দেখি যে এক মদ্যপ আমার পিছনে মূত্রত্যাগ করছে। আমি ক্ষেপে উঠে তাকে ভর্ৎসনা করলে সে-ও অবাক হয়ে বলে উঠলো, 'ও বাবা, তুমি মানুষ, আমি মনে করেছিলাম ল্যাম্পপোস্ট।'...কোনও এক সুসাহিত্যিক পাত্রের সবটুকু পানীয়

গলায় ঢেলে বন্ধুদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে বলেছিলেন : 'ইনি এমন এক ব্যক্তি যিনি মদ না-খেলেও মদ্যপদের শ্রদ্ধা করেন।'...কোনও এক অভিনেত্রীর বাড়ি তল্লাসীকালে প্রতিবাদস্বরূপ তিনি উদাত্তকণ্ঠে বলেছিলেন : 'চেনো নাকো মোরে? শোনো নাই মোর নাম? পুণ্য হেম যার দ্বারে রহিত দাঁড়ায়ে। আমি নাট্যসাম্রাজ্ঞী, রিজিয়া আমার নাম। আমি আদেশ করিতে জানি, আদেশ শুনি নাই কভু।'

তৎকালীন কলিকাতা-পুলিশ এই শ্রেণীর মাতালদের কখনও অসম্মান করেন নি। বরং সর্বতোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন ও নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন থেকেছেন। এই-সব প্রতিভাবান ব্যক্তিদের দ্বারা সমাজের বহুবিধ কল্যাণের সম্ভাবনা বুঝে তাঁরা ওঁদের প্রতি বরাবর সহৃদয় ছিলেন। কিন্তু এই বিদেশী-প্রথা মদ্যপান-অভ্যাস বহুব্যক্তির চরিত্র শিথিল করে—অনেকেই চরিত্রহীন হয়ে পড়েন। রক্ষিতার বদলে প্রায়শই তাঁরা বেশ্যাসক্ত হন। যে আসক্তি চরিতার্থ করতে মাত্র দশটাকাই যথেষ্ট, অহমিকার বশবর্তী হয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হাজার টাকা ব্যয় করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হন না। তাঁরা সম্ভোগ করবেন অথচ পূর্বপুরুষদের মতো দায়িত্ব গ্রহণ করবেন না। এতে তাঁদের প্রতিভা নির্মূল ও স্বাস্থ্য বিনষ্ট হয়। পরে তাঁরাই পথের ভিখারীতে পরিণত হন। অনেকেই তা হয়েছিলেন।

'হুজুর, একটি সুন্দরী নারীর সন্ধান পেয়েছি। আপনি অনুগ্রহ করে যদি একবার তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন...' মোসাহেবের সবিনয় নিবেদন : 'কিন্তু একটা সমস্যা হয়েছে, হুজুর। বেটিকে আপনার সামনে নিতে আসতে পারতুম, আসতেও সে রাজি, কিন্তু লজ্জায় একেবারে মরে যাচ্ছে। হুজুরের উচ্চ রুচির কথা তার জানা আছে, সজ্জিত হতেও সে জানে, মুশকিল হয়েছে এই যে অঙ্গসজ্জার জন্যে একটিও স্বর্ণালংকার তার নেই।'

'এই কথা! আমি এখনই সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছি।' বলে জমিদারবাবু চেক বইখানা বার করে খসখস কি লিখে বাড়িয়ে দিলেন মোসাহেবের দিকে : 'এই নাও। দশ হাজার টাকার সোনার গহনা কিনে ওকে দেবে। মনের মতো সাজতে বলবে। সাজসজ্জা সম্পূর্ণ হলে তুমি এসে আমাকে নিয়ে যেও।'

মোসাহেবের সঙ্গে সেই সুন্দরীর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন জমিদারবাবু। পান খেতে চাইলেন। নিখুঁতভাবে সজ্জিতা সেই সুন্দরী পরম যত্নে পান সেজে দিল। তিনি পান খেয়ে চলে আসতে চাইলেন। সুন্দরী স্বভাবতই তাঁকে আবার আসার জন্যে অনুরোধ করল। তাতে তিনি বিরক্ত হয়ে স্পষ্টস্বরে বললেন, 'তোমার জা[illegible] যাকা ভালো, আমি এক মেয়েমানুষের বাড়িতে দুবার যাই না।'

আর-একবার এক জমিদার-পুত্র ময়দানে বেড়াতে গিয়ে এক কুলটা নারী বক্ষ প্রদর্শন করলে তিনি তাঁকে তখনই আহ্বান করে গাড়িতে তোলেন এবং সোজা থানায় এনে ক্রুদ্ধস্বরে বলেন, 'এই মেয়েলোকটি ভেবেছে কি। নারীবক্ষ কি আমি দেখি নি? আমার চৌদ্দ বছর বয়স থেকে আমি ও-জিনিস নিয়ে খেলা করছি আর আমাকেই কিনা...'

[ধনী রাজা ও জমিদারদের এই নির্বিচার যৌন মিলন এবং তৎসহ যৌনরোগ অন্য বিষয়ে একপ্রকার উপকারে এসেছিল। এতে কোনও রূপে একটি সন্তানের জনক হতে পারলে ভবিষ্যতে নানান ঝামেলা থেকে রক্ষা পাওয়া যেত। এক সন্তানের ফলেই পুরুষানুক্রমে বহুজনের হাতে জমিদারী বিভক্ত হয় নি।]

কিন্তু পুলিশের মুশকিল হ'ত এই যে এই-সব পড়তি ধনীপুত্ররা পূর্বঠাট বজায় রাখতে গিয়ে অনেকক্ষেত্রে নিজেরাই অপরাধী হয়ে যেতো। পরবর্তীকালে এদের বিরাট বাড়িগুলি বিড্-গ্যাম্বলার ও নওসেরা দলের আশ্রয়স্থান হয়।

সেণ্ট্রাল এভেনিউ তখন পুরোপুরি তৈরি হয় নি। চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ বস্তি-অঞ্চল। ওই জায়গাটা বৃত্তিগত পুরানো পাপীদের নিরাপদ আস্তানা হিসাবে পরিগণিত ছিল। সুসংগঠিত অপদলগুলি শহরকে নিজ-নিজ নির্দিষ্ট এলাকাতে ভাগ করে নেওয়ার ফলে এক-এলাকার লোক অন্য-এলাকায় 'কর্ম' করতে এলে খুনোখুনি ও মারামারি অনিবার্য হয়ে উঠতো। আপন আপন এলাকার খুঁটিনাটি অলিগলি তাদের নখদর্পণে থাকায় তারা গ্রেপ্তার এড়াতে সক্ষম হ'ত। থানার সামনে ঘোরাঘুরি করে পুলিশ-কর্মীদের চিনে নিয়ে সাবধান হয়ে যেতো। নিজেদের কর্ম-পন্থা সাবলীল ও সুষ্ঠু করবার জন্যে তারা নিজস্ব অফিস বা আড্ডা পর্যন্ত গড়ে তুলেছিল। প্রতি-দলে অধিনায়ক বা সর্দার ছিল একজন করে। সারাদিনের উপার্জন তার কাছে জমা দেওয়া হলে সর্দার প্রতিরাত্রে সকলকে সমান ভাগ দিত। এতে কোনোদিন একজনের আয় কম হলে কিংবা কিছুই না হলে সে দুঃখিত হ'ত না। এরা বিচিত্র চরিত্র।

সায়ান্স কলেজের ডঃ পালিতের কাঁধ থেকে দামী ছাতাখানা তুলে চোখের নিমেষে একজন উধাও। ডঃ পালিত দুটো ধাক্কা খেয়েছিলেন, সামলে নিয়ে যখন তাকালেন তখন ছাতার টিকিও দেখতে পেলেন না। তিনি জমাদারের কাছে গিয়ে নালিশ করেছিলেন, জমাদার বলেছিল আমাকে। জমাদারের বয়ান: 'হুজুর, ইনে আপকো মাস্টার থি। তব তো উনকো ছাতা মিলনে চাহী।'

জমাদার তাঁকে ছোট-করিমের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। ছোট-করিম সব শুনে বলেছিল: 'হাঁ। উ তো হামারি এলাকা হোগা। পিছু দুনো ধাক্কা আপকো

মিলি তো ওহী হামার আদমী থি। আইয়ে—' বলে সে তাঁকে একটা মাঠকোঠায় নিয়ে এল এবং সেখানে রাশিকৃত ছাতা দেখে তিনি তো অবাক। বহুক্ষণ অনুসন্ধানের পরও তিনি নিজের ছাতাটি খুঁজে পেলেন না দেখে ছোট-করিম বলেছিল : 'ওটা তাহলে এখনও জমা পড়ে নি। আধঘণ্টা পরে ওই ছাতা নিয়ে যাবেন।'

পুলিশ-কমিশনার সাহেবের এক বন্ধু মহারাজার জামাতা—তাঁর ঘড়িটি গুণ্ডারা ছিনতাই করে নিয়েছিল। ওই ঘড়ি উদ্ধারের কাজে থানার ইনচার্জবাবু বড়-করিমের সাহায্য গ্রহণ করলেন। তবে শর্ত হ'ল এই যে ঘড়ি উদ্ধারের পর কোনও মামলা রুজু করা চলবে না। বড়-করিম জামাতা-বাবাজীকে নিজের আস্তানায় এনে তাঁর চোখ দুটো পুরু কাপড়ে বেঁধে ছ্যাকড়া গাড়িতে তুলল এবং কিছুদূরে গহন বস্তি-অঞ্চলে এসে এক মাঠকোঠার সামনে থামল। চোখ খুলে দেওয়া হ'ল। দেওয়ালে বহুসংখ্যক মূল্যবান ঘড়ি টাঙানো রয়েছে দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। তার মধ্যে তাঁর ঘড়িটিও ছিল। কিন্তু লোভের বশবর্তী হয়ে একটি হীরকখচিত স্বর্ণনির্মিত ঘড়ি সনাক্ত করে নিজের বলে দাবি করায় বড়-করিম তাঁকে যথেচ্ছ গালিগালাজ করে বলেছিল : 'হামলোকসে তু'লোক বড়িয়া চোর আছে। আপকো ঘড়ি ওই কোণা মে মজুত হ্যায়। একোভি ঘড়ি আপকো নেহি মিলেগা। যাও ভাগো—' তাঁকে ঠিক সেইভাবে চোখ বেঁধে গাড়িতে তুলে ওরা নয়া রাস্তার মোড়ে ছেড়ে দিয়ে যায়।

ওরা নিজেদের জন্য একটা নিজস্ব জগৎ তৈরি করে নিয়েছিল। কোনও এক পিকপকেট-সর্দারকে তার রক্ষিতার গর্ভজাত পুত্রকে আদর করে বলতে শুনেছিলাম : 'এশালে হামসে ভি বোড়ো চোর হোবে। এ শালে বেদাগী চোর আছে। হা হা হা।' হাজতঘরে রাত্রে জোট বেঁধে বসে এবারকার কাম বা হিম্মত কার কত বেশি তা গর্ব করে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতো।

প্রিভি-কাউন্সিলে শরীকী মামলার জন্য কিছু সংখ্যক বড় বাড়ি হানাবাড়ি রূপে পরিচিত ছিল। শহরে রোজা না-থাকাতে ভূতের উপদ্রব বন্ধের জন্য পুলিশের ডাক পড়তো। আমি একরাত্রে এক প্রাঙ্গণে গিয়ে দেখি যে এক গোল স্তম্ভের উপর চেয়ারে বসে এক দাড়িওলা ব্যক্তি পা দুলিয়ে ঘুষি দেখাচ্ছে। আর ওই নাতিদীর্ঘ গোলাকার স্তম্ভটি এ-কোণ থেকে ও-কোণে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো যাচ্ছে আর আসছে। প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘকায় ব্যক্তিটি বড়ো চেয়ারে ফোকর সৃষ্টি করে এবং কোমর স্থাপন করে লম্বা পা দুটি সাদা অয়েল ক্লথে জড়িয়ে বিভ্রমকারী স্তম্ভ রচনা করেছিল। তার ঝুলানো পা দুটি কৃত্রিম হলেও হাত মুখ ও দাড়ি নিজেরই ছিল। নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা দখল করে ব্যাঙ্কশাল কোর্টের বাড়িতে নাচ-

গানের আসর করেন। প্রবাদ—তখনও গভীর রাত্রে সেখানে ঘুঙুরের আওয়াজ শোনা যেতো। জনৈক কোর্ট ইনস্‌পেক্টর অধিক রাত্রি পর্যন্ত বকেয়া কাজ সেরে রাখছিলেন। হঠাৎ একজন দাড়িওয়ালা অদ্ভুত আকৃতির খিদমতকার দরজার ফাঁকে উঁকি দিলে তিনি ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

বিঃ দ্রঃ—অধিক ক্ষেত্রে এই-সব দৃশ্য মানসিক ভ্রমপ্রসূত হলেও কিছু ক্ষেত্রে ওগুলির ব্যাখ্যা পাওয়া কঠিন। পুলিশ ভূতে বিশ্বাসী হলে 'কাওয়ার্ডিস' অপরাধে চাকুরি বিচ্যুত হ'ত। কোনো বাড়িতে মাংস আনলে তা উধাও হয়ে সেই জায়গায় তরকারি নিক্ষিপ্ত হ'ত। এমন-কি এক ওঝার মন্ত্রের জন্য আনা শূকরের মাংসও অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। এগুলি বাড়ির বিপথগামী তরুণেরা সূক্ষ্ম সুতার সাহায্যে সমাধা করেছিল। কিছু ক্ষেত্রে ঘুলঘুলির মধ্যে দিয়ে দেওয়ালে সিনেমার ছবি ফেলে বা রেডিও রিসিভার ও স্বল্পশক্তি সম্পন্ন ট্রানজিসটারের সাহায্যেও ভয় দেখানো হয়ে থাকে।

এক রাত্রে এক তরুণ কণ্ঠস্বরে থানাতে ফোন এলো যে অতো নম্বর বাড়িতে একজন গলায় দড়ি দিয়েছে। ফোন পেয়ে আমি স্বয়ং এক জমাদার ও এক সিপাহী সঙ্গে নিয়ে তৎক্ষণাৎ তদন্তে চলে গেলাম। বাড়ির নম্বর ও গলির নাম জানা ছিল। গলির মোড়ে গিয়ে যখন উপস্থিত হলাম, আমাদের দেখে এক তরুণ বললে, 'আরে আপনারা তো খুব তাড়াতাড়ি এসে গেছেন। সোজা চলে যান, ডানদিকে মোড় নিলেই পেয়ে যাবেন।' তাই গেলাম এবং বাড়ি পেলাম। কিন্তু কড়া নাড়তে হ'ল বহুবার। শেষে এক ব্যক্তি ঘুম থেকে জেগে উঠে উপরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন এবং আমাদের দিকে দৃকপাত করেই বিরক্তস্বরে বলে উঠলেন, 'পুলিশ! আমাদের বাড়িতে পুলিশ! আমার বাবা ছিলেন রায়বাহাদুর আর আমাদের বাড়িতে কিনা…।' যখন আত্মহত্যার বিষয় তাঁকে জানালাম, তিনি আঁতকে উঠে বললেন, 'আরে রাম রাম! এ কী অলক্ষুণে কথা! কই আত্মহত্যার কথা আমরা তো কেউ জানি না…।' একটু পরে অন্য ঘরগুলিতে আলো জলে উঠল এবং তারপরই বাড়ির মহিলারা চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিলেন। সত্যই—বাড়ির বারান্দাতে এক তরুণ গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। আমরা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম এবং মৃতদেহটি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। যে ছেলেটি আমাদের পথ দেখিয়ে এই বাড়ির হদিস দিয়েছিল সেই ছেলেটিই কড়ির ফাঁক দিয়ে দড়ি গলিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়েছে। তার সেই নাক চোখ ও ব্যাকব্রাশ-করা চুল এবং নাকে প্যাসনে-চশমা পায়ে লপেটা স্লিপার গায়ে ডোরা-কাটা সৌখীন নীল হাফসার্ট পরনে কালো পায়জামা।

'হুম !'—একটু ভাবার পর আমার বিচলিত ভাব কমল এবং খানিক আশ্বস্ত হয়ে বাড়ির কর্তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার মনে হয় এরা যমজ ভাই, অন্য ভাইটিকে অল্পক্ষণ আগে আমি দেখেছি। ডাকুন দিকি তাকে এখানে—'
উত্তর পেলাম : 'না ওর কোনো যমজ ভাই নেই।'
শুনে ফের আমি বিচলিত হলাম। সত্যি বলতে-কি ভয় পেয়ে গেলাম একটু। কী করে এমন ঘটনা সম্ভব ? আমি সিপাহীকে পাহারায় রেখে জমাদারের সঙ্গে থানায় ফিরতে চাইলাম। কিন্তু সিপাহী সবেগে ঘাড় নেড়ে জানাল যে তার নোকরি যায় তো যাক্ তথাপি ওই ভূতুড়ে বাড়িতে একাকী একমুহূর্ত কালাতিপাত করবে না। প্রকৃতপক্ষে সে দারুণ ভয় পেয়েছিল। আমার বিশ্বাস, ওই বালক আমাদের সংবাদ দিয়ে খিড়কিপথে বাড়িতে ঢুকে আত্মহত্যা করেছিল।
[প্রকৃত ঘটনা বোঝা অসম্পূর্ণ থাকে বলেই ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি। সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করলে ঘটনার প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আত্মবিশ্বাস থাকা ভালো কিন্তু তার আধিক্য মন্দ। তাতে বিপদ ঘটে। জনপ্রিয়তা উত্তম কিন্তু সস্তা জনপ্রিয়তা বিধ্বংসী।]

প্রভাতনাথ মুখার্জি

রায়বাহাদুর প্রভাতনাথ মুখার্জি কলকাতা-পুলিশের ডেপুটি-কমিশনার পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। এই দীর্ঘদেহী সুপুরুষ ব্যক্তিটি উত্তম শ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন —অভিনয়ে প্রচুর প্রশংসা পান। স্যার চার্লস টেগার্ট গুণ্ডাদমনে এঁকে নিয়োগ করেন। এই কাজে তিনি সাহায্যকারী হিসাবে নিয়েছিলেন তিনজনকে : সত্যেন্দ্র মুখার্জি, বর্ধন ও আমি। আমাদের সাহায্যে তিনি পুলিশ-বিভাগ হতে দুর্নীতি দমনে বদ্ধপরিকর হন। গাছেরও খাবে আর তলারও কুড়োবে—অর্থাৎ উৎকোচ নেবে এবং প্রমোশনও পাবে এ-ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। অপরাধীদের মধ্যে থেকে চর সংগ্রহ তাঁর পছন্দ নয় এইজন্য যে চরেরা তাতে প্রশ্রয় পায় —তারা নিজেরা দশটি অপরাধ করে বিরোধীদের দুটি বা চারটি অপকর্মের খবর দেয়। উনি সৎ ও সাধু কর্মীদের ভুলচুক উপেক্ষা করতেন কিন্তু অসাধু কর্মীদের সামান্য ভুলে তাঁর নিকট ক্ষমা নেই।
স্বল্পসংখ্যক পুলিশ-কর্মীদের দ্বারা শহরে অপরাধ-প্রতিরোধ সম্ভব নয়। এজন্য উনি ট্রাপিজ অর্থাৎ ফাঁদ পাতা অধিক পছন্দ করতেন। নির্দিষ্ট পথে বা মাঠে দামী ঘড়ি ও আংটি পরে সালংকারা স্ত্রীর সঙ্গে পদব্রজে বা শকটে ছদ্মবেশী পুলিশ-কর্মী ঘোরা-

ঘুরি করত। আর দূরে দূরে সশস্ত্র পুলিশ-কর্মীরা থাকত ফেরিওয়ালা প্রভৃতি নানান ছদ্মবেশে। আরও দূরে মোটর-বিহারী পুলিশ দূরবীন চোখে। ভুয়া বা অলীক ক্রেতা সেজে অপহৃত দ্রব্যাদি উনি প্রচুর উদ্ধার করতেন। ফলে, অপরাধীরা ব্যক্তিমাত্রকেই পুলিশ সন্দেহ করে অপকর্মে বিরত থাকত। এতদ্বারা প্রকৃত অপরাধীদের সহজে খুঁজে বার করা সম্ভব ছিল। এইভাবে একটিও নিরপরাধ ব্যক্তি দণ্ডিত না-হওয়ায় পুলিশ-বিভাগের সুনাম বাড়ে। তদন্ত করে সাক্ষী পাওয়ার পর গ্রেপ্তার করা প্রকৃত পন্থা নয়—গ্রেপ্তারের পর তদন্ত করা উচিত কাজ।

[অধুনা প্রিভেন্‌টিভ এ্যারেস্ট, প্রটেকটিভ এ্যারেস্ট, সুইপিং এ্যারেস্ট অর্থাৎ ঝাড়ু কেস, মাস এ্যারেস্ট প্রভৃতি শোনা যায়। কিন্তু এগুলি পুলিশের অক্ষমতার পরিচায়ক মাত্র। এতে শত্রুকে বন্ধু না করে বন্ধুকে শত্রু করা হয়।]

পাপের ভার পূর্ণ হলে পতন অনিবার্য। এজন্য দুষ্ট ব্যক্তিদের কিছুকাল বাড়তে দেওয়া ভালো। এতে তাকে বধ করার মতো সাক্ষী তৈরি হয়। এক্ষেত্রে শুধু নজর রেখে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। পাপের সংসারে পাপ সহবাস করলেও পুণ্যের সংসারে পাপ অসহনীয়। তাই সৎ-পরিবারের কেউ বেশ্যাসক্ত হলে প্রথমেই সে রোগগ্রস্ত হয়।

আমার উপরোক্ত মতবাদগুলি প্রভাতনাথ মুখার্জি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতেন। তিনি বলতেন, 'আজ হোক কিংবা কাল হোক পাপের প্রায়শ্চিত্ত একদিন তাকে করতেই হবে।' আমি দু-একটি ক্ষেত্রে তার প্রমাণ পেয়েছিলাম।

কোনও এক মদ্যপ সহকর্মীর সঙ্গে ভোররাত্রি চারটার সময় তল্লাসীতে বেরিয়েছিলাম। ফুটপাতে এক সন্ন্যাসী তখন নিদ্রামগ্ন। সহকর্মী পা আটকে তাঁর ঘাড়ে পড়লেন হুমড়ি খেয়ে। রেগে গেলেন খুব। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসীর চুল চেপে ধরে জুতাসহ পদাঘাত করলেন। সন্ন্যাসী নীরবে সহ্য করলেন। প্রহার প্রশমিত হলে তিনি শুধু বললেন, 'তোমার মঙ্গল হোক।' তারপর ধুলো ঝেড়ে শান্তভাবে স্থানত্যাগ করে গেলেন, মুখে স্মিতহাসি। আমি প্রতিবাদে ফেটে পড়ে সহকর্মীর সঙ্গে কলহ-রত হয়েছিলাম।

এই সময় পরিচিত এক প্রৌঢ় পুণ্যার্থী গঙ্গাস্নানে যাচ্ছিলেন। আমাকে কলহ না করে শান্ত হতে উপদেশ দিলেন। পরে বললেন, 'ঘোষালবাবু ওকে কিছু বলবেন না। ওঁর রক্ষা নেই। ওই পুণ্যাত্মা সাধু প্রহৃত হয়ে যদি ওঁকে গালি দিতেন তাহলে শোধবোধ হয়ে যেতো। কিন্তু তিনি তা না করে ওঁকে আশীর্বাদ করে গেলেন। এ বড়ো ভয়নক জিনিস—'

পর সপ্তাহে পানোন্মত্ত সেই সহকর্মী থানার ডায়েরিতে রাউণ্ড রিপোর্ট লিখলেন :

চ্যালেঞ্জড কনস্টেবল নং ২৪৮০৯০ এ্যাট দি জংশন অফ্ কনজাঙসন। (থানাতে মাত্র ৭০ জন কনস্টেবল বহাল ছিল।) তারপর এক পথচারীকে পিটিয়ে হাস-পাতালে পাঠালেন। সেখানে ডাক্তাররা সেই ব্যক্তির দেহে প্রহারের জখম আছে রিপোর্ট লেখাতে উনি তাঁদেরকেও পিটুনি দিলেন। এই সংবাদ পেয়ে বড়ো সাহেব স্বয়ং তাকে সেখান থেকে ধরে এনেছিলেন। কয়েকদিন যাবৎ বিভাগীয় তদন্তের পর উনি কর্মচ্যুত হন নিজের দোষে। পরবর্তীকালে আমরা তাঁকে শীর্ণস্বাস্থ্যে এর-ওর কাছে অর্থভিক্ষা করতে দেখেছি।

[স্বল্প সংখ্যক কর্মীর উৎকোচ গ্রহণ মানেই উৎপীড়নের নামান্তর ছিল। তাঁরা উৎকোচের জন্য বহুজনকে ধরতেন ও ছাড়তেন। প্রভাতনাথ মুখার্জি এই ব্যাপার-গুলি জানতে পেরে সংশ্লিষ্ট কর্মিগণের নিকট কৈফিয়ৎ চাইতেন। এদের কারো কারো শেষ পরিণাম ভয়ংকর হতে দেখেছিলাম। একজন তো অস্থানে প্রহৃত ও নিহতও হয়েছিল। অন্যেরা সন্ত্রস্ত হয়ে ভয়ে-ভয়ে গোপনে উৎকোচ নিতো এবং উৎকোচদাতার যথাসাধ্য উপকার করতো। তাঁরা উৎকোচ গ্রহণ করে নির্দোষী-দের ক্ষেত্রে কোনও ক্ষতিসাধন করেন নি—তাঁদের মধ্যে পাপ-পুণ্যের একটি পৃথক মূল্যায়ন আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম।]

কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমরা সততার জন্য বহু সহকর্মী, কিছু উকিল ও জনগণকে শত্রু করে তুলেছিলাম। এজন্য অন্যদিকে আমাদেরকে আত্মরক্ষার্থে সদা-সজাগ থাকতে হ'ত। শুধু নিজেরাই সৎ থাকাটা যথেষ্ট নয়, আমরা অন্যকেও সৎ থাকতে বাধ্য করেছিলাম। এজন্য বহুজন উৎকোচ-গ্রহণের পর রাত্রে নিদ্রা যেতে পারে নি।

আমার পুলিশী-গুরুরা কোনও মহিলার বাড়ি তল্লাসীতে কিংবা ওদের সহিত নিভৃত-সংলাপে যথেষ্ট সাবধান হতে উপদেশ দিতেন। জন দুই বৃদ্ধ বা জন দুই বিশ্বাসী নারী সম্মুখে রেখে ওদের গৃহগমন বা কথোপকথন বিধেয়। একদিন মাত্র অসতর্ক মুহূর্তে এর বিপরীত কাজ করাতে আমার দুর্ভোগ সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে-ছিল।

মৃত মহারাজার দুই মাড়োয়ারী রানীর মধ্যে জহরত তছরুপের বিবাদ। আদালত তল্লাসী পরোয়ানা জারি করেছিলেন। আমি হুকুম-মোতাবেক ছোটরানীর গৃহে তল্লাসীতে গিয়েছিলাম। রীতি-অনুযায়ী দুটি বৃদ্ধকে জবরদস্তি সাক্ষীরূপে সেখানে আনা হয়েছিল।

অপূর্বসুন্দরী গৌরবর্ণা বিংশতি বর্ষীয়া ছোটরানী দুয়ার খুলে দিলেন। আমাকে দেখে ব্যাপার অনুমান করে রীতিমত উত্তেজিত। ঘন ঘন শ্বাস ফেলে ঝড়ের বেগে বললেন, 'নেহি নেহি, তল্লাসী নেহি হোগী। কেতনা রুপেয়া মাঙতা কহিয়ে তুম।

বিশ হাজার—চালিশ হাজার। এ্যা ক্যা বোলত তভি নেহি?'—আমি তাঁর প্রতিটি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি এবং তল্লাসী-কাজে বিলম্ব হচ্ছে বলে ব্যস্ত হয়ে উঠি। তিনি খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন, থম-ধরা গলায় বলে উঠলেন, 'বহুত আচ্ছা। ঠিক হ্যায়। তর্ব ভিতরমে আও—।' তর্কাতর্কিতে বিহ্বল হয়ে আমি ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম। ক্রুদ্ধ ভদ্রমহিলা মুহূর্তে ঘরের দরজা বন্ধ করে ভিতর থেকে চাবি লাগিয়ে দিলেন। সিপাহী জমাদার সাক্ষী-তুজন আর. বড় রানীর উকিলরা বাইরে রয়ে গেলেন।

বন্ধ ঘর। চতুরা মহিলা হঠাৎ ব্লাউজ ছিঁড়ে সুস্ফীত বক্ষ উন্মুক্ত করে চিৎকার শুরু করে দিলেন: 'মেরি ইজ্জত লে লিয়া।' ঘন ঘন এই চিৎকার করতে করতে তিনি টেলিফোনের নিকট ছুটে গেলেন এবং পর পর দুটি নাম্বার ডায়াল করে ব্যারিস্টার বি. সি. চ্যাটার্জি ও এ্যাডভোকেট কেশব গুপ্তকে স্বরচিত কাহিনী নিবেদন করলেন। তাঁর নিবেদনের বয়ান ছিল এই? 'এক থানাদার আ'কে মেরি ইজ্জত লে লিয়া'। হম পচাশ হাজার রুপেয়া খরচা করনে তৈয়ার আপলোক ফৈসন লেকে তুরন্ত ইহাঁ পর আ' যাইয়ে।'

আমি তো হতবাক। বিহ্বলভাবে পিছনের একটি সোফায় ঝুপ করে বসে পড়েছিলাম। বেশ অবশ লাগছিল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমার রক্তশূন্য মুখভাব দেখে ভদ্রমহিলা করুণার বশবর্তী হয়ে হাঁক দিলেন: 'রুকমানিয়া, এ রুকমানিয়া—।' পরিচারিকা রুকমানিয়া পাশের ঘর থেকে সংযোগকারী দরজা ঠেলে এ ঘরে আসতেই তিনি কৃত্রিম ধমকের সুরে বললেন, 'দেখতা নেহি? বাবুকো পচনা আতা। পাংখা খুল দেও। আউর জলদি শরবত বানাকে লে আও।'

পরিচারিকা চলে যাবার পর তিনি আমার পাশেই বসলেন এবং তুহাতে আমাকে জড়িয়ে আদরে অতিষ্ঠ করে তুললেন। আমি অপ্রস্তুত। আদর করতে করতে তিনি বললেন 'ক্যা বাবু, কাহে মেহি পর নারাজ হো'—আমার দিক থেকে কোনো সাড়া নেই। আমি কোনও কথা না বলে চুপচাপ চোখ বুজে বসেছিলাম। আমার গণ্ডদেশে ইঁতুরের দাঁতের মতো ছোট-ছোট দাঁত কুটকুট করে আলতোভাবে বসে যাচ্ছিল। ঠোঁটের নরম স্পর্শ পাচ্ছিলাম। তিনি ইচ্ছামত আমাকে ব্যবহার করছিলেন। আমার তরফ থেকে একটুও সাড়া ছিল না।

হঠাৎ দরজাতে ঠক ঠক শব্দ। ভদ্রমহিলা অসংবৃত বেশবাস সংযত করে নিয়ে দরজা খুলে দিলেন। এ্যাডভোকেট কেশব গুপ্ত ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি আগে থেকে আমাকে চিনতেন ও জানতেন। তাই ছোটরানী কিছু বলার আগেই তিনি বললেন, 'এ বাবু আপকো ইজ্জত লিয়া? নেহি, নেহি। ইয়ে বহুত আচ্ছা লেড়কা।'

ভদ্রমহিলা কিন্তু নরম হলেন না, বেশ উগ্রস্বরে বললেন, 'ইজ্জত তো জরুর লিয়া হ্যায়।—ঘর উনে তল্লাসী কিয়া। উসমেই তো মেরি ইজ্জত গ'য়া। ইয়ে ভদ্রঘর কো বাবু। আউর কৈসন ইজ্জত লেগা।'

এই ঘটনার পর আমি বুঝেছিলাম যে পুলিশ-কর্মীর অবিবাহিত থাকা নিরাপদ নয়। এতে অনর্থক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হয়। একদিন এই বিষয়ে একটু অদ্ভুত সুযোগ এসে গেল। এক সদ্য-আলাপী বন্ধুর সঙ্গে তাঁদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। তখন বর্ষাকাল। বৃষ্টি-ভেজা জুতো দুটো বারান্দায় খুলে রেখে ঘরে বসে গল্প করছিলাম। ফেরার সময় ঘরের বাইরে এসে দেখি, আমার জুতো-জোড়া সেখানে নেই। জানা গেল, বন্ধুর রুচিশীলা কনিষ্ঠা ভগিনীর হুকুমে ভৃত্য ও-দুটো বাইরে ফেলে দিয়েছে। বেশ করেছে, কিন্তু খালি-পায়ে তো ফেরা যায় না। আমি ওই তরুণীরই শ্লিপারে পা গলিয়ে থানায় ফিরে এসেছিলাম মনে মনে একটা জেদ পুষে। এতই যার রুচিজ্ঞান তাকে আমার জীবনের রুচির সঙ্গে ওতঃ-প্রোতভাবে জড়িয়ে ফেললে কেমন হয়?

বাড়িতে আমাকে বার বার বিবাহের জন্য তাগিদ দিয়েছে। আমি গড়িমসি করেছি। অতএব বাড়িতে অমত হবে না বুঝে তড়িঘড়ি শুভকাজে নেমে পড়লাম। নিমন্ত্রণ-পত্র তৈরি করে ফেললাম একখানা। আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধু-বান্ধবদের নামের তালিকা যখন প্রস্তুত করছি তখন মূর্তিমান ভগ্নদূতের মতো ও-পক্ষের ঘটক এসে জানাল যে পাত্রীর পিসিমার এই বিবাহে ঘোরতর অমত। কারণ? তিনি লিখিত ভাবে দূরদেশ থেকে জানিয়েছেন, 'সাবরেজিস্টার আবার হাকিম, তেলাপোকা আবার পাখি, ঘোষাল আবার বামুন।' বুঝতে পারলাম কুলীন বলে ওঁরা কুল ভাঙতে কিছুতেই রাজি নন, কিন্তু এই ঔদ্ধত্যের সমুচিত একটা জবাব তো দিতে হবে। আমি লেখাটা কাছে রাখলাম। উকিল পশুপতি ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর মারফৎ একখানি মানহানির পত্র পাঠালাম। তার সারমর্ম এই: 'ঘোষাল ব্রাহ্মণ নয় বলাতে আমার বিবাহ হওয়া ভার হয়েছে। আমি আমার স্বজাতিদের কাছে অত্যন্ত নিচু হয়ে গিয়েছি। আমার দেহের ওজন আট পাউণ্ড কমে গেছে। এই অপবাদে আমার মনোকষ্ট অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মানসিক দিক থেকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। অতএব ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ বিশ হাজার টাকা পত্রপাঠ আমার উকিল-মারফৎ পাঠানো হোক।'

এই অভিনব পত্র পেয়ে ওদের বাড়ি থেকে বিবাহের পুনঃপ্রস্তাব আসে। কিন্তু আর রাজি হই নি।

পরে, বারে বারে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটতে লাগল। বিবাহের উদ্যোগ চলছিলই

কিন্তু পাত্র হিসাবে আমাকে যাঁদের পছন্দ আমার পাত্রী পছন্দ হয় না ; আবার আমি যে পাত্রী পছন্দ করি তাঁরা আমাকে পছন্দ করেন না। আমাকে অপছন্দের কারণগুলি শ্রবণসুখকর নয়। দু-একটা নমুনা। কেউ বলে, 'পুলিশের সঙ্গে বিবাহ কখনও নয়।' কারো মন্তব্য : 'বাংলা পাঁচের মতো মুখ।' কারো বক্তব্য : 'বাবা, অতো লম্বা লোক। বিয়ে হলে কনেকে তো টুলে উঠতে হবে।' ফলে, আমি সনাতন বিবাহ-পদ্ধতিতে বিশ্বাসী হই এবং আমার অভিভাবকবর্গের উপর পরিশেষে সব ভার অর্পণ করি।

শ্যামপুকুর থানা

এই থানাতে মাত্র তিন বৎসর-চাকুরি করার পর আমি ইনচার্জ-ইনস্পেক্টর পদে উন্নীত হয়েছিলাম। এই থানায় থাকাকালীন পাগলা-হত্যা ইত্যাদি কয়েকটি দুরূহ মামলার কিনারা করে সুনাম অর্জন করি। সে-সময় জনসেবার জন্য আমার জনপ্রিয়তা এমন তুঙ্গে ওঠে যে স্থানীয় অধিবাসীরা শ্যামপুকুর থানাকে পল্লীর নিজস্ব থানা বলে অভিহিত করত। প্রয়োজনবোধে পল্লীর মহিলারাও অসংকোচে পুলিশ-কোয়ার্টারে এসে অভিযোগ পেশ করে যেতেন। এই থানা পরিত্যাগকালে স্থানীয় জনগণ সভা করে একজন পুলিশ-কর্মীকে বিদায়-সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছিল সর্বপ্রথম। রাজনৈতিক কারণে পুলিশ-কর্মীরা জনপ্রিয় নিশ্চয় নয় কিন্তু ব্যক্তিগত-ভাবে এই বিভাগের বহুজন অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন।

[একবার এক ভদ্র-পরিবারের সঙ্গে ট্রেনে আলাপ হওয়ার ফলে কথায়-কথায় কর্তাব্যক্তিটি তাঁর বালীগঞ্জের বাড়িতে সাদর নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ট্রেন হাওড়া স্টেশনে পৌছুলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি তো এখন আত্মীয়দের মধ্যে পরিগণিত। আপনার সঙ্গে আলাপ করে আমরা খুবই সন্তুষ্ট। কিন্তু একবারও জিজ্ঞেস করা হয় নি আপনি কী কাজ করেন ?' উত্তরে আমি একজন পুলিশ-কর্মী বলায় তিনি অসতর্কভাবে মন্তব্য করেছিলেন, 'সে কি ! আপনি পুলিশ-অফিসর। আমি মনে করেছিলাম ভদ্রলোক !'

অন্য একদিন এক সভাস্থলে ইউনিফর্ম-পরিহিত অবস্থায় উদ্যোক্তাদের অনুরোধে আমাদের আহার্য গ্রহণ করতে হয়েছিল। আমরা যখন আহাররত, দূর থেকে তা দেখে এক বালক বিস্ময়ে বলে উঠেছিল, 'ও দাদা ওই দেখ। পুলিশ খাচ্ছে।' আজব-জীব পুলিশেরা যে খাদ্য গ্রহণ করে তা তার ধারণার বাইরে ছিল।]

শ্যামপুকুর থানা এলাকায় বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিকের বাস ছিল। যেমন : সজনীকান্ত

দাস উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় হেমেন্দ্রকুমার রায় বিজয়-লাল চট্টোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় তারাশংকর বন্দোপাধ্যায় বিধায়ক ভট্টাচার্য নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মল্লকবি কর্মযোগী রায় চিত্রশিল্পী যামিনী রায় প্রভৃতি আরও অনেকে। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'ছন্দা' উপেন্দ্রবাবুর 'বিচিত্রা' সজনী-কান্তের 'শনিবারের চিঠি' শৈলজাবাবুর 'পত্রিকা' এবং কর্মযোগীর 'রোচনা' এই এলাকা থেকেই প্রকাশিত হ'ত।

সেকালে প্রতিটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এক-একটি সাহিত্যিক-গোষ্ঠী ছিল। পত্রিকা-অফিসে তাঁদের নিয়মিত আগমন ঘটত ও আড্ডা বসত। বাংলা সাহিত্য তার ফলে অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে। আর-একটা বিষয় লক্ষ্য করা গেছে। প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের সঙ্গে সম্পাদকদের মধুর সম্পর্ক তো ছিলই, নবাগতরাও তা থেকে বঞ্চিত হতেন না। সম্পাদকেরা উঠতি-সাহিত্যিকদের রচনা মনোযোগ-সহকারে পাঠ করতেন ও প্রয়োজন হলে সংশোধন করে পত্রিকায় প্রকাশ করতেন। নতুন লেখকেরা তার ফলে রচনা-কার্যে উৎসাহিত ও সম্পাদকগণের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠতেন।

এই সূত্রে বহু সাহিত্যিক ও সম্পাদকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য-লাভ করেছিলাম। তাঁদের নানাভাবে সেবা করার সুযোগ যেমন পেয়েছিলাম তেমনি পত্রিকাগুলিতে বহুবিধ রচনা প্রকাশ করে আনন্দিত হয়েছিলাম। সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র বুদ্ধদেব বসু অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত দেব-দম্পতি রাধারাণীদিদি ও নরেনদা সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় যতীন্দ্রনাথ সেন-গুপ্ত যুবনাশ্ব ও দিনেশ দাসের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল আগে থেকেই। 'বিচিত্রা' পত্রিকার অফিসে সম্পাদক উপেন্দ্রনাথের মাধ্যমে সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং ওই আড্ডায় বহু সন্ধ্যা তাঁর সঙ্গে গল্প করে কাটিয়েছি। আমার লেখা প্রকাশের ব্যাপারে আড্ডাধারী এক সাহিত্যিক একদা রসিকতা করে বলেছিলেন: 'ওর লেখা না ছাপলে সম্পাদকের বাড়িতে পুরনো চোরেরা হানা দেবে।'

আমার লেখা বিচিত্রা বসুমতী ভারতবর্ষ কল্লোল পাঠশালা রামধনু মৌচাক অর্চনা অভ্যুদয় শনিবারের চিঠি রোচনা বাঁশরী ছন্দা প্রকৃতি সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা বঙ্গলক্ষ্মী রঙমশাল এবং পূজাবার্ষিকী আনন্দবাজার ও যুগান্তর প্রভৃতি নানা পত্র-পত্রিকায় গল্প উপন্যাস প্রবন্ধাদি নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রফেসর সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও ডঃ কালিদাস নাগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলাম অন্য সূত্রে। প্রথম দুজনের সঙ্গে পরিচয়ের

সূত্র বিস্মৃত তবে ডঃ নাগের সঙ্গে পরিচয় তাঁর গ্রেটার ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টের সময়। তাঁর আন্দোলন যখন চলছে তখন আমি ছাত্র। সেই আন্দোলনে আমি সাহায্য করেছিলাম স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তৎকালে শ্যামপুকুর এলাকাতে দুটি উচ্চ বিদ্যালয় ও একটি সংগীত-বিদ্যালয় প্রধানতঃ আমার চেষ্টাতে স্থাপিত হয়েছিল।

হেমেন্দ্রকুমার রায় মানুষটাই একখানি কবিতা। বাড়িতে অর্থাভাবে বাজার হচ্ছে না—তিনি হঠাৎ পেলেন কুড়ি টাকা। সংসার-খরচের জন্য আট টাকা দিয়ে বাকি টাকায় ফুল কিনে ফেললেন আর জ্যোছনা রাতে নৌকা ভাড়া করে সপরিবারে গঙ্গাবক্ষে বিহার করে বেড়ালেন। পরদিন আবার সংসার-খরচের চিন্তা। তবু, প্রতিদিন তাঁর লেখার টেবিলে কিছু টাটকা ফুল থাকা চাই, সেই-দিকে তাকিয়ে তিনি লিখতে ভালবাসতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন যে প্রকাশক-দের কাছ থেকে পাওনা টাকা আদায়ের ব্যাপারে এই সৌখিনতা বিশেষ কার্য-কর ছিল।

শরৎচন্দ্রের একবার একটি আধুলি হারিয়ে যাওয়ায় তিনি বেশ-কিছুদিন শোকাত হয়েছিলেন। বহু বৎসর পরে, তাঁর উত্তরাধিকারীর বিশ হাজার টাকা মূল্যের মোটরগাড়ি চুরি হয়ে গেলেও তাঁকে কিন্তু উদ্বিগ্ন হতে দেখিনি। শরৎচন্দ্র জীবদ্দশাতে বিখ্যাত হলেও তাঁর গ্রন্থাবলীর বিক্রয়-সংখ্যা বাড়ে মৃত্যুর পরই। তিনি প্রায়ই বলতেন যে বসুমতী সাহিত্য-মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ পুস্তক ও গ্রন্থাবলী তাঁকে সাচ্ছল্যদান করেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর সজনীকান্ত স্যাটায়ারধর্মী সাহিত্য-রচনায় সুখ্যাত হন। এজন্য তাঁর পত্রিকার অফিসে যশলোভী লেখকেরা প্রায়ই উৎপাত করতেন। তাঁর অফিস-ঘরেই সুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রফুল্লচন্দ্র সরকার নলিনীকান্ত সরকার দিলীপ-কুমার রায় দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী প্রমুখের সঙ্গে আমি অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হই। এই সময়ে শুভো ঠাকুরের 'ভবিষ্যৎ' এবং আশু চট্টোপাধ্যায়ের 'অগ্রগতি' জনপ্রিয় পত্রিকা।

মল্লকবি কর্মযোগী রায়ের বাড়িতে হুমায়ুন কবীর লালমিয়া প্রভৃতি বহু গুণী মানী ব্যক্তি নিয়মিত আসতেন। এঁরা অনেকেই তখন ছাত্র। কবিতা রচনা শিক্ষার সঙ্গে শরীর-গঠনের জন্য কুস্তি ও ডনবৈঠক অভ্যাস করতেন প্রতিদিন। তাঁর এক ছাত্র তার কবিতা ছাপা হয় নি বলে এক সম্পাদককে ঘুষি মেরে চিৎ করে দিয়ে-ছিলেন।

একরাত্রে তাঁর গৃহে গানের আসর বসেছিল। দিল্লি থেকে ওস্তাদ আজমল খাঁ এসেছিলেন। বহুজনের মতো আমিও সেখানে নিমন্ত্রিত। বাংলার সুখ্যাত গায়ক

অনাথনাথ বসু তবলা সংগতকার। গাইতে-গাইতে ওস্তাদজী হঠাৎ ধমকে উঠে বললেন, 'বাবু, ছাত পিটাও মাৎ।' প্রতিবাদে অনাথবাবু আসর ত্যাগ করে চলে যান। ওস্তাদজী তখন হাঁটু গেড়ে বসে উপর দিকে আঙুল নির্দেশ করে বলেছিলেন, 'পাংখা বন্ধ কর দিজিয়ে। বাবুজি, গানা উড় যায়গা।' তারপর তুনাহু তুনাহু হুউ-উ গাইতে গাইতে পার্শ্বে উপবিষ্ট এক ব্যক্তির চোখে আঙুল পুরে দিয়েছিলেন। আহত শ্রোতাটিকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছিল। এর আগে এক কীর্তন-গায়ককে ভাবাবেগে খোলসুদ্ধ একজনের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে দেখেছিলাম। এই-সব গায়কদের উৎপাতের জন্য অমৃত-সমান রবীন্দ্রসংগীতের দ্রুত প্রসার ঘটেছিল।

পুলিশ-কর্মীদের মধ্যে খানসাহেব খোন্দকার হোসেন রেজা যতীনন্দ্রাথ মুখার্জি যতীন্দ্রনাথ লাহিড়ী রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত চন্দ্রশেখর বাগচি শৈলেন মজুমদার মণি বসু জগৎ ভট্টাচার্য প্রভাতনাথ মুখার্জি পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী হেমচন্দ্র লাহিড়ী নলিনী সেন মহেন্দ্র মুখার্জি ও মনোহর পণ্ডিত একালে উল্লেখ্য ছিলেন। এঁদের মধ্যে অধিকাংশ জনই পরবর্তী কালে অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনার পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

বোম্বাই শহর ত্যাগ করবার পর লোকে জানলো যে স্যার চার্লস টেগার্ট কলকাতাতে নেই। অথচ চলে যাবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এমন নিবিষ্টমনে কাজ করেছেন যে কেউ বুঝতেও পারে নি যে তিনি অল্পক্ষণ পরে ভারত ত্যাগ করে অন্যত্র যাবেন। টেগার্ট সাহেব অবসর গ্রহণ করলে মিঃ এল. এইচ. কলসন কমিশনার পদের দায়িত্ব নিয়ে এদেশে এলেন। সংস্কৃত-শাস্ত্রে তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল এবং পুরাণ-বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। এক থানায় হিন্দিভাষী সিপাহীদের জন্মাষ্টমী উৎসবে রামা হৈ গান শুনে তিনি মন্তব্য করেছিলেন: 'এইবার বুঝেছি কৃষ্ণজী মথুরা ছেড়ে বৃন্দাবনে পালিয়েছিলেন কেন? নইলে এইরকম প্রবল-বাদ্য উচ্চাঙ্গ-সংগীত শুনে ওই সদ্যোজাত শিশুর আকস্মিক মৃত্যু ঘটার সম্ভবনা অবশ্যই ছিল।'

তিনি য়ুরোপীয় এবং ভারতীয় কর্মীদের মধ্যে শ্রেণীগত যে বিভেদ ছিল তার মধ্যে কিছুটা সামঞ্জস্য বিধান করেছিলেন।

তাঁর সময়ে ব্রিটিশ-সরকার প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রথা প্রবর্তন করেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা দ্বারা বিহার প্রভৃতি স্থানে মুসলমান-সম্প্রদায় হিন্দুদের এবং বাংলাতে হিন্দু-সম্প্রদায় (মাথা-গুনতি সামান্য হেরফেরে) মুসলমানদের অধীন হয়ে পড়েছিল। আশ্চর্য এই যে হিন্দুস্থানে হিন্দুর বদলে রইল শুধু দুটি সম্প্রদায় —মুসলমান এবং অ-মুসলমান। ভোটের জন্য এক সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের মুখাপেক্ষী না-হওয়াতে সাম্প্রদায়িকতা উগ্র হয়ে শহরকে বিষাক্ত করে তোলে। এই সুযোগে অসাম্প্রদায়িক কংগ্রেসের পরিবর্তে মুস্লিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

১৯৩৮ খ্রীঃ ভারত-শাসন আইনের এই পরিবর্তনে পুলিশ-বিভাগের কিন্তু কোনো অসুবিধা হয় নি। কারণ, নিয়ম করা হ'ল যে কোনো মুখ্য বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর মতভেদ হলে তার শেষ-মীমাংসা করবেন ইংরাজ গভর্নর স্বয়ং। পুলিশ-বিভাগ ইংরাজ অধিকর্তাদের অধীনে একটি মেজর ডিপার্টমেণ্ট হওয়াতে এই পরিবর্তনের তিলমাত্র প্রভাব পুলিশ-ব্যবস্থাপনার উপর পড়ে নি।

[কংগ্রেস হাই-কম্যাণ্ড বাংলা ও পাঞ্জাবে হিন্দু-মুস্লিমে কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট গোড়ায় করতে দিলে ভারত বিভাগ কোনও দিনই হ'ত না। এই বিষয়ে জিন্নাকে

তাঁদের চেয়ে উৎকৃষ্ট কূটনীতজ্ঞ বলা যেতে পারে। রাজনীতি-ক্ষেত্রে ভাব প্রবণতার কোনও স্থান নেই। এই-সব কথা তৎকালীন আদর্শবাদী কংগ্রেসীনেতারা ভুলে গিয়েছিলেন বোধহয়।]

কলকাতায় জিন্না সাহেব বহু সভা করেছিলেন। মুস্লিম-সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে তাঁর সাবধানবাণী শুনেছিলাম : 'বারে বারে আমি ঘণ্টা বাজাচ্ছি। কিন্তু দমকল এখনও পর্যন্ত এল না।'—দমকল পাঠানোর মালিক যাঁরা সেই ব্রিটিশ শাসকবর্গ প্রয়োজন না-হওয়া পর্যন্ত দমকল পাঠাবে কেন ? দেশ-বিভাগের প্রাক্কালে তাঁরা ওই দমকল পাঠিয়েছিলেন যাকে বলে ঠিক সময়েই।

চেঞ্জার ও নো-চেঞ্জার—কংগ্রেস ও স্বরাজ্য পার্টি। শেষে—কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা, ফরওয়ার্ড ব্লক ও কিছু কমিউনিস্টদের সঙ্গে দলীয় মতবাদে পারস্পরিক দারুণ বিরোধ। জাতীয়তাবাদীদের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ মুস্লিম লীগ পুরোপুরি গ্রহণ করতে পেরেছিল। বিভিন্ন পার্কে একাধিক মিটিং-এ এই-সব রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রায়ই হানাহানি মারামারি হয়েছে। ফলশ্রুতি, আহত হয়ে হাস-পাতালে গমন।

আমি কিন্তু নিজ-দায়িত্বে স্থানীয় থানার ইনচার্জরূপে প্রভাত গাঙ্গুলীর সভাপতিত্বে এলবার্ট হল-এর মিটিঙের গোলযোগে, য়ুনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে উলেমাদের মিটিঙে মুস্লিম লীগের আক্রমণে, টাউন-হলে হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের একাংশের বিরোধে ওই সভাগুলি ভেঙে দিয়েছিলাম। আমি দাঁড়িয়ে উঠে ওদের শুধু বলতাম : 'আই ডিক্লেয়ার দিস্ মিটিং ইল্‌লিগ্যাল।' তারপরই ওঁরা বিনাপ্রতিবাদে সভা ভেঙে দিতেন ও চলে যেতেন। ওই-সব বিষয়ে তাঁদের আইনানুগত্য ও সৌজন্যবোধ যথেষ্ট ছিল।

চিরাচরিত প্রথা ত্যাগ করে কলিকাতা পুলিশ-বিভাগে সর্বপ্রথম তিনজন দেশীয় পুলিশ-সুপারকে বাইরে থেকে ডেপুটি-কমিশনার করে আনা হ'ল। এই তিন-জনের নাম : হীরেন্দ্রনাথ সরকার, ফজল করিম শোভান ও ধর্মদাস ভট্টাচার্য। উত্তর-কলিকাতার জন্য লীগ-গভর্নমেণ্ট একজন মুস্লিম ডেপুটি-কমিশনার চাওয়ায় শোভান সাহেবকে উত্তর-কলিকাতার দায়িত্বে বহাল করা হয়।

[পরে শোভান সাহেবের বদলে দোহা সাহেব এবং ধর্মদাসের বদলে হরিসাধন ঘোষ-চৌধুরী ওই স্থলাভিষিক্ত হন। এরই মধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়।]

তৎকালে—অমৃতবাজার, আনন্দবাজার, বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকাগুলি ছিল জনস্বার্থের অতন্দ্র প্রহরী। হকাররা ফুটপাত অবরোধ করলে ওরা সমস্বরে লিখে-ছিলেন : 'পুলিশ অকর্মণ্য ও অপদার্থ। ফুটপাথে পথচারীরা চলাচল করতে পারেন

না।' পরদিন পথ-অবরোধ করার অপরাধে হকারদের পাকড়াও করলে ও কাগজওয়ালারাই আবার লিখেছিলেন : 'পুলিশের একি জবর জুলুম ! হকার উচ্ছেদ হলে অনাহার ও বেকার বাড়বে।' সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই বিরূপ মন্তব্যের কাটিংগুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হলে তারা সংশ্লিষ্ট কর্মীদের কাছে প্রায়ই কৈফিয়ত চেয়ে পাঠাতেন। অভিযোগ গুরুতর হলে তাঁরা তৎক্ষণাৎ তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।

[বলতে বাধ্য হচ্ছি কিছু-সংখ্যক সাংবাদিক ধর্মের ষাঁড়ের মতো। তাঁরা সকলকে যথেচ্ছ গুঁতোবেন, কিন্তু তাঁদেরকে কেউ গুঁতোলে মহা-অপরাধ। অভিযোগ ওঠে, স্বাধীনতা-উত্তরকালে একবার পুলিশ নাকি ওঁদের গুঁতিয়েছে গড়ের মাঠে। প্রণব সেনের নেতৃত্বে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। এই অভিযোগের মধ্যে কোনও সত্য ছিল না। এনকোয়ারি কমিশনের রায় প্রকাশিত হলে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। ওই কমিশনের সম্মুখে আমি নিজেও সাক্ষী দিয়েছিলাম।]

কমিশনার ফেয়ার ওয়েদার, এম. এ.

পুলিশ-কমিশনার কলসন সাহেব বিদায় নিলে সেই পদে এলেন সি. এস. ফেয়ার ওয়েদার, এম. এ.। তিনি কলিকাতা পুলিশ-বিভাগকে লণ্ডন পুলিশের মতো জনপ্রিয় ও দুর্নীতিমুক্ত করতে চেয়েছিলেন। লণ্ডন পুলিশ-বিভাগের পুরনো ধারা পাল্টিয়ে ওই নতুন আদর্শে চালিত করতে গিয়ে একদা বহু কর্মীকে কয়েক বৎসরের জন্য বরখাস্ত হতে হয়েছিল। কমিশনার ফেয়ার ওয়েদার ওই পদ্ধতিতে কলিকাতা পুলিশ-বিভাগকে দক্ষ ও সৎ করতে চেয়েছিলেন।

তাঁর প্রস্তাব ছিল, নেভি ও আর্মির মতো চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক বালকদের অফিসর পদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। যুক্তি এই : বালকদের মন ও শরীর সুগঠিত থাকে না বলে ক্রমে তাদের যথাযোগ্যরূপে গড়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু তৎকালীন গভর্নমেণ্টের এই প্রস্তাব মনঃপূত হয় নি।—লণ্ডন পুলিশ বিভাগে কিন্তু এই পদ্ধতিতে কিশোরদের ভর্তি করে তাদের শিক্ষার ভার নেওয়া হয়।

গ্রেট পার্জিঙ

এঁর সময়ে কলিকাতা পুলিশ-বিভাগে কিছু দলবন্দী তথা ক্লিকবাজি ছিল। এক-একজন দেশীয় ঊর্ধ্বতন-কর্মী অনুগত কর্মচারীদের নিজ-নিজ দলভুক্ত করে নিয়ে-

ছিলেন। তার ফলে এক-এক এলাকার কর্মীরা ভিন্ন এলাকার উর্ধ্বতন-কর্মীর অনুগত হয়ে পড়ে। বাংলা পুলিশ-বিভাগে এই-রকম ঘটনার কথা জানতে পারলে কর্মচারীদের দূর-দূর জেলায় বদলি করে দল ভাঙা হ'ত। কিন্তু যান্ত্রিক যুগে কালীঘাট ও শ্যামবাজার এপাড়া-ওপাড়া। উনি কিছু অফিসরকে বাংলা-পুলিশে বদলি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা আইনসংগত না-হওয়ায় ওই ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়।

উনি পার্জিঙ পদ্ধতি দ্বারা কলিকাতা পুলিশকে লণ্ডনের অনুরূপ সৎ করতে চাই-লেন। এই কাজের জন্য উনি প্রমাণের অপেক্ষা না-রেখে কর্মীদের রেপুটেশন অর্থাৎ সুনামের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। জনসাধারণ এবং উকিল ও সহকর্মীদের মধ্যে কিছু-সংখ্যক পুলিশ-কর্মীর এরূপ স্বীকৃত সুনাম থাকেই। উপরন্তু কর্মীদের সততা সম্বন্ধে গোপন তদন্তে উনি তা জানতে পেরেছিলেন। সততা ও দক্ষতা এই উভয় গুণের উপর উনি একত্রে গুরুত্ব দিতেন। অসৎ অথচ দক্ষ কর্মীদের দ্বারা যুদ্ধ জয় করা যায়, কিন্তু সৎ অথচ অদক্ষ কর্মীদের দ্বারা তা সম্ভব নয়। সেইজন্য অদক্ষ অথচ সৎ কর্মীদের উনি করণিক-সুলভ কর্মে নিযুক্ত করেন আর সৎ ও দক্ষ কর্মীদের বেছে-বেছে উচ্চপদে প্রমোশন দেন। ওঁর মতে শুধু নিজেরাই সৎ ও দক্ষ হলে হবে না, অধীনস্থ কর্মীদেরও সৎ ও দক্ষ হতে বাধ্য করতে হবে। এই পদ্ধতির ফলে বহু প্রবীণ কর্মী বরখাস্ত বা পদাবনত হন আর আমি ও আরও কয়েকজন বহু উর্ধ্বে উঠে যাই।

কোনো এলাকা দুর্নীতগ্রস্ত হলে সাধারণত আমাকে সেখানে পাঠানো হ'ত। আমি শ্যামপুকুরের পর—আমহার্স্ট স্ট্রীট, টালিগঞ্জ, বহুবাজার ঘুরে বালিগঞ্জে এলাম। এইখানে এসে অবসর-সময়ে আমি গোপনে বিবিধ বিজ্ঞান-বিষয়ক গবেষণা-কর্মে মনোনিবেশ করি। আমার গ্রন্থগুলিও এই সময় এক-একে প্রকাশিত হতে থাকে। বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিকরূপে আমার প্রতিষ্ঠা তখন থেকেই।

আমার একটি লজ্জাস্কর কাজ এইখানে অনুতাপের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করি। আমি বালিগঞ্জ সায়ান্স কলেজে জুওলজির ছাত্র ছিলাম। কলেজের বাৎসরিক উৎসবে বিজ্ঞান-প্রদর্শনীর প্রথা প্রথম আমি সৃষ্টি করি। ইচ্ছা ছিল, জুওলজিক্যাল সার্ভিসে অথবা অধ্যাপনা-বৃত্তিতেই যুক্ত হব। কিন্তু অধ্যাপক দুর্গা মুখার্জি ও ডঃ জ্ঞান ভাদুড়ীর হাতে কম নম্বর পাওয়ায় স্নাতকোত্তর পরীক্ষাতে অল্পের জন্য প্রথম হতে পারি নি। তার ফলে উক্ত বাঞ্ছিত ক্ষেত্রে চাকুরি পাওয়ার সুযোগ নষ্ট হয়ে যায় এবং আমাকে কলিকাতা পুলিশ-বিভাগে ঢুকতে হয়।

এই চাকুরি পাওয়ার পর সঞ্চিত রাগের কারণে ওই দুজন পরীক্ষকের নাম আমি

সেসন-কোর্টের জুরীর তালিকাভুক্ত করে দিই এবং জানতাম, খুবই যোগ্য লোক পাওয়ায় গভর্নমেণ্ট ওঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেবেন না। হ'ল্ তাই। জুরীর কাজে আটক পড়ে ডঃ ভাদুড়ীর গবেষণা-কার্য ব্যাহত এবং অধ্যাপক মুখার্জির জুওলজি-সংক্রান্ত পুস্তক-রচনায় বাধার সৃষ্টি হয়।

হঠাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় আমার জনপ্রিয়তা কর্তৃপক্ষের নিকট দোষ না-হয়ে গুণরূপে দেখা দিল। জাপান যুদ্ধে না-নামা পর্যন্ত এই মহাযুদ্ধের গুরুত্ব বোঝা যায় নি। পুলিশ-ক্লাব হতে আমি একটি গ্যাস-মাস্ক স্কোয়াড তৈরি করলাম। কর্তৃপক্ষ এ সময়ে আমার মতো জনপ্রিয় অফিসরদের সাহায্য নিয়েছিলেন। আমি সমগ্র শহরে ঘুরে-ঘুরে সিভিক গার্ড, এ. আর. পি. ফার্স্ট এড এবং ফায়ার-ফাইটিং বাহিনীগুলিতে যোগদানের সার্থকতা সম্বন্ধে তরুণ-সম্প্রদায়কে বুঝিয়ে বলি এবং তাদের সংগ্রহ করি।

চীনে জাপানী অটোক্রেসী সম্বন্ধে বহু ছোটগল্প ও অন্যান্য নিবন্ধ সমূহ কলিকাতা বেতারে পাঠও করেছিলাম।

আমি সভা করে জনগণকে এই বলে বোঝাতাম যে ব্রিটিশদের শোষণ-শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু জাপানীরা এলে উভয়পক্ষ থেকে আবার তা শুরু হবে। এই দ্বিমুখী শোষণে আমাদের সর্বনাশ অনিবার্য। জনগণের মনোবল অক্ষুণ্ণ রক্ষার জন্য আমি আরও বলেছিলাম যে সিঙ্গাপুর ও বর্মার পতন ঘটেছে। কিন্তু ওই দেশ-গুলি ও অবশিষ্ট ভারতের মধ্যে আছে বাংলা দেশ। এ দেশে বাস করে দুর্ধর্ষ বাঙালী জাতি। বাঙালীদের পর্যুদস্ত করে জাপানীরা এগোতে পারবে না।

বলতাম বটে কিন্তু এ-রকম বক্তৃতা সর্বত্র সমান সমাদৃত হ'ত না। এক সভায় জনৈক প্রৌঢ় ব্যক্তি চিৎকার করে বলেছিলেন, 'ঢের হয়েছে মশাই। ভয় দেখাবেন না। হবে আর কি। মুস্লিম আমলে বামদিক থেকে ডানদিকে লেখা অভ্যাস করেছি। ইংরাজ-আমলে ঠিক উল্টো—ডান থেকে বামে। ওদের আমলে না-হয় লিখব উপর থেকে নিচে।'

আমার এক ভায়রাভাই কর্নেল পতিতপাবন চৌধুরী, এম. ই., আই. এম্. এস. (পরে—মেজর-জেনারেল) ওদের মেডিকেল চমূর শেষ ব্যক্তি হিসাবে সিঙ্গাপুর থেকে ক্রুজারে ভারতে ফিরেছিলেন। তাঁর মুখে ইংরাজদের পরাজয়ের কিছু-কিছু কারণ জানতে পেরেছিলাম। ভারতীয় বাহিনীর লোকেদের পরিচ্ছন্ন রাখার মানসে ব্রাসো দিয়ে যখন জামার বোতাম চকচকে করানো হচ্ছে বা উর্দী অপরিষ্কার দেখতে পেয়ে ইংরাজ-কর্তারা যখন দাঁত খিঁচিয়ে দণ্ড দিতে ব্যস্ত তখন জাপানী সৈন্যগণ নগ্নপদে হাফ প্যাণ্ট ও গেঞ্জিমাত্র পরিধান করে, কাদা মেখে, মাথায় টমি-

গান ধারণ করে জলাভূমি পার হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ব্রিটিশ ফৌজীরা যেখানে যন্ত্রশকট না-হলে পাদমেকং নড়তে চায় না ও ভূরিভোজ না-হলে তৃপ্তি পায় না সেখানে জাপানীরা ঝোলার মধ্যে ভাতের মণ্ড ও চাটনি মাত্র সম্বল করে ক্রমাগত দিনযাপন করেছে।

[এ সময়ে পার্ক সার্কাস অঞ্চলে ওয়াজেদ আলি সাহেবের অলক্ষ্যে তাঁর আবাসে একটি বাঙালী মুস্লিম-সংস্কৃতি-কেন্দ্র গড়ে ওঠে। আমি ওই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাপ্তাহিক সভায় বহুবার যোগদান করেছিলাম। এই কেন্দ্রের সকলেই তরুণ মুস্লিম বাঙালী সাহিত্যিক। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের বাঙালী বলে এক দারুণ অভিমান পোষণ করতেন। সম্ভবত ওই দলে শেখ মুজীবর রহমনকেও আমি দেখেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াজেদ আলি সাহেবের ওই গৃহেই মুস্লিম বাঙালী জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়।]

হঠাৎ প্রতি থানায় নকসা-সহ গোপন নথি ও হুকুমনামা এল এই মর্মে যে ব্রিটিশরা রাঁচিতে সেকেণ্ড ডিফেন্স-লাইন খুলছে, প্রয়োজনে কলিকাতা-পুলিশকে ওখানে সরিয়ে নেওয়া হবে। কোন্ কোন্ রুট ধরে আমরা পালাব তা-ও ওই নকসায় বলা হয়েছিল। এলাকার প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সাইকেলগুলিও নম্বর-যুক্ত করে রেজেস্টারি করা হয়। দরকারে ওগুলো সংগ্রহ করে তার সাহায্যে কিছু লোক শহর ত্যাগ করতে পারবে।

ওই গোপন সারকুলার পাওয়ার পর আমি অন্যান্য সহকর্মী ইনচার্জদের সঙ্গে যোগাযোগ করে একান্তে পরামর্শ করলাম। স্থির হ'ল, নাগরিকদের অরক্ষিত অবস্থায় রেখে পালিয়ে না-গিয়ে বরং আমাদের তৈরি সিভিক গার্ড, এ. আর. পি. থানার সিপাহী ও জনগণকে সুসংহত করে আমরা তাঁদের রক্ষা করব।

দীর্ঘদেহী কিছু-সংখ্যক বাঙালী তরুণকে কলিকাতা-পুলিশে ভর্তির ব্যাপারে আমি সাহায্য করেছিলাম। পাগড়ি বাঁধা ও পরা তাঁরা পছন্দ করত না। এজন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আমি তাঁদের শিরস্ত্রাণ বদলের জন্য কিছু নকসা-সমেত প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু লাল-পাগড়ির পরিবর্তে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে টুপির ব্যবহারে গভর্নমেন্ট রাজী হলেন না। এই বছরে আমি গড়িয়াহাট এবং রাইফেল রোড ফাঁড়িদ্বয় স্থাপন করেছিলাম।

একদিন আমার অধীনে কড়েয়া থানা থেকে বিপদবার্তা এল। কড়েয়া রোডের য়ুরোপীয় বেশ্যালয়ে উৎপাতের জন্য দুজন মার্কিন-সৈন্যকে ওখানকার সার্জেণ্ট-সাহেব থানায় ধরে এনেছিলেন। একগাড়ি মাতাল মার্কিন-সৈন্য সেখানে গিয়ে ড্রাম পিটিয়ে ঘোষণা করেছে : 'আমেরিকা ডিক্লেয়ার্স ওয়ার অন কড়েয়া ফাঁড়ি।'

আমি দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বলি : 'আই ডু নট অ্যাকসেপ্‌ট ইট।' অর্থাৎ আমি তোমাদের যুদ্ধ-ঘোষণা গ্রাহ্য করি না। তারপর মার্কিন মিলিটারী পুলিশ-বিভাগে খবর পাঠালে তাঁরাও দ্রুত চলে আসে এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামাকারী দলটিকে ধমকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যান।

সামরিক বাহিনীর এই রকম কিছু সৈন্যকে আমাদের এ সময় সামাল দিতে হ'ত। তাছাড়া সাইরেন বাজানো, নিষ্প্রদীপ আরোপ করাও পুলিশের অন্যতম কর্তব্য ছিল। সিভিক গার্ড, এ. আর. পি. প্রভৃতি বাহিনীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে তাদের পরিচালনাও পুলিশকে করতে হয়েছে। সাইরেন বাজা মাত্র য়ুরোপীয় স্পেশাল কনস্টেবলরা থানায় চলে আসতেন, তাদের দেখ-ভাল করা পুলিশের কাজের মধ্যেই ছিল।

কমিউনিস্ট পার্টি তখন সবেমাত্র সরব হচ্ছে। কিন্তু জনগণের মধ্যে তখনও তাদের বিশেষ সমাদর নেই। উপরন্তু আমাদের মতো তাঁরাও জাপানীদের রুখবে ঘোষণা করায় লোকে তাদের তাড়া করে। মিথ্যা করে রটানো হয় যে গভর্নমেণ্ট থেকে অর্থ দিয়ে ওদের গড়ে তোলা হয়েছে। জেলখানায় রাজবন্দীদের কমিউনিস্ট লিটারেচার ছাড়া অন্য কিছু পড়তে দেওয়া হ'ত না বলে তাঁরা ধীরে ধীরে কমিউনিস্ট মতবাদে আকৃষ্ট হচ্ছিলেন।

[বিঃ দ্রঃ—কমিউনিজম উত্তম হলেও ভারতীয় কমিউনিস্টরা সেভাবে গ্রহণ করেন নি। ভূমি সম্পর্কে একজনের মালিকানা কেড়ে অন্য একজনকে তার মালিক করা হয়। কিন্তু প্রতিটি ভূমিখণ্ড রাষ্ট্রের সম্পত্তি বললে লোকের বিরাগ-ভাজন হতে হবে। ভূমি টুকরো টুকরো হলে কৃষিকর্ম লাভজনক হয় না। আমেরিকা, রাশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় কৃষিজমি প্রচুর। ও-সব দেশে প্লেন দ্বারা বীজ ছড়িয়ে ও ট্রাকটার দ্বারা জমি কর্ষণ করে প্রচুর শস্য উৎপন্ন করা হয়। অথচ লোক সংখ্যা জমির অনুপাতে নগণ্য। ভারত বা চীন থেকে রাশিয়ায় বাড়তি লোক পাঠালে যুদ্ধ বেধে যাবে। এক্ষেত্রে গালভরা আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ শব্দ দুটি শ্রবণ সুখকর হলেও সম্পূর্ণ অর্থহীন। প্রাচীন যুগের ভৃত্যরা এখন ওদেশে রাষ্ট্রের ভৃত্য। কিন্তু পূর্বের মতো তাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা নেই এতটুকু।]

কলকাতাতে ওই সময় যত্র তত্র হুকুম-দখল করে বাড়ি নিয়ে নেওয়ায় সাধারণভাবে বাড়ি-ভাড়া পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। এই অসুবিধা বোঝাতে গিয়ে জনগণ নিম্নোক্ত গল্পটি সৃষ্টি করে।

গড়ের মাঠে নিরালা এক পুকুরে মৎস্য-শিকাররত এক ভদ্রলোক সহসা উলটিয়ে পুকুরের জলে পড়ে গেলেন। পথচারী এক ভদ্রলোককে তিনি চিৎকার করে

বললেন, 'মশাই, ডুবে যাচ্ছি। শিগগির সাহায্য করুন।' ওই পথচারী ভদ্রলোক ঝুঁকে জানতে চাইলেন, 'আপনার বাড়ির ঠিকানাটা কী বলুন তো?' ডুবন্ত ভদ্রলোক বাড়ির ঠিকানা জানালে তিনি বলেছিলেন, 'ঠিক আছে। এবার আপনি ডুবুন। আমি আপনার বাড়িটা ভাড়া নিতে চললাম।'

ঠিকানা-মতো তিনি সেই বাড়িতে এসে হাজির। কিন্তু দেখতে পেলেন, অন্য এক ব্যক্তি মালপত্র সমেত বাড়ির ভিতরে ঢুকতে উদ্যত। বিস্মিত ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপার কী মশাই? বাড়িটা তো এইমাত্র খালি হ'ল, আপনি এত তাড়াতাড়ি খবর পেলেন কী করে?'

ভাগ্যবান ব্যক্তিটি একগাল হেসে উত্তর দিলেন, 'বুঝতে পারলেন না? আরে মশাই, আমিই তো ওকে ঠেলে জলে ফেলে দিয়েছিলাম।'

শহরে জাপানী উড়োজাহাজ হতে মৃদু বোমাবর্ষণে বিপরীত দৃশ্য দেখা গিয়েছিল। শহর পরিত্যাগ করে দলে-দলে 'ক্যালকেসিয়ান'-রা গ্রামের আত্মীয়দের বাড়িতে ভীড় করে। অন্যদিকে কিছু অবাঙালী সিপাহী কর্তৃপক্ষকে না-বলে সোজা মুল্লুকে চলে যায়। গ্রামের আত্মীয়রা শহরবাসী আত্মজনদের কিভাবে অভ্যর্থনা করেছিল জানি না কিন্তু পলাতক সিপাহীদের প্রত্যেকেরই বিচার হয় এবং বিচারে ছ'বছর করে মেয়াদ হয়।

যুদ্ধের প্রথমদিকে জার্মানীদের প্রাথমিক সফলতায় ইংরাজ উর্ধ্বতন-কর্তৃপক্ষের মন হতে দাম্ভিকতা সরে গিয়ে মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়। রাশিয়া যুদ্ধে যোগ দিলে তাঁদের সাহস ফিরে আসে। অ্যাংলো সার্জেণ্টরা হিটলারকে উপহাস করে কিছু গঁপ-গল্প সৃষ্টি করেছিল।

এক বাল্যবন্ধু নাজী হতে অস্বীকার করলে হিটলার তাকে হত্যা না-করে তার বাড়িতে মেথরের কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল। একদিন বাল্যবন্ধুটি হিটলারকে দেখে নাজী-কায়দায় উর্ধ্বে হাত তুললে হিটলার তাকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বসিত হলেন: 'বন্ধু, তাহলে এতদিন পরে তুমি আমার কথা রাখলে—নাজী হলে শেষ পর্যন্ত।' অত্যন্ত ঠাণ্ডা গলায় আলিঙ্গনাবদ্ধ ভদ্রলোকের প্রত্যুত্তর: 'আরে না না। তা কেন? বিষ্ঠা জমে কতো উঁচু হ'ল হাত তুলে তাই তোমাকে বোঝাচ্ছিলাম?'

কিন্তু এত সত্ত্বেও য়ুরোপীয় মেম-সাহেবদের মধ্যে বর্ণ-বিদ্বেষ দূরীভূত হয় নি। জনৈক কৃষ্ণবর্ণ পুলিশ-কর্মী তদন্তে গেলে এক ইংরাজ-মহিলা তাঁকে ঢুকতে না-দিয়ে বলেন, 'আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট এ ব্ল্যাক অফিসর। সেণ্ড এ ব্রাউন অর ফেয়ার অফিসর।' পাল্টা অনুযোগ করে আমি তাঁকে বলি: 'ম্যাডাম, বাইবেল ইজ রিটিন ইন ব্ল্যাক ইঙ্ক অর হোয়াইট ইঙ্ক?'

আগস্ট বিপ্লব

নেতাদের গ্রেপ্তারের পর স্বতঃস্ফূর্তভাবে আগস্ট বিপ্লব শুরু হয়ে যায়। তখন দেশের অধিকাংশ যুবক-যুবতী যুদ্ধোদ্যম-সম্পর্কিত নানান কর্মে লিপ্ত। পল্লী-অঞ্চলের বেকারবৃন্দ সিভিক গার্ড, এ. আর. পি. ফায়ার ফাইটিং, ফার্স্ট এড প্রভৃতি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত। তখন মানুষ চাকুরি খোঁজে না, চাকুরিই মানুষ খোঁজে। যিনি ফিসারী একসপার্ট তিনি রাতারাতি স্টীল-কনট্রোলার হচ্ছেন। চুরি অপেক্ষা আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর কুলি হলে উপার্জন অনেক বেশি। এ অবস্থায় আগস্ট বিপ্লবের জন্য তরুণ-সম্প্রদায় কোথায়? তবু, আগস্ট বিপ্লব শহরে গুরুতররূপে সংঘটিত হয়েছিল। নেতৃত্ববিহীন এই আন্দোলন শহরে কিশোরদের দ্বারা সু-সম্পাদিত হয়। তারাই পোস্ট-অফিস ও ট্রাম পুড়িয়েছে, ট্রামের বিজলী তার কেটেছে। তারাই মিলিটারি-গাড়ি আটকে গুলি খেয়ে মরেছে। 'স্যুট অ্যাট সাইট।'—এই হুকুম তখন পুলিশকে দেওয়া হয়। টেলিগ্রাফ পোস্টের উপর হতে বহু কিশোরকে গুলি খেয়ে রক্তাপ্লুত অবস্থায় মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে আমি দেখেছি।

সিভিক গার্ড

প্রতিটি থানার প্রতিটি বিটে একদল উর্দিভূষিত সিভিক গার্ড নিজেদের গ্রুপ-কমাণ্ডারের অধীনে নিযুক্ত থাকতো। স্থানীয় অধিবাসী হওয়ায় বিটের অলি-গলির সন্ধান তারা জানতো। তাদের ভয়ে জুয়া, চোলাই ও চুরি বন্ধ। পুলিশ উৎকোচ গ্রহণ করলে কিংবা উৎপীড়ক হলে তারা কর্তৃপক্ষকে সেই সংবাদ জানাবে। স্থানীয় জনগণের পারস্পরিক বিবাদ তারা সুষ্ঠুভাবে মিটিয়ে দেয়। ফলে একটিও প্রাইভেট মামলা আদালতে যায় না। থানা-ইনচার্জরা এই বাহিনী গড়ায় উভয়-পক্ষের সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ। পুলিশ ও সিভিক গার্ড পরস্পরকে সংযত করতো। উভয়-পক্ষের মধ্যে সহযোগিতা ছিল অত্যন্ত বেশি। খুবই বাছাবাছি করে ওদের ভর্তি করা হয়েছিল।

[পরবর্তীকালে প্রণব সেন সৃষ্ট স্পেশাল কনস্টেবল-ব্রাঞ্চ কিছুটা এদের মতোই কার্যকর হয়। কিন্তু এদের মতো সাধারণ-শ্রেণী থেকে সংগ্রহ না-করে বিত্তবানদের মধ্য হতে ওরা সংগৃহীত হওয়ায় ওরা অতো জনপ্রিয় হতে পারে নি।]

যুদ্ধকালীন মনোবৃত্তি-প্রসূত অসততার শিকার তখন বহুলোক। সকলেই অন্যায়

মুনাফা ও উৎকট উৎকোচ খুঁজে বেড়ায়। যুদ্ধোত্তম অব্যাহত রাখতে হবে বলে এদের কিছু বলা হয় নি। গভর্নমেণ্ট স্বরেও চূড়ান্ত ও নির্লজ্জ পক্ষপাত ও স্বজন-পোষণ। তখন পদের জন্য লোক-নিয়োগের বদলে লোকের জন্য পদ তৈরি করা হ'ত। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে এদের ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স ও ধন-সম্পত্তির হিসাব দিতে হয়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে বহু মামলা রুজু করা হয়।

[বিখ্যাত এস. কে. ঘোষের বর্মা-রিফিউজি তছরূপ মামলার আমি একজন প্রধান তদন্তকারী ছিলাম। এক কোটি টাকার এই মামলার সফলতা অর্জন সম্ভব হয়েছিল আমার সংগৃহীত সাক্ষ্য-প্রমাণাদির জন্য। প্রমথেশ বড়ুয়া প্রমুখের সাক্ষ্য সংগ্রহের জন্য আমি বোম্বে পর্যন্ত ছুটাছুটি করেছিলাম।]

আমেরিকা

আমেরিকানরা বাংলাদেশে অর্থের বলে আর-যাই করুক, বিমান হতে ডি-ডি-টি ছড়িয়ে ম্যালেরিয়াবাহী মশককুল ধ্বংস করতে তারা সাহায্য করেছিল। তারা এদেশে বহু পথঘাট পাকা করেছে এবং নিজেদের প্রয়োজনে কিছু পাকা-বাড়ি নির্মাণ করে চলে যাবার সময় সেগুলি রেখে যায়। আগস্ট বিপ্লবকালে তাদের গাড়িগুলি এবং নিজেরা ইষ্টকাঘাতে আহত হলেও তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে নি।

এই মহাযুদ্ধ বাংলার সমাজ-ব্যবস্থায় এক বিরাট পরিবর্তন এনে দেয়। ওই সময় চাকুরিয়া গৃহস্থ-কন্যাদের বহুজনই আর গৃহমুখী হন নি। সেই থেকে ওয়ার্কিং গার্লস (working girls) বাংলায় একটি নতুন উল্লেখ্য পরিভাষা। একশ্রেণী তরুণেরা চাকুরিয়া স্ত্রী চায়। অথচ স্ত্রীরা পরপুরুষের সঙ্গে কথা কইলে স্বামীদের মনে সন্দেহ। মেয়েরা চাকুরি পেলে চাকুরে-ছেলেদেরই বিবাহ করে। তাদের পুত্রকন্যারা মাতৃস্নেহ হতে বঞ্চিত হয়। উভয়ে চাকুরি করার জন্য কোনো-কোনো ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী মহাভোগী। অন্যদিকে বেকার-যুবকদের চাকুরির অভাব হয়।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

বিশ্বরাজনীতি-ক্ষেত্রে অনন্যচরিত্র দেশপ্রেমিক-মহাপুরুষ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর স্নেহভাজন হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। স্থানীয় এলাকার ইনচার্জরূপে আমাকে ও নীহার বর্ধনকে তাঁর এলগিন রোডের বাড়ির উপর নজর রাখতে বলা হয়। সেই বাড়িতে তাঁর অবস্থানকালীন প্রতিদিনই আমরা 'হাজির' লিখে যেতাম।

ফলে তাঁর অন্তর্ধানের সুবিধা হয়। অবশ্য তাঁর প্রতি ভক্তির জন্যই আমাদের এই শৈথিল্য।

নজরবন্দী, শ্রম-দণ্ড বন্দী বা যে কোনো বন্দী পলায়ন মানেই প্রশাসনের ক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতা। এজন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের কোনো- না-কোনো কর্মীর দণ্ড অনিবার্য ছিল। আমরা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যাই। এ ব্যাপারে স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি-কমিশনারেরও যৌথ দায়িত্ব। তাঁকে বহুবার সংবাদ দেওয়ার পর তিনি এলেন এবং বললেন, 'আমি জানি উনি সাধু হয়ে চলে গিয়েছেন।' এত বড়ো অন্তর্ধান-ঘটনার গুরুত্ব সম্বন্ধে আমরা অবহিত ছিলাম, কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই-যে এজন্য জলপথে বা স্থলপথে কোনও জাহাজ উড়োজাহাজ বা ট্রেন থামানো হয় নি। কোনও তল্লাসী হয়েছে বলে শোনা যায় নি। এমন-কি কাউকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদও করা হ'ল না।

[বিঃ দ্রঃ—ছত্রপতি শিবাজী নজরবন্দী-দশা থেকে পালিয়ে যাবার পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মোগল-রক্ষীরা দেশের বিভিন্ন স্থানে ঢোল পিটিয়ে ওই সংবাদ প্রচার করেন। কিন্তু আমরা তাঁর অন্তর্ধানের ২৪ দিন পরেও কোনরূপ প্রচার-প্রচেষ্টা করিনি।]

একদল ইংরাজ মনে করতেন নেতাজী ভারতে থাকলে তাঁদের পক্ষে বিপদজনক। অন্যদলের ধারণা, তাঁর ভারতের বাইরে যাওয়াই ক্ষতিকর। জনৈক ইংরাজ-সহ-কর্মী একদিন আমাকে বলেন, 'সুভাষচন্দ্র পালিয়ে গিয়েছেন।' প্রত্যুত্তরে আমি জানাই : 'ঠিক কথা। তবে তাঁর পূর্বে আরও দুজন পালিয়েছিলেন।' একজন ছত্র-পতি শিবাজী। ফলে, মোগল-সাম্রাজ্যের পতন। দ্বিতীয়জন মহামতি লেনিন। ফলে, রুশ-সাম্রাজ্যের পতন। আমার মনে হয়, সুভাষচন্দ্রের পলায়নেরমধ্যে ইতি-হাসের সেই ধারার ইংগিত সুস্পষ্ট, তাঁর দ্বারা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের পতন হবে।'

আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃবর্গকে দিল্লিতে এনে ঐতিহাসিক বিচারের পর মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু সামান্য অপরাধে বাঙালী বিপ্লবীদের রেঙ্গুনেই ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। শোনা যায়, সমর-নেতারা নেতাজীকে জাপানীদের সাহায্যে ভারতে আসার বিরুদ্ধে পরামর্শ দিয়েছিলেন। নেতাজী বিদেশী জাপসৈন্য-সহ ভারতে পৌছুলে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ভারত অখণ্ড থাকতো। সেই সময় তিনি অগ্র-সর হলেই ব্রিটিশ কলিকাতা ত্যাগ করে পাটনা অথবা রাঁচিতে সরে যেতে প্রস্তুত ছিল। তাঁর অভিযান জার্মান ও জাপানের পরাজয়ের পূর্বমুহূর্তে সংঘটিত হওয়ার জন্য তা ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ—ততোদিনে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী পাল্টা আঘাতের জন্য প্রস্তুত হতে পেরেছিল।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে নেতাজীর সহযাত্রীদের কেউ 'প্লেন-দুর্ঘটনায়' নিহত হলেন

না—হলেন কিনা একমাত্র তিনি। সুভাষচন্দ্র স্বদেশে ফিরে আসুন মিত্রশক্তির তা কাম্য ছিল না। তাঁকে কোনো গুপ্তঘাতক হত্যা করে থাকতে পারে এরূপ সন্দেহও কেউ-কেউ পোষণ করছিলেন। অধিকাংশ জ্ঞানীগুণীর সুচিন্তিত অভিমত যে তিনি এখনও জীবিত।

[বিঃ দ্রঃ—আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রমাণ করে যে ব্রিটিশরা দেশীয় বাহিনীর উপর নির্ভর করতে পারবে না। আমার মতে, তখন দেশের যা পরিস্থিতি তাতে ব্রিটিশরা আরও কিছুদিন দেশীয় বাহিনীর উপর নির্ভর করতে বাধ্য হ'ত। তাছাড়া, হিন্দু-মুস্লিম সাম্প্রদায়িক ভেদ সৃষ্টি করে টিঁকে থাকাব অসুবিধা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে বিশাল ভারত-রক্ষার অর্থশক্তি ব্রিটিশের তখন ছিল না। হিটলার যুদ্ধ না-বাধালে এশীয় দেশগুলি এতো সহজে স্বাধীন হ'ত কিনা সন্দেহ।

সে-সময়ে ইংরাজ ও মার্কিনরা ভেবেছে চেম্বারলিন কিংবা চার্চিলই ভুল করেছেন। জার্মানী ও রাশিয়া উভয়ের যুদ্ধশক্তি ক্ষয় হলে তাদের পক্ষে ভালো হ'ত। শক্তিশালী জার্মানীর কতো প্রয়োজন আজ তাঁরা বোঝেন। সমগ্র জার্মান-জাতিকে একত্রিত করার দাবী হিটলারের ন্যায্য ছিল।]

বিঃ দ্রঃ—সুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তার প্রমাণস্বরূপ বহু গণ-গল্পের সৃষ্টি হয়। তাঁর সিভিলিয়ান পরীক্ষায় প্রদত্ত প্রশ্নোত্তর তরুণদের কণ্ঠস্থ ছিল। যথা:

প্রশ্ন।—ডিফারেন্স বিটুইন প্রিন্স এণ্ড ফুটবল ?

উত্তর।—ওয়ান ইজ থ্রোন টু দি এয়ার, আদার ইজ হেয়ার টু দি থ্রোন।

প্রশ্ন।—ডিফারেন্স বিটুইন স্টেশন মাস্টার এণ্ড স্কুল মাস্টার ?

উত্তর।—ওয়ান মাইণ্ডস দি ট্রেন, আদার ট্রেনস দি মাইণ্ড।

জওহরলালজী সম্বন্ধে এরূপ বহু গণ-গল্প একদা মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছিল। যেমন: তাঁর পরিচ্ছদগুলি ইংলণ্ড হতে কাচিয়ে আনা হ'ত। উনি প্রিন্স অব ওয়েলস-এর ক্লাস-ফ্রেণ্ড ছিলেন। প্রিন্স অব ওয়েলস ভারতে এসে তাঁর খোঁজ করলে তিনি তখন জেলে শুনে ভীষণ ক্রুদ্ধ হন। নেহেরু-পরিবার হতে তার প্রতিবাদ সত্ত্বেও জনগণের মন হতে এই বিশ্বাস মুছে যায় নি।

পিউটিনি ট্যাক্স

আগস্ট আন্দোলনের সময় সর্বপ্রথম পিউটিনি ট্যাক্স প্রবর্তন করা হয়। কোনও স্থানে ঘটনা ঘটলে স্থানীয় প্রত্যেক পরিবারকে জরিমানা দিতে হ'ত। বালিগঞ্জের একস্থানে ঘটনার পর ওই জায়গা থেকে বিশজন তরুণকে গ্রেপ্তার করার হুকুম

হ'ল। কিন্তু—সেখানে সমসংখ্যার অধিক তরুণী পাওয়া গেলেও তরুণ পাওয়া যায় মাত্র দুটি। ওখানকার তরুণেরা তখন যুদ্ধ-উপলক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কর্মরত। বাড়িতে ছিলেন স্ত্রীলোক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরা। তাঁরা বলেছিলেন, 'পিউ-টিনি ট্যাক্স যুদ্ধরত পুত্র···কর্নেলের নিকট আদায় করা হোক।'

আমার কনিষ্ঠ সহোদর ডঃ হিরণ্ময় ঘোষাল পি-এইচ-ডি যুদ্ধের সময় পোল্যাণ্ডের ওয়ারশ' য়ুনিভারসিটির ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি শ্লাভ ফাইলোলজির ডক্টরেট ও য়ুরোপীয় বহু ভাষায় সুপণ্ডিত। তাঁর একদা ছাত্রী ও পরে জীবন-সঙ্গিনী শ্রীমতী হালিনা এম-এ, এম-এল সহ য়ুরোপ হয়ে তুরস্কের মধ্য দিয়ে তিনি ভারতে এসেছিলেন আশ্রয়ের জন্য। তাঁরা আমার গৃহে ওঠার ফলে আমার গৃহেই স্পেশাল ব্রাঞ্চের ওয়াচ বসলো। পরে তাঁকে আমার এলাকার ডেপুটি সাহেব ডেকে পাঠালে তিনি পাল্টা তাঁকেই তাঁর কাছে আসতে বলেন। আমার অসুবিধা হবে বুঝে তিনি সেইদিনই অন্যত্র বাড়ি-ভাড়া নিয়েছিলেন। তাঁর আত্মসম্মান ও ব্রাহ্মণ্যবোধ অসামান্য। য়ুরোপে তাঁকে প্রতি বছর উপবীত পাঠাতে হয়েছে। ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, য়ুরোপে থাকাকালীন তিনি ভারতের স্বাধীনতার দাবী উল্লেখ করে য়ুনিভারসিটিগুলিতে বক্তৃতা দিয়েছেন। অধিকন্তু, এক ইংরাজ-সার্কাস পার্টি পোল্যাণ্ডে কিছু ব্যাঘ্র ও সিংহ সহ দুজন বাঙালী ইণ্ডিয়ানকে দেখানো হবে বিজ্ঞাপন দেওয়ায় তিনি তুমুল প্রতিবাদ করেছিলেন। অগত্যা—আমার মাধ্যমে ইংরাজ-ডেপুটি পত্রদ্বারা তাঁর বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই আহারের নিমন্ত্রণ জানান। কিন্তু ডেপুটি ও তাঁর স্ত্রী উপর থেকে নিচে নেমে এসে তাঁদের অভ্যর্থনা না-করায় প্রতিবাদ স্বরূপ তাঁরা স্বগৃহে ফিরে এসেছিলেন। পরে ডেপুটি-সাহেব পুনরায় নিমন্ত্রণ জানালে তিনি উদাত্তকণ্ঠে বলেছিলেন যে ওঁরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এসে তাঁদের নিয়ে যেতে হবে। ভাষা ও উপভাষাবিদ ভ্রাতাটির কাছ থেকে এও জানতে পারি যে ডেপুটির কথাবার্তার ধরন-ধারণ থেকে স্পষ্ট বোঝা গেছে উনি ওয়েলস-এর বিশেষ এক জেলার জনৈক ধোপার পুত্র। এদিকে ওঁদের মান-অভিমানের চক্রে পিষ্ট হয়ে আমার চাকুরি রাখা দায় হয়ে ওঠে। এই পর্ব চুকে গেলে—আরও উর্ধ্বতন-কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ভ্রাতাটি এ্যাণ্টি-এয়ার-রেডের উপদেষ্টারূপে নিযুক্ত হন।

বিশ বছর পরে ফিরে তিনি দেশীয় আচার-ব্যবহারগুলি সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। য়ুনিভারসিটি থেকে ফিরে এসে একদিন তিনি বলেছিলেন, 'দাদা, বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিতে দেখি এক-একজন মোহান্ত বসে আছেন!' চোখে যা-কিছু অসং-গত ঠেকে তা সংশোধনে তৎপর হন। ঝড়ে হেলে-পড়া গাছটিকেও তিনি সোজা

খাড়া করে দিতে চান। পথচারীকে কমলালেবুর খোলা পকেটে পুরে দূরে ডাস্ট-বিনে ফেলতে উপদেশ দিতেন। কেউ হাঁচলে তাঁকে নাকে হাত বা রুমাল চাপা দিতে বলতেন।

একদিন তিনি আমাকে রেগেই বলেছিলেন, 'দাদা, আর তো এই কেষ্টপেণ্টুর দেশে থাকতে পারি না। আমার শিশুপুত্র দেবদান ও তোমার বৌমাকে নিয়ে য়ুরোপে ফিরেই যাব। মহাজ্ঞানী বুদ্ধদেব সাতটি ঘটনার পর গৃহত্যাগী হয়েছিলেন, আমি মাত্র তিনটি সদ্য-সংঘটিত ঘটনার পরই দিব্যজ্ঞান লাভ করে দেশত্যাগী হবো ঠিক করেছি।' বলে তিনি ঘটনা-ক্রম বিবৃত করলেন একে-একে :

'প্রথম ঘটনা।—প্রতিবেশী কেষ্ট সমবয়স্ক তরুণ পেণ্টুকে সঙ্গে করে এনে বলল, 'স্যার, গত তিন মাসের বিলের দরুণ মাত্র কুড়িটি টাকা জমা না-দেওয়ার জন্য এই পেণ্টুদের বাড়ির ইলেকট্রিক তার কোম্পানির লোক এসে কেটে দেবে।' প্রতিবেশীদের বিপদে সাহায্য করা তো নাগরিক কর্তব্য, অতএব কুড়িটি টাকা আমি ওদের দিলাম সপ্তাহ দুই পরে ফেরত পাবার প্রতিশ্রুতিতে। কিন্তু দুমাস কেটে যাবার পরও ওদের কারুরই দেখা নেই। আমি রেডিওতে প্রোগ্রাম করে যা পাই তাতেই মাসিক একটা বাজেট খাড়া করে দিন কাটাচ্ছিলাম। রাহাখরচ, ডাক্তার খরচ, বাড়ি ভাড়া, বাজার খরচ প্রভৃতি ওই সামান্য টাকা নিঃশেষ হয়ে যেতো। এর মধ্যে পেণ্টুর সঙ্গে বাজারে একদিন দেখা। সে বলল, 'টাকাটা আপনি পান নি? সে কি! আমি তো কেষ্টার হাত-মারফত আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।' গতকাল সকালে পথে কেষ্টার সঙ্গে দেখা হ'ল। সে খুব লজ্জা পেয়ে বলল, 'স্যার, আপনাকে আর কি বলব, পেণ্টু লজ্জা পেয়ে ওকথা বলেছে। প্রকৃতপক্ষে সে এখনও টাকাটা জোগাড় করে উঠতে পারে নি।'

দ্বিতীয় ঘটনা।—শিশুপুত্র দেবদানকে হাসপাতালে দেখানোর জন্য ওর মা হালি-নাকে তৈরি হতে বলে আমি একটা রিকশা ডেকে এনেছিলাম। রিকশাটি আমাদের বাড়ির দোরগোড়ায় অপেক্ষা করছিল। এমন সময় দুই প্রৌঢ়া মহিলা ভিজে-কাপড়ের পুঁটলি-সমেত ওই রিকশায় উঠে বসামাত্র রিকশাওয়ালা তাঁদের নিয়ে চলে গেল। আমার ডেকে-আনা রিকশায় ওঁরা উঠলেনই-বা কেন আর রিকশাওয়ালাই-বা কেন আমাকে কোনো কথা না-বলে গাড়ি টেনে উধাও হ'ল কেন? এরপরেও কি তুমি এদেশে আমাদের থাকতে বলবে?

তৃতীয় ঘটনাটি ঘটেছে আজ সকালে। বেলা আটটার সময় রেডিওতে প্রোগ্রাম করতে হবে বলে বেরুবার জন্যে তৈরি হচ্ছি— দেখি পোল্যাণ্ডে তুষারপাতের মতো গল-গল করে ঘরে কি-যেন ঢুকছে। ব্যাপার কী? বারান্দায় বেরিয়ে এসে নিচে

রাস্তার দিকে তাকাতেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল। এক মধ্যবয়সী ব্যক্তি উদোম-গায়ে ফুটপাতে জাঁকিয়ে বসে ধুনুরী দিয়ে মনের আনন্দে পুরনো তুলো ধুনছে। নিচের তলার বাসিন্দার আহ্বান মতো ছেঁড়া বালিশ ও ছেঁড়া তোষক হতে রাজ্যির তুলো বার করে সে শীতকালের জন্য লেপ তৈরি করবে। তা করুক। কিন্তু ওখানে বসে কেন? আর কি জায়গা নেই? এভাবে ঘরের সামনে বসে তুলো-ধোনার ফলে ফুটপাতের যত ধুলোবালি আর বীজাণু ওঁদের অন্তঃপুরে গিয়ে ঢুকবে। বাতাসে বেগ থাকার জন্যে আমার ঘরেও তার অনুপ্রবেশ ঠেকাতে পারব না। আমি উপরের বারান্দা থেকে চোখে-চোখে তাকিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলাম এভাবে কাজ করা উচিত হচ্ছে না। কিন্তু এ দেশের লোকেদের চোখ দিয়ে কথা বললে একেবারেই বোঝে না— মুখ দিয়ে স্পষ্ট করে বলতে হয়। তাতে রাগারাগির সম্ভাবনা এবং সময় নষ্ট। আমার হাতে অত সময় ছিল না। আমি লোকটিকে ক্ষমা করে আমার কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম এবং ঠিক করে ফেললাম যে এদেশে আর-একটা দিনও নয়।'

পরিহাস করে কথাগুলি বললেও তাঁর মর্মবেদনা অব্যক্ত থাকে নি। তিনি প্রথমে বোম্বে তারপর আবার লণ্ডন-অভিমুখে পাড়ি দিয়েছিলেন। চল্লিশটি ভাষায় সু-পণ্ডিত এই ব্যক্তিটিকে এদেশ ধরে রাখার কোনই প্রয়োজন বোধ করে নি।

[দেশ স্বাধীন হলে তিনি মস্কোতে ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি এবং পরবর্তীকালে অন্য একদেশে অ্যামবেসেডারও হয়েছিলেন।]

গভর্নমেণ্ট এই সময়ে বিমান-আক্রমণ এড়াবার জন্যে শহরে নিষ্প্রদীপসহ রাত্রে শ্মশানে শবদাহ বন্ধ করেছিলেন। তাতে ওই কেষ্টবাবু প্রতিবাদস্বরূপ সকলকে জবরদস্তি শবদাহ করতে বলেন। তাঁর প্রস্তাবে কেউ রাজি না-হলে হিন্দু-আচার ও পারলৌকিক-ক্রিয়া রক্ষার্থে তিনি চিতা সাজিয়ে তার উপর শুয়ে নিজেই পুড়তে চাইলে আমরা তাঁকে ধরে থানায় এনেছিলাম।

তিলজলার রবিদাস-এলাকায় এক মসজিদে হিন্দুদের জিদ অগ্রাহ্য করে মুস্লিম-ধর্মের অঙ্গ হিসাবে কোরবানীর ব্যবস্থা আমি করে দিয়েছিলাম। এতে উৎসাহিত হয়ে জনৈক মৌলভী রাসবিহারী-গড়িয়াহাটের মসজিদে গো-কোরবানী করতে বদ্ধপরিকর হন। পিছনে এক লীগ-মন্ত্রীর নির্দেশ থাকা-সত্ত্বেও এই কাজের বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ জানিয়ে তা বন্ধ করেছিলাম। ওই মন্ত্রীর এক দুশ্চরিত্র ভাগি-নেয়কে তাঁর বাড়িতেই অপহৃতা নাবালিকা-সহ গ্রেপ্তার করেছিলাম বলে আমি তাঁর বিরাগভজন হই। তিনি আমাকে চাটগাঁ-অঞ্চলে বদলি করতে চাইলেও জন-বিক্ষোভের ভয়ে শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠেন নি। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

নেতৃত্বে ডঃ কালিদাস নাগ, কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচি, কবি নরেন্দ্র দেব, রায়-বাহাদুর যোগেশচন্দ্র সেন ও অন্যান্য সুধী ব্যক্তিরা আমাকে প্রভূত সাহায্য করেন। ডঃ সুনীতিকুমার তো ওই মৌলভীকে গো-কোরবানী বন্ধ করে অন্য কোরবানীর জন্যে দুটি রামছাগলের দাম ধরে দিয়েছিলেন।

প্রত্যেক ব্যক্তি যাতে যুদ্ধে সাহায্য করতে বাধ্য হয় সেইজন্য পরিকল্পনা-মতো দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করা হয়েছিল। কারণ—একমাত্র যুদ্ধের চাকুরিতে র‍্যাশন-হিসাবে সুলভে খাদ্যলাভ সম্ভব। যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ-শিল্পের প্রয়োজন। তাই শ্রমিকদের খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু—গ্রাম-অঞ্চলের কৃষিজীবীরা হা-অন্ন হা-অন্ন করে শহরে ছুটে এসেছে। চতুর্দিকে নরনারী ও শিশুদের কাতর ক্রন্দনধ্বনি। 'মা, দুটো খেতে দাও গো।' খাবারের দোকানের পাশে ওই কৃষিজীবী নরনারী অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করেছে তবু দোকানের সাজানো খাবার-সামগ্রী তারা লুঠ করে নি। কারখানার শ্রমজীবী-সম্প্রদায় হলে তারা নিশ্চয় লুঠ করতো।

আমরা পুলিশের পক্ষে চাঁদা তুলে স্থানীয় ব্যক্তিদের অগ্রণী করে প্রতি এলাকায় অন্নসত্র খুলতে সাহায্য করি। বাড়ি-বাড়ি মুষ্টিভিক্ষা করে অন্নসত্রের স্থানে এনে খিচুড়ি তৈরি করা হ'ত। চাউলের দাম মণপ্রতি ছ-টাকা ওঠায় নাগরিকেরা বিপন্নবোধ করে। আমরা চাউলের দোকান থেকে উদ্বৃত্ত চাউল সংগ্রহ করে সাধারণের মধ্যে বিতরণ করেছিলাম। আমাদের ও অন্য বহুজনের বাড়িতে রান্না-করা ভাত ওরা গ্রহণ করেছে।

বাংলা-পুলিশকর্মীরা তদন্তের জন্য গ্রামে গেলে গ্রামবাসীরা তাঁদের ঘিরে ধরতো বলে তাঁরা ব্যক্তিগত র‍্যাশন ও অর্থ দান করতেন। তাঁরা স্পষ্টত কর্তৃপক্ষকে বলে-ছিলেন যে খাদ্য ও অর্থ সাথে না-দিলে গ্রামে তদন্তে যাওয়া সম্ভব নয়।

[তৎকালে—চন্দ্রশেখর বর্মন, দিনেশচন্দ্র চন্দ, শিবচন্দ্র চ্যাটার্জি, জ্ঞান দত্ত, বীরেন মুখার্জি, নীহার বর্ধন, খলিলুর রহমন, মহম্মদ মহসীন, অমিয় দত্ত, অবনী গুপ্ত এবং সেই সঙ্গে আমারও যথেষ্ট সুনাম ও খ্যাতি ছিল।]

আমি কয়েকটি দুরূহ মার্ডার, স্মাগলারি এবং চাঞ্চল্যকর বহু গ্যাঙ-কেসের কিনারা করে খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করি। উপরন্তু দাঙ্গা-হাঙ্গামা দমন ও সুষ্ঠু প্রশাসনেও আমার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লিপিবদ্ধ আছে। কর্তৃপক্ষ আমাকে অন্যতম একস্‌পার্ট-রূপে গোয়েন্দা-বিভাগে বদলি করলেন। আমি ওই সময়ে তিনটি থানার ঊর্ধ্বতন-রূপে বহাল ছিলাম। প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম বাধানোর সুবিধার জন্য আমাদের মধ্যে বাছা-বাছা কয়েকজনকে থানা থেকে সরিয়ে আনা হয়েছিল।

[গোয়েন্দা-বিভাগে যুদ্ধোপকরণ উদ্ধারার্থে একটি বিভাগর কর্তৃত্ব আমাকে দেওয়া

হয়। আমি বহু গোপন আড্ডা, ডক ও অন্যান্য স্থান হতে প্রায় দু'কোটি টাকার বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার করি। এজন্য বারে বারে দুর্ধর্ষ স্মাগলারদের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয় এবং তার ফলে একবার গুরুতররূপে আহত হই।
এই ধরনের অন্য একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হ'ল: বিখ্যাত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান গ্যাঙ-কেসের সার্থক তদন্ত ও নিষ্পত্তি। যুদ্ধ-ফেরত প্রায় দুইশত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও ভারতীয় একত্র হয়ে কলিকাতা ও চতুঃপার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে বিভীষিকার সৃষ্টি করে। গাড়ি ও পেট্রল চুরি, ডাঁকাতি ও হত্যা এবং পথ হতে নারীদের তুলে নিয়ে গিয়ে বলাৎকার প্রভৃতি অপকর্ম প্রায় প্রতিদিন ও রাত্রির ঘটনা। গ্রেপ্তার করার পরও তাদের একদল আদালত ও লালবাজার লক-আপ ভেঙে পালায়। তাদের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষকালে আর-একবার আমি সাংঘাতিক আহত হয়েছিলাম।]

হীরেন্দ্রনাথ সরকার, ও-বি-ই

ইনি কলিকাতা গোয়েন্দা-বিভাগের প্রথম ডেপুটি পুলিশ-কমিশনার। স্বাধীনতার পর ইনস্পেক্টর-জেনারেল অব পুলিশ হয়েছিলেন। তিনি পূর্বতন ক্রিমিন্যাল রেকর্ড সেকসনটি ভেঙে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নত করে মোডাস্ অপারেণ্ডাই বিভাগের সৃষ্টি করেন। উত্তর ও দক্ষিণ কলিকাতায় দুটি বাড়ি ভাড়া করে গৃহহীন পুরনো পাপীদের আশ্রয়ের জন্য দুটি জজ-হাউস স্থাপন করেছিলেন। কিশোর-অপরাধীদের জন্য লালবাজারে একটি শিক্ষণ-কেন্দ্রও স্থাপন করেন। এই-সব কাজে আমি তাঁকে সাহায্য করেছিলাম।
[ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলিকাতার নাগরিকবৃন্দ এই উদ্দেশ্যে প্রিজনারস এইড-হাউস তৈরি করেছিলেন। এটিকে 'চোর-হাউস' বলা হ'ত এবং এখানে জেল-ফেরত লোকেরা আশ্রয় পেতো ও বাড়ি ফেরার রাহা-খরচ নিতো। স্বাধীনতার পর এটি পুনর্জীবিত হলে গভর্নমেণ্ট ওই সংস্থার একজন এক্সপার্ট মেম্বাররূপে আমাকে মনোনীত করেন। ওই সময় দিল্লিতে সর্বভারতীয় সোস্থাল-ওয়েলফেয়ার কনফারেন্সে যোগদানের জন্য এই রাজ্যের পক্ষে মনোনীত ডেলিগেটরূপে আমাকে পাঠানো হয়।]
উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষদের ত্রৈমাসিক সভায় আমি প্রস্তাব রাখি যে, গ্রামে-গ্রামে রিক্রুটিং পার্টি পাঠিয়ে বাঙালী কৃষকদের মধ্য হতে কলিকাতা-পুলিশের জন্য কনস্টেবল সংগ্রহ করা হোক। অনেকেই বাঙালী-কনস্টেবল নিয়োগের বিরুদ্ধে অভিমত

প্রকাশ করেন, কিন্তু হীরেন্দ্র সরকার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমার প্রস্তাব সমর্থন করে মন্তব্য করেছিলেন : 'আমরা আর কতোকাল বহিরাগতদের দিয়ে প্রশাসন চালু রাখবো ?' দৈহিক উচ্চতার প্রশ্ন উঠলে আমি তাঁদের বলেছিলাম, তাহলে গুর্খাদের ভর্তি করা হচ্ছে কেন ?

যুদ্ধোদ্যমে সাহায্যের জন্য তাঁর নেতৃত্বে আমি ও সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জি কলিকাতার বণিক-সম্প্রদায় ও অন্যান্য নাগরিকবৃন্দের নিকট থেকে রেডক্রসের জন্য বাৎসরিক দু-লক্ষ টাকা চাঁদা তুলেছিলাম। হায়, এতোসত্ত্বেও আমরা ইংরাজ-প্রভুদের পক্ষ-পাতিত্ব নিবারণ করতে পারি নি !

পঞ্চম অধ্যায়

উদ্দেশ্য সিদ্ধির ক্ষেত্রে শোভান সাহেবকে প্রতিবন্ধক বুঝে দোহা সাহেবকে তাঁর স্থলে কলিকাতায় ডেপুটি-কমিশনার করে আনা হ'ল। কিন্তু এঁকেও আমি উগ্র সাম্প্রদায়িক বলতে রাজি নই। এঁকেই আবার পরে বহু বদনামের ভাগী হতে হয়েছিল।

অন্যদিকে—প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম বা মহাদাঙ্গার নায়ক জনাব নাজিমুদ্দিন হলেও সুরাবর্দি সাহেবকে তার জন্য দায়ী করা হয়। ইংল্যাণ্ডে অবস্থানকালে নাজিমুদ্দিন সাহেব ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর ভারতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম শুরু হবে। সুরাবর্দি সাহেব তৎকালীন অবস্থার ক্রীড়ানক হতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি পূর্ব-মত হতে ফিরে এসে বাংলাকে অখণ্ড রাখার মানসে গান্ধীজীরও শরণ নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সময়কার গণ-উন্মাদনায় তাঁর ও শরৎচন্দ্র বসুর সকল শুভ-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

[সকলেব ভয় হয় যে তাহলে বিহার ও অন্যান্য রাজ্য হতে মুস্লিমদের এনে পশ্চিমবঙ্গকেও মুস্লিম-প্রধান করা হবে এবং হিন্দু-বাঙালীদের উদ্বাস্তু করে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পাঠানো হবে। বাঙালীরা নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে থকেবে।]

কেবলমাত্র জিন্না সাহেবকে সর্ববিষয়ে দায়ী করা অন্যায়। ঐতিহাসিক কারণে দাহ্য উপাদান সমূহ স্তূপীকৃত অবস্থায় ছিল, তিনি তা উদ্বেলিত করে অগ্নিসংযোগ করেছিলেন। ভুল ইতিহাস পঠন-পাঠনই ভ্রান্ত-ধারণার জন্য দায়ী। বহিরাগত ধর্মান্ধ ও বিদ্বেষপরায়ণ মুষ্টিমেয় মুস্লিম-সম্প্রদায়ের কার্যকলাপ দেখে সকল দায়িত্ব-ভার ধর্মপরায়ণ বিপুল-সংখ্যক মুস্লিম-সমাজের উপর ন্যস্ত করে তাঁদের অযথা দোষারোপ করা হ'ত। অথচ ধর্মপরায়ণ গরিষ্ঠ মুস্লিম-সমাজকে তাঁদের পূর্ব-পুরুষদের বীরত্ব ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে অবহিত না-করে বরং বঞ্চিত করা হয়েছে।

সেই সময় এক অদ্ভুত মতবাদ প্রচারিত হতে থাকে: বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমান দুই পৃথক জাতি। কিন্তু ভিন্নভাষী ও ভিন্নরক্ত হওয়া সত্ত্বেও পাঞ্জাবি শিখ ও পাঞ্জাবি মুস্লিম একজাতি। অথচ খৃষ্টান হলেও জার্মান ও ইংরাজ দুই জাতি। সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার জন্য উভয় সম্প্রদায়ই শিকার হয়েছিলেন। এই সুযোগে ইংরাজরা সাম্রাজ্য-রক্ষার শেষ হাতিয়ার হিসাবে কলকাতায় মহা-

নিধনযজ্ঞ তথা গ্রেট ক্যালক্যাটা কিলিঙের ব্যবস্থা করলেন। সেজন্য দীর্ঘদিন যাবৎ নির্লজ্জের মতো তাঁদের প্রস্তুত হতে হয়েছিল। নিম্নে তার একটি ক্রমিক-তালিকা পেশ করা হ'ল।

প্রস্তুতি-পর্ব

এক. কলিকাতা-পুলিশের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ডেপুটি পুলিশ-কমিশনারদের নিজস্ব এজলাস 'রিপোর্ট সিস্টেম' বাতিল করা হ'ল। একমাত্র আমি সংশ্লিষ্ট পুলিশ-সভায় এর প্রতিবাদ করি। আমাকে সমর্থন জানান বাংলা-পুলিশ থেকে সদ্য-আগত ডেপুটি কমিশনার দোহা সাহেব। তখনও পর্যন্ত ষড়যন্ত্রের মধ্যে না-থাকায় তিনি উর্ধ্বতন-কর্তৃপক্ষদের ওই সভায় বলেছিলেন: 'কলকাতা-পুলিশে এই সিস্টেমটাই সবচেয়ে ভালো জিনিস।' জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী হবে জেনেও কমিশনারগণ ওটা বাতিল করবার জন্য গভর্নমেন্টের কাছে প্রতিবেদন পাঠালেন।

[বিঃ দ্রঃ—প্রশাসনিক অদল-বদল সুবিবেচনার সঙ্গে না করলে প্রভূত ক্ষতি হয়। এই ভুল লক্ষ্মণসেন প্রথম করেছিলেন মহাসামন্ত পদগুলি বিলোপ-সাধন করে। ফলে তদারকির অভাবে অধীনস্থ সামন্ত-রাজারা তাঁর আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিলেন। এই ভুল বহুদিন পরে কলিকাতা-পুলিশের 'রিপোর্ট সিস্টেম' বাতিল করে দ্বিতীয় বার করা হ'ল। ফল হ'ল এই-যে পুলিশের উপর থেকে জনগণ আস্থা হারালো। দৈনিক তদারকির অভাবে অসাধুতা ও স্বেচ্ছাচারিতা বেড়ে যায়।]

দুই. থানাওয়ারী সিভিক-গার্ডদের হঠাৎ বাতিল করা হ'ল। এদের ভিতরকার হিন্দু ও মুস্লিম সদস্যরা অসাম্প্রদায়িক ছিল। এরা পল্লীতে-পল্লীতে সক্রিয় থাকলে কোনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কিছুতেই হতে পারতো না। যুদ্ধ বন্ধ হলেও এদের স্থায়ী করার যে প্রস্তাব ছিল তা অগ্রাহ্য করে সকলকেই বাতিল করা হয়।

[এদের বিদায়-সভায় পুলিশ-কমিশনার যে ভাষণ দেন সেটি আমি ইংরাজী হরফে বাংলা ভাষায় লিখে দিয়েছিলাম।]

তিন. থানা-ইনচার্জদের মধ্যে তখনও অধিকাংশ হিন্দু। বহু মুস্লিম অফিসারকে দ্রুত ভর্তি করা হলেও তখনও তারা জুনিয়র। সিনিয়রদের টপকে তো তাদের ইনচার্জ করা যায় না সেজন্য প্রতি তিনটি থানার উপর একজন ডি. ডি. ওয়ান ইনস্পেক্টরের পদ সৃষ্টি করা হ'ল। বাহ্য উদ্দেশ্য—অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ও ইনভেস্টিগেশন পৃথক করা। কিন্তু মহাদাঙ্গার মধ্যেই এই অবান্তর ডি. ডি. ওয়ান প্রথা বাতিল করা হয়। হিন্দু অফিসারদের প্রমোশন দিয়ে গোয়েন্দা-বিভাগের ইনস্পেক্টর কিংবা

উপরোক্ত ডি. ডি. ওয়ান ইনস্পেক্টর করে থানা হতে সরিয়ে প্রায় প্রতি শূন্যস্থানে জুনিয়র মুস্লিম কর্মীদের ইনচার্জ করা হয়েছিল। স্বল্পকালীন চাকুরির জন্য স্বভাবতই এরা অনভিজ্ঞ। অন্তত মহাদাঙ্গা থামানোর মতো অভিজ্ঞতা এদের কারোরই ছিল না।

[কিন্তু তখনও কলিকাতা-পুলিশে কোনও সাম্প্রদায়িক বোধ অংকুররূপেও দেখা দেয় নি। সমগ্র পুলিশ-বাহিনী নিজেদেরকে পৃথক পুলিশ-সম্প্রদায় বলে মনে করতো।]

চার. উপরোক্ত কারণে বিহার ও পাঞ্জাব হতে বহু মুস্লিম-অফিসার এবং সেই সঙ্গে সশস্ত্র পাঠান পুলিশ-বাহিনীকে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে কলিকাতা-পুলিশ-বিভাগে আমদানী করা হ'ল। কারণ আর-কিছু নয়, বাঙালী মুস্লিম পুলিশ-অফিসারদের অনেককেই সংশ্লিষ্ট পক্ষ বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। দোহা সাহেবকে লালবাজারে অতিরিক্ত হেড কোয়ার্টারস-এ ডেপুটি করা হ'ল। এই পদটি তখনই প্রথম তৈরি করা হয় এবং দাঙ্গার পর বাতিল করা হয়।

পাঁচ. ট্রাম-কোম্পানীর অনুকরণে লালবাজারে প্রথম কণ্ট্রোল-রুম স্থাপিত হ'ল। ইনচার্জদের বলা হ'ল যে কণ্ট্রোল-রুম থেকে হুকুম না-এলে কোথাও যেন ফোর্স পাঠানো না হয়। উদ্দেশ্য—ঠিক সময়ে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা। অধিকাংশ হিন্দু অফিসর ও অন্য কর্মীদের কণ্ট্রোল-রুমে এনে জড়ো করা হ'ল।

উদ্যোগ-পর্ব এইভাবে পরিকল্পনা-মতো সুসম্পন্ন করা হয়। কিন্তু—সকল ঊর্ধ্বতন ইংরাজ-অফিসার এতে সম্মতি দেন নি। তাঁরা একে-একে ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

কমিশনার ফেয়ার-ওয়েদার সাহেব হঠাৎ চলে গেলে তাঁর স্থলে রে (Rey) সাহেব স্বল্পকালের জন্য আসেন। তাঁর পরে পুলিশ-কমিশনার হয়ে এলেন হার্ডিক সাহেব। কার্য উদ্ধারের জন্য এঁকেই উপযুক্ত ব্যক্তি মনে করা হয়। অন্যদিকে—দরদী অস্ট্রেলিয়ান গভর্নরকে বিদায় দিয়ে তাঁর স্থলে বারোজ সাহেবকে নিযুক্ত করা হ'ল।

এতকাল কলিকাতা উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগে বিভক্ত ছিল। এবার মধ্য বিভাগ সৃষ্টি করে একজন মুস্লিম ডেপুটির অধীন করা হ'ল। উত্তর বিভাগটি পূর্ব হতেই জনৈক মুস্লিম ডেপুটির অধীন ছিল।

কলিকাতায় মহাদাঙ্গা বাধানোর অন্য একটি উদ্দেশ্য ছিল। সম্ভবত সমগ্র ভারতে ওঁরা অনুরূপ একটি দাঙ্গা বাধাতে চেয়েছিলেন। তৎপূর্বে ফিলার (Feeler) দ্বারা তার ফলাফল বোঝাবার জন্য ল্যাবরেটেরি পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। কলি-

কাতা শহর বস্তুত একটি মিনিয়েচার ইণ্ডিয়া, এখানে হিন্দু-মুসলমান-শিখ-খৃস্টান-বৌদ্ধ-অচ্ছুৎ প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের বাস। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের নিজস্ব সংস্কৃতি ও কৃষ্টির বিচিত্র সমন্বয় সাধন এই শহরেই। বিশাল ভারতের সামান্যতম ভূ-ভাগ এই শহরে সত্তর ভাগ হিন্দু এবং তিরিশ ভাগ মুস্লিম বাস করে। এজন্য শহর-সীমানার বাইরে হাওড়া ব্যারাকপুর ও বারাসাত প্রভৃতি স্থানে দাঙ্গা বাধে নি। পরীক্ষা দ্বারা কর্তৃপক্ষ বুঝতে চাইছিলেন যে সঙ্ঘবদ্ধ প্রস্তুতিপূর্ণ লড়াকু মুস্লিম সংখ্যা-লঘুর আক্রমণ অন্যপক্ষ কতো শীঘ্র প্রতিরোধে সমর্থ হয়। ওই বিপদে হিন্দু-শিখ-মাদ্রাজী-ওড়িয়া-মারাঠী প্রভৃতি অ-মুস্লিম সম্প্রদায় একত্রিত হয় কিনা! সমগ্র দেশব্যাপী দাঙ্গা বাধালে তার ফলাফল বুঝতে এটি তাঁদের জরুরি পরীক্ষা।

কলিকাতা দাঙ্গার ফল প্রভুদের আশানুরূপ হয় নি। হিন্দুরা বারো ঘণ্টার মধ্যে প্রতিরোধ-দল তৈরি করে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়। হিন্দু শিখ বাঙালী মারাঠী মাদ্রাজী গুজরাটী প্রভৃতি সকল হিন্দু এক হয়। অন্যদিকে—বাঙালী মুস্লিমরা উসকানি সত্ত্বেও সক্রিয় অংশ নিল না। বিপাক বুঝে ব্রিটিশ এই মহাদাঙ্গা থামাতে শহরে মিলিটারি নামালেন। এও স্থির করলেন যে তাহলে দেশটা বিভক্ত করতে হবে। তাঁরা পরিষ্কার বুঝতে পারলেন যে হিন্দু-মুস্লিম পরস্পরকে লড়িয়ে দিয়ে সাম্রাজ্য রক্ষা আর সম্ভব নয়। লীগ-নেতারা ব্রিটিশ ও মুস্লিমদের সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে হিন্দুদের জয়ী হতে দেখে, শংকিত হয়ে, পাকিস্তানের দাবিতে আরও স্বোচ্চার হলেন। রাজনীতিকে ধর্মান্ধতার পংকিল আবর্তে ডুবিয়ে তখন এক নতুন মানসিকতার সৃষ্টি করা হয়েছিল।

জনৈক কায়স্থ অফিসর

দুজন মুস্লিম-কর্মী অফিস-বিলডিঙের একস্থানে হঠাৎ নমাজী হয়ে জায়গাটিকে নমাজের স্থান করে নিয়েছিল। উক্ত অফিসর-ভদ্রলোক একদিন তাঁর সহকারী মুস্লিম-কর্মীটিকে বললেন, 'এতদিন যা হয় নি তা করতে আমি দেবো না। অফিসের সময়ে পুলিশ-কর্মীদের এই ওজুহাতে ঘুরে বেড়ানোও চলবে না।' সহকর্মীটি ইংরাজ-কমিশনারের নিকট তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। ইংরাজ-কমিশনার অফিসারকে ডেকে ধমক দিয়ে বললেন, 'আপনার জানা উচিত, কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করলে আমরা তা বরদাস্ত করব না।' তিনি মাথা হেঁট করে ফিরে এলেন।

কিন্তু কায়স্থ বুদ্ধি!—পরদিন তিনি অফিসে এসে দুপুরবেলা ইউনি-ফর্ম ছেড়ে পট্ট-বস্ত্র ও নামাবলী পরিধান করলেন এবং টেবিলের উপর রাখা কোষাকুষি হতে

গঙ্গাজল ছিটিয়ে কুশাসনে উপবিষ্ট হয়ে জোরে-জোরে মন্ত্র আউড়ে পূজা শুরু করে দিলেন : 'ওঁ। ভূরভূরবো ওঁ।' অফিসে মন্ত্রোচ্চারণ শুনে সকলে দৌড়ে এলেন। তিনি তাঁদের যেতে বলে ঘোষণা করলেন, 'খবরদার! আমার মধ্যাহ্ন-আহ্নিকের সময় বিরক্ত করো না। ওঁ ভূরভূরবো ওঁ···।' তাঁকে কমিশনার-সাহেবের কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি পালটা অভিযোগ করে বলেছিলেন, 'স্যার, এঁরা আমার ধর্মে হস্তক্ষেপ করেছে। আপনি বিচার করুন।'

কমিশনার-সাহেব সব-কিছু বুঝতে পারলেন, হেসে বললেন, 'তোমরা ভুলে যেও না যে তোমরা হাজার-হাজার বছরের সভ্যতার উত্তরাধিকারী।' অবশ্য এ-কথাও তিনি তাঁকে বলেছিলেন যে এই সাহস অন্যত্র দেখালে উনি কনডেমেনড ও সাসটেন-ডেনড না-হয়ে পুরস্কার পেতেন।

[একবার এক কনস্টেবল নিহত হলে অন্য কনস্টেবলরা ক্ষেপে গিয়ে সংশ্লিষ্ট বস্ত্রের দোকানটি লুঠ করে। তাতে ইংরাজ ডেপুটি-কমিশনার স্বয়ং থানা-বাড়ি ও কোয়ার্টার-গুলি তল্লাসী করেন। এক কনস্টেবলের কক্ষে ঢোকামাত্র ডেপুটি-সাহেব চিৎকার করে পিছিয়ে গিয়ে বলেন, 'পুট অন ইওর ক্লথস্ ।' কনস্টেবলটি নাঙ্গা অবস্থায় পিস্তল ও মদের বোতল হাতে নিয়ে তাঁকে বলেছিলেন, 'উঁহু প্রাইভেট কোয়ার্টার-এ এভাবেই আমার থাকা অভ্যেস।']

বস্তুত, দেশ-বিভাগের পূর্বে অফিসের টেবিলগুলি পর্যন্ত বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তবে সৌভাগ্যের বিষয়, তখনও জাতিধর্ম-নির্বিশেষে বহু পুলিশ-কর্মী অসম্প্রদায়িক ছিল। প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম শুরু হওয়ার পর কিছু ক্ষেত্রে এই মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে।

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম

ছুটি ঘোষণা করায় মুস্লিমরা গড়ের মাঠে বিরাট সভার আয়োজন করলো। হিন্দুরা আতংকগ্রস্ত হলেও সাংঘাতিক কিছু ঘটার আশংকা করে নি, সেজন্য কোনও রকম প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজনও বোধ করে নি। আমরা গোয়েন্দা-বিভাগের কর্মী হওয়ায় আমাদেরও ছুটি। রসা রোডের বার-বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিলাম একটি মুস্লিম প্রসেশন ঝাণ্ডা উঁচিয়ে মাঠের দিকে চলেছে আর ক্ষুদ্র এক উৎসুক হিন্দু জনতা তার পিছন-পিছন। মিছিল থেকে ধ্বনি উঠছিল : 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান।' অনুসরণকারী হিন্দু-বালকেরা উত্তর দিচ্ছিল : 'নেহী দেঙ্গে পাকিস্তান। নেহী দেঙ্গে পাকিস্তান।' বস্তুত পাকিস্তান শব্দটিই তখন হিন্দু বাঙালীকে প্ররোচিত

করার পক্ষে যথেষ্ট। মাত্র এক পুরুষ পূর্বে এই হিন্দুরাই বঙ্গ-ভঙ্গ রদের জন্য প্রাণপাত করেছে। সেদিনের স্মৃতি কি সহজে কেউ বিস্মৃত হয়?

মিছিল দূরে চলে গেলে হঠাৎ একটা লণ্ড-ভণ্ড কাণ্ড নজরে পড়লো। পথচারীদের মধ্যে সন্ত্রস্ততা। বহুলোককে এদিকে-ওদিকে ছুটতে দেখি। ব্যাপার কি বুঝতে পারি নি। শহরের প্রতিটি মহল্লা শূন্য করে মুস্লিম জনতা মাঠে জমায়েত হয়। সেখানে লীগ-মন্ত্রীবৃন্দ ও মুস্লিম নেতৃবর্গ যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন খবরের কাগজে তা প্রকাশ পায় নি। কোনও স্পেশাল ব্রাঞ্চ বা অন্য কোনও গোয়েন্দা-কর্মী অথবা খবরের কাগজের রিপোর্টররা ওখানে যেতে সাহস পান নি। একমাত্র ভারত-সরকারের গোয়েন্দা-কর্মী প্রফুল্ল মণ্ডল বুদ্ধি করে মাথায় গামছা বেঁধে, লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরে, কোমরে ছুরি গুঁজে যথারীতি বরিশালের বুলি আউড়াতে-আউড়াতে ছদ্মবেশী মুস্লিম সেজে ওখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে স্বল্পসংখ্যকই ওই সভায় যোগদান করেছিলেন। তাঁরা উদ্বেগজনক খবর পাওয়ায় সেই সময় পরিবারবর্গকে অন্যত্র সরিয়ে দিতে ব্যস্ত। আমিও টেলিফোনে কিছু আত্মীয়-স্বজনকে পার্ক সার্কাস অঞ্চল থেকে অন্যত্র সরে যেতে বলি। কারণ পুলিশ ও সৈন্যদল লীগ-গভর্নমেণ্টের আয়ত্তে, তাদের সাহায্য লাভ তখন আশার অতীত ছিল।

লীগ-নেতারা সভাস্থলে উত্তেজনা সঞ্চার করে সরাসরি নির্দেশ দিয়েছিলেন: 'যাও, আপনা-আপনা মহল্লা বাঁচাও। হিন্দুলোক শুরু কর্ দিয়া।' গুণ্ডাদের পারিবারিক প্রীতি অল্প, বরং লুঠপাটের দিকেই তাদের মনোযোগ বেশি। ইংগিত ও নির্দেশ পেয়ে তারা পথের দুধারে দোকানগুলি লুঠ করে আগুন ধরিয়ে এগিয়ে চললো। রাতের অন্ধকারে মহাদাঙ্গা ওরাই শুরু করে দিলে। কমলালয় প্রভৃতি বড়ো-বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলি লুঠের পর চৌরঙ্গীতে বন্দুকের দোকানগুলিও লুণ্ঠিত হ'ল।

চতুর্দিকে শুধু আগুন আর চিৎকার। নারী আর নারীদের করুণ আর্তনাদ। দোকানগুলির দুয়ার ভাঙার খটখট শব্দ আর লুঠেরাদের সহর্ষ উল্লাসধ্বনি। ভয়ার্ত নরনারী থানায় ফোন করলে তাদেরকে লালবাজারে কণ্ট্রোল-রুমে যোগাযোগ করতে বলা হয়। কলিকাতা নিধন-যজ্ঞে যে বর্বরতা দিল্লিতে নাদিরশাহী হত্যা-কাণ্ডকেও লজ্জা দেয়। সুপরিকল্পিত ভাবে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হ'ল। এ অবস্থায় নিয়ম-শৃংখলার অজুহাতে আমরা তিনজন কিন্তু নীরব থাকতে পারি নি।

আমি, হীরেন্দ্রনাথ সরকার ও সত্যেন্দ্র মুখার্জি কলিকাতা-পুলিশের একটি বিশেষ আঁতাতের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। হীরেন্দ্র সরকার ও সত্যেন্দ্র মুখার্জি আমাকে অত্যন্ত

স্নেহ ও বিশ্বাস করতেন। দাঙ্গার মধ্যে এসে ওঁরা দুজন রাত্রিবেলা আমাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়েছিলেন সঙ্গী হিসাবে। কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাকে সমীহ না-করে আমরা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে তখন বেরিয়ে পড়েছিলাম। কখনও প্রধান সড়কে পল্লীর অভ্যন্তরে উল্কার মতো জিপ-গাড়ি ছুটিয়ে গুলিবর্ষণ করে ওই রাত্রিটা যথাসম্ভব সামাল দিয়েছিলাম। এই সুযোগে একপক্ষের অতর্কিত-আক্রমণে বিহ্বল অন্যপক্ষ তৈরি হতে পারলো। আমরা তখন উভয়পক্ষকে তফাৎ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। সারকুলার রোডের পূর্বপার হতে এতক্ষণ ধ্বনি ছিল শুধু—'আল্লা হো আকবর।' এবার পশ্চিমদিক হতে শোনা যেতে লাগল—'বন্দে মাতরম।'

কণ্ট্রোল-রুমে কিছু আগে পর্যন্ত শুধু হিন্দু-নাগরিকদের একতরকফা টেলিফোন আসছিল : 'হ্যালো কণ্ট্রোল-রুম! শীঘ্র আসুন। আমরা মৃত্যু-মুখে। রক্ষা করুন।' লীগ-মন্ত্রীরা কণ্ট্রোল-রুমে বসে নীরবে তা শুনছিলেন। এইবার মুস্লিমদেরও একটানা আহ্বান আসতে লাগল। শুধু তাই নয় টেলিফোনে সকল শ্রেণীর নাগরিকদের করুণ আর্তনাদ। ইংরাজ-কর্তৃপক্ষ তখনও নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকলেও লীগ-নেতারা হতভম্ব। এ কী হ'ল? এ যে প্রবল পাণ্টা আক্রমণ! নিজ-নিজ বাড়ির ভাবনায় তাঁরা বিব্রত হয়ে উঠলেন। যে ঘৃণ্য অপশক্তিকে তাঁরা জাগ্রত করেছেন তার ভয়াবহ প্রসার ও ক্ষয়ক্ষতি সম্বন্ধে বিচলিত। বাস্তবিক উভয় সম্প্রদায় তখন মহা-তাণ্ডবে মেতেছে। আমরা তিনজনে যতদূর-সম্ভব বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে এই তাণ্ডব সংহত করার চেষ্টা করেছি।

[সেই রাত্রে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ফজলুল হক সাহেব ব্যতীত অন্য কোনও লীগ বা কংগ্রেসী নেতাকে আমরা রাজপথে দেখি নি। ওঁরা উভয়ে একত্রে উত্তেজনা শান্ত করার জন্য পথে-পথে ব্যর্থ অনুরোধ করছিলেন। সে-রাত্রে পথে জনগণ কোথায়, শুধু গুণ্ডাদেরই তাণ্ডব নৃত্য। বাঙালী মুস্লিমরা তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না-করলেও বাঙালী হিন্দুদের মতো তাঁরাও যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হন।]

পরদিন কর্তৃপক্ষ সব-কিছু বুঝে হীরেন্দ্র সরকার ও সত্যেন্দ্র মুখার্জিকে কণ্ট্রোল-রুমে আটক করে ফেললো। তার মানে তাঁদের দুজনকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলা হ'ল। আমি বা আমার মতো অনেকের খোঁজ-খবর কেউ আর রাখে না। সেই সময়ে আমি, মহম্মদ মহসীন, নীহার-রঞ্জন বর্ধন ও দিনেশচন্দ্র চন্দ এক-পল্লীতে বাস করতাম। এই চারজনে একত্রিত হয়ে তখন পরামর্শ করলাম। পরামর্শ মতো আমরা চার বন্ধু-অফিসার ব্যক্তিগত য়ুনিফর্ম ও পিস্তলে সজ্জিত হয়ে অধীনস্থ কয়-জন কর্মীকে সংগ্রহ করে এক দল তৈরি করলাম। তারপর শ্রীজয়দাকারের নিকট হতে আটখানি বাস সংগ্রহ করে আমরা শহরে বেরুলাম। আমরা চারদিন ধরে

দিনরাত্র হিন্দু এলাকা হতে মুস্লিমদের এবং মুস্লিম এলাকা হতে হিন্দুদের উদ্ধার করে স্থানান্তরিত করেছিলাম।

পথে-ঘাটে তখন উভয় সম্প্রদায়ের সংখ্যাহীন মৃতদেহ। কাউকে অস্ত্রাঘাতে কাউকে ঠেঙিয়ে মারা হয়েছে। পথ এমন অবরুদ্ধ যে গাড়ি থেকে নেমে মৃতদেহগুলি দুপাশে সরিয়ে তবে এগোন যায়। চতুর্দিকে দগ্ধ গৃহ ও গৃহহীনদের করুণ দৃশ্য। থানাগুলির বেষ্টনীর মধ্যে বহু পরিবার তখন আশ্রয় নিয়েছে।

পথে দুটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখে আমাদের বাসগুলি থামাতে হ'ল। চাঁদনি-মার্কেটের ঘাঁটি হতে মুস্লিম-গুণ্ডারা অতর্কিতে বার হয়ে পথচারী হিন্দুদের ছুরিকাঘাত করে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পথচারীগণ ছুরিকাঘাত সত্ত্বেও যারা জীবিত তাদের হাসপাতালে বহন করছে। প্রতি ঘটনার পর ত্বরিত-গতিতে ঘাঁটিতে ফিরে তারা চিৎকার করে উঠছিল: 'লড়ি তগদীর লড়ি তগদীর।' কিন্তু ওরা ভুল করে বাঙালী মুস্লিমদেরই বেশি ছুরিকাঘাত করছিল। বেশভূষায় বাঙালী মুস্লিম নাকি হিন্দু চেনার ক্ষমতা ওদের ছিল না।

এর ঠিক উলটো দিকের গলির পার্শ্ববর্তী খাটালটি দেহাতীদের একটা ঘাঁটি। কর্পোরেশন স্ট্রীট হতে একজনকে ধরে সেখানে পুরে তারা চিৎকার করছিল: 'ব্রজরঙবলী-কি জয়।' খানিকক্ষণ ধপাধপ শব্দের পর নীরবতা। তারপর একটি করে মৃতদেহ ধর্মতলা স্ট্রীটে ফেলে দিয়ে তারা স্বস্থানে ফিরে যাচ্ছিল।

আমরা এই দুটি ঘাঁটি হতে গুণ্ডাদের উচ্ছেদ করবার জন্য থানায় খবর দিলে কর্তৃপক্ষ আমাদের বলেছিলেন যে কণ্ট্রোল-রুমের হুকুম ছাড়া তাঁদের করণীয় কিছু নেই।

[বালিগঞ্জের যশোদা-বিলডিং ও মিলিটারী কর্তৃক সদ্য-পরিত্যক্ত আরও কয়েকটি বাড়ি তখন খালি পড়েছিল। আমরা বহু হিন্দুকে উদ্ধার করে ওই বাড়িগুলিতে ঢুকিয়ে আশ্রয় দিয়েছিলাম। অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে স্বাধীনতার ক-বছর পরে কর্তৃপক্ষের হুকুমে সেই-সব আশ্রিত জনদের উচ্ছেদ করতে হয় আমাকেই। জনৈকা তরুণী আমাকে তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন যে সেদিন সে একটি ছোট্ট মেয়ে ছিল। আমি তাকে দুহাতে উঁচু করে ধরে লরীতে তুলেছিলাম। এখানে এসে সে একটু একটু করে বড়ো হয়ে এখন কলেজে পড়ছে।]

সুবোধ সাহা নামে এক ব্যক্তি ফুটপাত ধরে হেঁটে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ একজন তার পেটে ছুরি মেরে পিছিয়ে দাঁড়ালো। ভদ্রলোকের নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়ে। তিনি দুহাতে নাড়িভুঁড়ি সামলে ভিতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছেলেন। তাঁর আততায়ী তাই দেখে পুনরায় ছুরি তুললে আমি গুলি ছুঁড়লাম। আহত ব্যক্তিকে তারপর হাস-

পাতালে নিয়ে গেলে তিনি ক্রমে আরোগ্যলাভ করেছিলেন। (ভদ্রলোক প্রতি সপ্তাহে আমার সঙ্গে দেখা করতেন।)

কজন কিশোরের একটি দল ইটের ঘায়ে পড়ে-যাওয়া এক প্রৌঢ় ব্যক্তিকে থেঁটে-লাঠি দিয়ে ঠেঙিয়ে জ্ঞানহারা করে ফেললো। ওদের মধ্যে হঠাৎ একজন বলে উঠলো, 'আরে নড়ছে রে নড়ছে।' তাই শুনে লুঙ্গি ও লাল গেঞ্জি পরা ও কানে বিড়ি গোঁজা এক যুবক এগিয়ে এসে ছুরি বসিয়ে তাকে একেবারে নীরব করে দেয়। কিন্তু লরী হতে নেমে ছুটে ওদের কাউকে ধরতে পারি নি।

অন্যত্র এক জায়গায় দেখি, সমগ্র পরিবারকে ম্যানহোলের মধ্যে পুরে উপরে কর্তা-ব্যক্তিটিকে দাঁড় করিয়ে তাঁর গলায় ঢাকনি পরিয়ে গুণ্ডারা নাচছে আর তাঁর গলা একটু একটু করে কাটছে। এক্ষেত্রেও আমি গুলি করে ওদেরকে উদ্ধার করেছিলাম। ওঁরা বাড়ি ফিরে যাবার পর ওঁদের এক বয়স্কা কন্যাকে ভোগ-দখলের ইচ্ছায় দুদলে কাড়াকাড়ি করছিল। ঠিক সময়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে তাকে আমি রক্ষা করতে পেরেছিলাম।

টেরেটি বাজারের এক মসজিদে হিন্দুদের আশ্রয় দেওয়া হলে কাটাকাটি শুরু হয়ে যায়। কিছু চীনা এসে ওদের উদ্ধার করতে অপারগ হওয়ায় আমরা সেখানে গিয়েছিলাম। মেঝের উপর নিহতদের এমন পুরু রক্ত যে আমাদের জুতোর কিছু অংশ তাতে ডুবে যায়। চীনারা মিশ্র ভাষায় আমাদের কাছে ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলে, 'উনলোক ইনলোককো এইচে এইচে কাট তা। অউর তুম পুলিশ-লোক কুচো দেখতো না।'

মাঝখানে একবার আমরা দাঙ্গার মধ্যে পড়ে যাই। রাজপথে উভয় দিক হতে ঢেউয়ের পর ঢেউ আছড়ে পড়ছে। কিন্তু আমাদের গুলিবর্ষণে ওরা পিছিয়ে যায়। এ রকম জমাট-বাঁধা গুণ্ডা-বাহিনী আগে কখনও দেখিনি। বোঝা গেল উল্টো বোঝানো হয়েছে। মধ্যে-মধ্যে ওদের তাড়া করে আমরা বহুদূর এগোই। তারপর বহু নরনারী ও শিশুকে উদ্ধার করে আনি।

আশ্চর্য এই যে উদ্ধারের সময় মহিলাগণ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সহিত আচারের হাঁড়িগুলি পর্যন্ত সঙ্গে নিতে ভুলতেন না।

এক বাড়িতে এক প্রৌঢ় ব্যক্তি টবের পেয়ারা গাছটি ফেলে কিছুতেই এলেন না। তাঁর বক্তব্য হ'ল ওই পেয়ারা গাছটি প্রত্যহ আট বালতি জলে খেয়ে থাকে। টব নিয়ে তবে তিনি আমাদের সঙ্গে এসেছিলেন।

এতদসত্ত্বেও আমরা কিন্তু মুস্লিম ও হিন্দু পল্লীর বাড়িগুলি সাময়িক একসচেঞ্জের ব্যবস্থা করেছিলাম। মুস্লিম পাড়ায় হিন্দুরা এবং হিন্দু পাড়ায় মুস্লিমরা বাড়ির

বারান্দা থেকে আমাদের দেখে উদ্ধারের জন্ম চেঁচাচ্ছিলেন। আমরা তাঁদের উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়েছিলাম। রাজপথে তখন আমরা ছাড়া কোনো পুলিশ নেই। যত্র তত্র এই কাজে যাওয়া-আসার ফলে আমি বার-কতক ইটের দ্বারা জখম হই। কিন্তু হাসপাতালে না-গিয়ে ক্ষতস্থান রুমাল দিয়ে বেঁধে নিয়েছি। একজন অবসরভোগী পুলিশ-অফিসারকে রক্ষার জন্য একবালপুরে যেতে হয়। সামান্য বিলম্ব হওয়ায় ওই বাড়ির সকল বয়স্ক-পুরুষদের হত্যাকাণ্ড শেষ। বাড়ির মহিলাদের উদ্দেশ্যে আততায়ীরা অবশ্য বলে, 'আপলোককো ডর নেহী। আপলোক যাইয়ে।' একটি মহিলা শিশুপুত্রকে আঁচলের তলায় লুকিয়ে আনছিলেন। ওরা তা বুঝতে পেরে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে মাটিতে আছড়ে মেরে ফেলে। স্বামীপুত্র-হারা মহিলারা ওই শিশুর উপর উপুড় হয়ে পড়েছিল। ঠিক এই সময় আমরা সেখানে উপস্থিত হই ও বাকি পরিবারগুলিকে উদ্ধার করে আনি। ওই মহিলারা প্রতিদিন দুপুরে টালিগঞ্জের বাড়ি-বাড়ি ঘুরতো আর সব-হারানো কাহিনী শোনাতো।

বিঃ দ্রঃ—এজন্য দাঙ্গার পরে পুনর্বাসনকালে পূর্বস্থানে অন্য হিন্দুরা ফিরলেও, স্বামী পুত্র অথবা স্ত্রী-হারাদের স্বস্থানে কোনও দিন ফেরানো সম্ভব হয় নি।

[ভূ-কৈলাসের রাজবাড়ির গড়টি এই সময় বিশেষভাবে কাজে লেগেছিল। ওই গড়ে মুস্লিম-পল্লীর বহু হিন্দু-পরিবার আশ্রয় নিয়েছিল।]

জনৈক মুস্লিম-অফিসারদের স্ত্রীকে সিঁদুর পরিয়ে উত্তর-কলিকাতার এক হিন্দু-অফিসারের স্ত্রী আশ্রয় দিয়েছিলেন। হিন্দু-গুণ্ডারা তা জানতে পেরে বাড়ি ঢুকে গৃহকর্ত্রী হিন্দু-বধূটিকেই বার করে আনছিল। আমরা হঠাৎ ভিড় দেখে গুলি করে গুণ্ডাদের তাড়িয়ে সেই বধূকে উদ্ধার করি।

এক মুস্লিম-গুণ্ডাকে এইখানে খুন করে টাঙিয়ে রাখা হয়। সেই গুণ্ডা এক হিন্দু-বালিকাকে ওভাবে টাঙিয়েছিল বলে এটি ছিল হিন্দু-গুণ্ডাদের পক্ষে চরম প্রতি-শোধ।

জ্যাকেরিয়া স্ট্রীট হতে এই সময় বহু হিন্দুনারী উদ্ধার করা হয়েছিল। কজন শুভ-বুদ্ধি-সম্পন্ন মুস্লিমের সংবাদে ও সাহায্যে এই উদ্ধার-কার্য সম্ভব হয়।

নিজেদের পল্লী টালিগঞ্জে ফিরে এসে দেখি, উন্মুক্ত কৃপাণ-হাতে শিখরা কোথা হতে একদল অর্ধ-উলঙ্গ দেহাতী নারী উদ্ধার করে লরী করে সেখানে এনেছে। রাস্তার দুপাশের বাড়িগুলি থেকে বধূরা তাদের লজ্জা নিবারণের জন্যে শাড়ি ও ব্লাউজ ছুঁড়ে দিচ্ছিল। তাই দেখে স্থানীয় তরুণেরা উত্তেজিত হয়ে কাছেই নবাবদের ঘড়িঘর ও জাহাজ-বাড়ি আক্রমণ করলো। কিন্তু ওই সুরক্ষিত বাড়ি

ছুটি থেকে একসঙ্গে রাইফেল গর্জন করে উঠলো। বহু তরুণ তার ফলে হতাহত হলে কিছু লোক তাদের প্রাইভেট বন্দুক-সহ যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'ল। চতুর্দিকে মুহুর্মুহু রণধ্বনি : 'বন্দে মাতরম্।' অ্যামবুলেন্স-গাড়ি করে একদল আজাদহিন্দ ফৌজ এসে তাদের থামাতে চাইল : 'ক্ষান্ত হোন। আপনারা ক্ষান্ত হোন।' শেষে নবাব-পরিবারের কারো প্রেরিত সংবাদে মিলিটারী ও পুলিশ এসে উভয়পক্ষকে শান্ত করে।

আমাদের বাড়ির গায়ে একটি মসজিদের সিঁড়ির দুপাশে-হিন্দুনারীরা জলপাত্র-হাতে অপেক্ষা করতো। নমাজীরা নমাজ পড়ে বেরিয়ে সেই পাত্রগুলিতে ফুঁ দিতো। এরূপ জল-পড়া ওষুধ নিতে সেদিনও বহু নারী সেখানে এসেছে। হঠাৎ তাদের চিৎকারে ছুটে গিয়ে একদল আক্রমণোদ্যত গুণ্ডার কবল থেকে মসজিদটি আমি রক্ষা করেছিলাম।

এক হিন্দু-ভদ্রলোক বিচলিত-ভাবে দৌড়ে এসে অভিযোগ করলো যে তাঁদের প্রিয় মাংসওয়ালা রহিম বিপদাপন্ন, তাকে রক্ষা করতে হবে। আমি তাকে সপরিবারে বাড়িতে এনে তুললুম, পরে নিরাপদ স্থানে পৌছে দিয়েছিলাম।

এরিয়ান-বেকারীর মুস্লিম-কর্মীদের আশ্রয় দিয়েছিলেন বলে আমার শ্বশুরালয় বিপন্ন। সংবাদ পেয়ে আমি তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে একটা গাড়ি যোগাড় করে ওদের সবাইকে থানায় এনে তুলি।

এক মুস্লিম-ভদ্রলোক আমাকে ডেকে সক্ষোভে বললেন, 'দেখুন ব্যাপার, আমার পিতামহ একদা দুর্গাপূজা করেছিলেন আর আজ হিন্দু-গুণ্ডারা আমার বাড়ি চড়াও হতে চাইছেন।' তাই শুনে মুস্লিম-পল্লী হতে বিতাড়িত এক ভদ্রলোক আক্ষেপ করে বলে উঠলেন, 'তবে শুনুন, আমি নিজে গ্রামে ওদের কবর-স্থান ও বাজারের জন্য এই-সেদিন দুবিঘা জমি দান করেছি। আর আপনি তো জানেন ওরা আজ আমার বাড়ির কি দুর্দশা করেছে।'

কিন্তু এতসত্ত্বেও বহু হিন্দু মুস্লিমকে এবং বহু মুস্লিম হিন্দুকে রক্ষা করতে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করতে কুণ্ঠিত হন নি। আশ্চর্য এই-যে সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ এ-সবের মধ্যে ছিল না। তারা শহরের ব্যবসা-বাণিজ্য অদ্ভুত উপায়ে চালু রেখেছিল। হিন্দু রিকশা ও ঠেলাওয়ালারা মুস্লিম-পাড়ার সীমানা পর্যন্ত মাল বহন করে নিয়ে যেতো আর সেখান হতে মুস্লিম রিকশা ও ঠেলাওয়ালারা সেই-সব মাল মুস্লিম-পল্লীর নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌছে দিতো।

হরেন্দ্রনাথ ঘোষ

ঘুরতে ঘুরতে আমরা মধ্য-কলিকাতার এক মিশ্র পল্লীতে হরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের অফিসে এলাম। ইনিই ইম্‌প্রেসারিও হিসারে উদয়শংকরকে ভারতে নৃত্যশিল্পীরূপে পরিচিত করান। অনুষ্ঠান-সংগঠকরূপে তাঁর তখন বিশেষ খ্যাতি। তিনি আমাদের চা-পানে আপ্যায়িত করে ড্রয়ার খুলে একগুচ্ছ ঘুঙুর বার করে বলেছিলেন, 'দেখ, একটা মিষ্টি জিনিস দেখ।' আমরা তাঁকে এ-অঞ্চলে আর না-আসতে অনুরোধ করলে তিনি সম্মুখে উপবিষ্ট কয়েক ব্যক্তির দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বলেছিলেন, 'আমার এই মুস্লিম-বন্ধুরা থাকতে ভয় কি।' পরে, ওর গলিত মৃতদেহ এক বাক্‌সের মধ্যে পাওয়ায় আমরা স্তব্ধ হয়ে যাই এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি ওর আততায়ীকে খুঁজে বার করব। আমরা তাকে খুঁজে পাই এবং গ্রেপ্তার করি। তার কাছ থেকেই জানতে পারি কিছু খাওয়ানোর অজুহাতে তাঁকে অফিস থেকে বার করে নিরালা স্থানে এনে হত্যা করা হয়। সেদিন আঙুল দেখানো বন্ধুদের একজনই তাঁকে প্রথম ছুরিকাঘাত করেছিল।

বিঃ দ্রঃ—কোনো এক ইংরেজ-মিলিটারী অফিসার একদা আমাকে বলেছিলেন যে এ দাঙ্গার মতো নিষ্ঠুরতা তিনি কোনো যুদ্ধক্ষেত্রেও দেখেন নি। বস্তুত, ভাইয়ে-ভাইয়ে বিবাদের মধ্যেই এরূপ নিষ্ঠুরতা সম্ভব হয়ে থাকে। আমি একবার আহত হয়ে বাড়ি ফিরলে আমার মা-পূজার আসন ছেড়ে উঠে বলেছিলেন, 'ভগবান, পৃথিবী থেকে দাঙ্গা যুদ্ধ কি শেষ হবে না?'

মহাদাঙ্গা কিছুটা প্রশমিত হলে কলিকাতা-পুলিশকে কয়েক সহস্র মৃতদেহ শহর হতে সরাতে হয়েছিল। কোনো হত্যা-মামলা রুজু করা অবাস্তর। পোস্টমর্টম না-করে নামধাম না-জেনে তাদের সৎকার করা হ'ল। পরিবারবর্গের কাছে তারা চিরতরে নিখোঁজ। একদিন ওদের কেউ ফিরবে এই আশায় তাঁরা হয়তো আজও প্রতীক্ষারত।

মুস্লিম-অফিসাররা মৃত ব্যক্তিদের মুস্লিম আর হিন্দু-অফিসাররা হিন্দু উল্লেখ করে নিজেদের খাতা ভর্তি করেছেন। উদ্দেশ্য—নিজ-নিজ সম্প্রদায়ের লোক যে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত তা প্রমাণ করা। তখন কিছু পুলিশ-কর্মী হঠাৎ সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়েছিল। কারণ তাঁদের বহু আত্মীয়-পরিজনও এই দাঙ্গায় নিহত বা ক্ষতিগ্রস্ত। কর্তাদের কেউ-কেউ বোধহয় এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। কোনো হিন্দু পুলিশ-কর্মীর উক্তি: 'স্যার,...মিয়া-সাহেব এতোগুলি হিন্দুকে গুলি করে মেরেছে। আমরাও বেরিয়ে কিছু মুস্লিম মেরে আসি।' শুনে আমি তার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেছিলাম।

শোণিত-স্পৃহা একবার জাগলে শনৈঃ শনৈঃ তা বেড়ে যায়। এক ব্যক্তিকে জানি সে কজন ভিন্ন-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকে কেটে হত্যা করলো। আরও হত্যার উদ্দেশ্তে সে নৌকা চড়াও হ'ল ভিন্ন-ধর্মী মাঝিদের কাটবে বলে। তাদের কাউকে না পেয়ে সে একটা ছাগ হত্যা করলো, তারপর জখম করলো গরু। ইতিমধ্যে তার মাথায় খুন চড়ে যাওয়ায় সে নিজের সম্প্রদায়ের লোকদেরই খাঁড়া নিয়ে তাড়া করলো। তাকে নিরস্ত্র করবার জন্ম স্থানীয় লোকেরা লাঠির ঘায়ে জখম করে তার হাত থেকে খাঁড়া কেড়ে নিতে পেরেছিল।

সেই সময় অলিতে-গলিতে লুকিয়ে থাকা মনুষ্য-শিকারীদের অপেক্ষা করতে দেখে-ছিলাম।

প্রথম-প্রথম বয়স্ক ব্যক্তিরা তরুণদের দ্বারা সম্প্রদায়-বিশেষকে মার-ধোর করতে দেখলে সক্রিয়ভাবে বাধা দিতেন। পরে শুধু ভৎ'সনা করেই কর্তব্য শেষ কর-ছিলেন। অন্য জায়গা থেকে করুণ সংবাদ এলে সক্রিয়তা বিসর্জন দিয়ে নিষ্ক্রিয় হলেন। তারপর কিছুদিন পরে দেখা গেল তাঁরাও তরুণের দলে ভিড়ে গিয়েছেন। আদিম শোণিত-স্পৃহা শনৈঃ শনৈঃ চরিতার্থ হওয়ায় এটি অন্যতম প্রমাণ। উভয় সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে কম-বেশি এটা ঘটেছিল।

অন্তত একটি ক্ষেত্রে অভিযোগ এই-যে পাঞ্জাবি-কনস্টেবলরা হিন্দু-বালক ও শিশুকে গ্রেপ্তার করে লরীতে তুলে মুস্লিম-পল্লীর মধ্যে ছেড়ে দিয়ে এসেছে। পরে ওই বস্তির মাটি খুঁড়ে কিছু নর-কংকাল পাওয়া গিয়েছিল। জনৈক ঘুমন্ত হিন্দু-সিপাই স্বপ্নের মধ্যে আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারটি সত্য হিসাবে গ্রহণ করে রাইফেল-সহ দ্বিতল হতে লাফিয়ে পড়েছিল।

হ্যারিসন রোডের এক বাড়িতে পাঞ্জাবি-সিপাইদের দ্বারা ভদ্রনারীর উপর বলাৎ-কারের সংবাদটির পর বাঙালীরা দেশ-বিভাগে প্রথম মত দেয়। এই সংবাদটি আমরাই শেষরাত্রে খবরের কাগজে পৌছে দিয়েছিলাম।

বিঃ দ্রঃ—আশ্চর্য এই-যে বহু বাড়িতে একাধিক বন্দুক থাকা-সত্ত্বেও সেগুলি ব্যবহারের রীতি তাদের জানা ছিল না। শুধু ভ্যানিটি অফ পজিসনের জন্য তাঁরা অস্ত্রগুলির লাইসেন্স নিয়েছিলেন। বন্দুক থাকতেও তাঁদের সর্বস্ব লুণ্ঠিত হয়। সেই-সব বাড়ির মহিলারা জীবন-রক্ষার পর আমাকে বলেছিলেন, 'দৌলতহীন হয়ে আমাদের বেঁচে থেকে কী লাভ।'

এই দাঙ্গায় প্রমাণিত হয় যে বুলেট অপেক্ষা সটগান বেশি উপযোগী। বুলেটে একজন পড়লে অন্যেরা ছুটে আসে। কিন্তু সটগানের ছররা অনেকখানি স্থান ঘিরে ছড়ায় ও অনেক লোককে একসঙ্গে আহত করে। তার ফলে

লোকেরা একত্রে আহত হয়ে দ্রুত পালিয়ে যায় অথচ কারো জীবনহানি হয় না।

এই মহাদাঙ্গা আর উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ রইল না। ওরা নিজেদের ভুল বুঝে সংবিত ফিরে পেয়ে আত্মস্থ হয়েছে। এবার উভয় সম্প্রদায়ের গুণ্ডাদের মধ্যেই শুধু তা সীমাবদ্ধ হ'ল। এরা পরস্পর-বিরোধী সম্প্রদায়ের দ্রব্যাদি লুঠ করে, কিন্তু স্ব-সম্প্রদায়ের গৃহ লুঠ করতেও তাদের বাধে না। এই গুণ্ডাদের ভরণপোষণের অর্থ না-যোগানের ফলে ওরা অনর্থ বাধায়।

মিলিটারী নামানোর পরও দাঙ্গা না থামায় মুখ্যমন্ত্রী রাত্রে রেডিও-যোগে জনগণকে এবার ক্ষান্ত হতে বলেন, 'কার দোষ তা পরে বিচার করা যাবে, এখন দয়া করে এই সভ্যতা-বিধ্বংসী দাঙ্গা বন্ধ করুন।' পরদিন প্রত্যুষে এক জাতীয়তা-বাদী সংবাদ-পত্রে এই শিরোনামায় সম্পাদকীয় বেরোয়: 'ফাঁসির আসামী কথা বলিতেছে।' একালে মুশ্লিম পত্রিকা 'আজাদ' এবং অন্য পত্রিকাগুলি পরস্পর সম্প্রদায়কে দায়ী করে লোমহর্ষক ঘটনাসমূহ প্রকাশ করছিল। পরে আবার তাঁরাই পারস্পরিক বন্দোবস্ত মতো সংবাদ বাছাই করে প্রকাশ করলে উত্তেজনার উপশম হয়।

তবে এই হিন্দু-মুশ্লিম দাঙ্গা উভয় পল্লীর এলাকায় সীমাবদ্ধ থেকেছে। ফলে, যা-কিছু লড়াই রাস্তার এপারে-ওপারে। এ্ পল্লীর তরুণ অন্য পল্লীতে গেলে তার নিশ্চিত মৃত্যু। ওরা সকলেই বাঙালী ও ধর্মে হিন্দু হলেও শুধু রাজনৈতিক মত-বাদে পৃথক।

পূর্বে যে হিন্দুরা মুশ্লিম-পল্লী ভয়ে এড়িয়ে যেতো তারাই আবার নিরাপত্তার কারণে ওই পল্লীতেই বাড়ি খুঁজেছে। হিন্দুপল্লী অপেক্ষা মুশ্লিম ও খ্রীশ্চান এবং অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পল্লীতে তারা নিরাপত্তা পেয়েছে। হিন্দু-মহিলারা এই-সব স্থানে বরং নিরাপদে চলাফেরা করেছে।

এই কালে জীবনের মূল্য আরও কমে গিয়েছিল। খুনের নেশায় বহু তরুণ হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। গভর্নমেণ্ট বদলের পর পুলিশেরও মরাল বলে কোন বস্তু ছিল না। তারা নিজেরাই তখন প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত। থানায় ফোন করলে উত্তর পেয়েছিলাম: 'স্যার, জায়গাটা বড্ড খারাপ।' আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সৈনিক-দের কর্তব্য-ভীতি দেখে আমরা অবাক হয়ে গিয়েছি।

ততোদিনে কলকাতা মহানগরী তিন ভাগে বিভক্ত: হিন্দু পল্লী, মুশ্লিম পল্লী ও মিশ্র পল্লী। প্রথমোক্ত দুটি পল্লীতে দাঙ্গা থামলেও মিশ্র পল্লীগুলিতে তা অব্যাহত ছিল। হিন্দু ও মুশ্লিম পল্লীর অধিবাসীরা মিলেমিশে বহিরাগতের আক্রমণ এক-

সঙ্গে রুখেছে। অন্যপক্ষে, মিশ্রপল্লীতে মুস্লিমরা তখনও ছুরি শানাচ্ছে আর হিন্দুরা পাইপগান ও বোমা তৈরি করছে। সারারাত্রি সেখানে পটপট আওয়াজ আর চোরাগোপ্তার আঘাত-জনিত আর্তনাদ। পুলিশ বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ইঁটের সন্ধানে ছাদ তল্লাসী করতো। এজন্য বাড়ির ছাদগুলিতে ইট দিয়ে ঘিরে তুলসী-মঞ্চ তৈরি করা হয়। বাড়ি আক্রান্ত হলে মেয়েরা ওই মঞ্চ ভেঙে ইট ছুঁড়তো। স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে পরিবারের সবাই তখন একটি যুদ্ধবিদ জাতিতে পরিণত। মিশ্র-পল্লীগুলিতে তখন জাতি-বর্ণ ও ধনী-নির্ধনী ভেদ নেই। বিপদ-কালে বস্তি-সুদ্ধ সবাই স্বধর্মী ধনীর গৃহে সাদরে স্থান পেয়েছে। সকলেই এক হিন্দু জাতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে এ বাড়ির মেয়েরা বিপদের দিনে অন্য বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। এইভাবে একটি নতুন সমাজ-ব্যবস্থা তখন গড়ে উঠেছিল।

[পুলিশ তার করণীয় কর্তব্য-কাজ না-করলেও পল্লীগুলিতে প্রাইভেট-পুলিশ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তাদের ভরণপোষণের জন্য চাঁদা উঠতে থাকে। পল্লীর বাতিল-তরুণেরা সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়। পুলিশের খাতায় তারা প্রতিরোধী দল বা রেজিসটেন্স গ্রুপ রূপে চিহ্নিত হ'ল।]

বিঃ দ্রঃ—দাঙ্গার অবসানে স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের গুণ্ডাদের আর প্রয়োজন থাকে নি। পূর্বের মতো তাদের আর-কেউ আদর করে না। এই-সব লোকেদের দাঙ্গা-পরবর্তীকালে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেই। প্রকৃতপক্ষে গুণ্ডা ও পুলিশের কোনো জাত থাকে না। কিছু পুলিশ-কর্মী স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের গুণ্ডাদের আস্কারা দিয়ে এমন-কি তৈরি করে-ছিল। কিন্তু পরে তাদের দমন করতে তারা বিব্রত হয়ে পড়ে। স্বাধীনতার পর এরা দারুণ সমস্যা সৃষ্টি করে।

গোপালবাবু ও রামবাবু তখন জনগণের রক্ষাকর্তারূপে বিবেচিত ছিলেন। পরে অভিযোগ হয় যে আমি ও সত্যেনবাবু তাদের দুজনকে তৈরি করেছি। এ অভি-যোগ আমরা স্বভাবতই অস্বীকার করি। এই বিশিষ্ট ভদ্রলোকদ্বয় জনগণের স্বার্থেই তরুণদের সংগঠিত করেছিলেন।

তৎকালে নিয়ম ছিল এই-যে কোনো জায়গায় বোমাবাজী বা অনুরূপ ঘটনা ঘটলে সেখানকার কিছু ব্যক্তিকে দোষী না-হলেও নির্বিচারে গ্রেপ্তার করে ওপর-মহলকে খুশি করতে হ'ত। এই কারণে গৃহস্থরা অর্থদান না-করলে কিছু দলছুট উপ-গুণ্ডা বাড়ির সামনে বোমা ফাটিয়ে তাদের বিপদে ফেলতো।

বিঃ দ্রঃ—আমি নির্বিচারে লোক-দেখানো গ্রেপ্তারের পক্ষপাতী ছিলাম না। অথচ কর্তৃপক্ষকে পরিসংখ্যা দেখাতে হয় বলে তার প্রয়োজন। তাই ঘটনার পর স্থানীয় নেতাদের বলতাম কিছু তরুণকে নিজেরাই বাছাই করে গ্রেপ্তারের জন্য পাঠিয়ে

দিতে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কারো মা কান্নাকাটি করছে বলে তারাই আসামী বদল করে অন্যকে পাঠিয়েছে।

কিছু নিম্নপদের পুলিশ-কর্মী এই সুযোগে দুষ্টুমী শুরু করে দিলো। উচ্চপদস্থ বিহারী মুস্লিমগণ স্থানীয় বাঙালী-মুস্লিমদের চেহারা দেখে চিনতে পারতেন না। একবার কিছু মারমুখী মুস্লিম-জনতাকে অগ্রসর হ'তে দেখে নিম্নপদের এক হিন্দু-কর্মী উচ্চ-পদস্থ বেহারী মুস্লিম-অফিসারকে বললেন, 'স্যার, টেরিবল হিন্দু-গুণ্ডার দল। মুস্লিম-বস্তিগুলো এখনই ওরা জ্বালিয়ে দেবে।' 'অফিসারটি তাই শুনে 'থ্যাংকস' জানিয়ে সশস্ত্র পাঠান-সিপাহীদের হুকুম দিলেন, 'ফায়ার।' পরে অফিসর-ভদ্র-লোক স্বজাতি নিধন দেখে হতবাক হয়ে যান।

আমার ভগিনী শ্রীমতী প্রণতি ব্যানার্জি, এম-ডি, এম-বি-বি-এস তখন মেডিকেল কলেজে ছাত্রী ও শিক্ষানবীশ। হঠাৎ দাঙ্গা বেধে যাওয়ায় হিন্দু ডাক্তররা বাড়িতে নিজ-নিজ এলকায় আটকা পড়ে যান। কিন্তু মুস্লিম-চিকিৎসকেরা কাছাকাছি থাকায় হাসপাতালে আসতে পেরেছিলেন। তখন রটে যায় যে তাঁদের চিকিৎসার দোষে হাসপাতালে হিন্দু-আহতদের মৃত্যু ঘটেছে। আমার ভগিনী তাই শুনে অন্যদের মতো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। সে রাত্রিবেলা শুধু 'এইচ' অর্থাৎ 'হিন্দু' টিকিট দেখে রোগীদের প্রতি যথাকর্তব্য সম্পাদন করে উপরে ঘুমতে গেল। কিন্তু ঘুমতে না পেরে বিবেকের দংশনে জর্জরিত হয়ে আবার নিচে নেমে 'এম' অর্থাৎ মুস্লিম-রোগীদের প্রতিও যথাকর্তব্য সম্পাদন করে নিশ্চিন্ত হ'ল।

এই মহাবিষ তখন সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফায়ার-ব্রিগেডের মুস্লিম-কর্মীরা এই ব্যাধিকে প্রশ্রয় দেয়। রাইটার্স বিলডিং-এও কর্মীদের মধ্যে এটি ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশের একাংশও এর দ্বারা আক্রান্ত হয়। কিন্তু কলিকাতা-পুলিশের অধিকাংশ কর্মী তখনও অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। কোনও এক মুস্লিম-অফিসারকে মুস্লিম-জনতা 'মারো শালা হিন্দু লোককো' বললে তিনি বন্দুক নিয়ে তেড়ে গিয়ে বলেছিলেন, 'আমি হিন্দু নই। আমি মুস্লিম। কিন্তু এ কাজ করলে আমি তোমাদের জান্ নিয়ে নেব।'

[সিনেমা-শিল্পী কেষ্টবাবুর এক পুত্র আমার সুমুখেই মিলিটারীর গুলিতে নিহত হন। তখনও তাঁর বাম হাতে কেরোসিনের টিন ও ডানহাতে মশাল। মশালের আলোয় সে বিরাট মুস্লিম-গুণ্ডাবাহিনী বিতাড়িত করে ফিরে আসছিল।

এঁদের জন্য তো নয়ই, এমন কি যাঁরা ভিন্ন-সম্প্রদায়ের লোকেদের রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের কথা স্মরণ করেও কোনোখানে শহীদ-বেদী নির্মিত হয় নি। সেদিনের বহু তরুণকে আজ প্রৌঢ় অবস্থায় খণ্ডিত হাত নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখি।

তাঁদের কারোর জন্য সরকারী পেনসনের ব্যবস্থা নেই। অথচ ওরাই একদিন মা-বোনেদের ইজ্জত রক্ষা করেছিল।]

জনৈক উচ্চপদস্থ ইংরাজ-সেক্রেটারি সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন : 'সৌভাগ্য এই-যে এখনও পুলিশ দেখে ওরা পালায়। ওরা পুলিশকে এখনও পর্যন্ত আক্রমণের চিন্তাও করে নি।' এই বিবৃতির ফলে সেদিন থেকেই এক সম্প্রদায়ের অফিসারদের উপর অন্য সম্প্রদায়ের আক্রমণ শুরু হ'ল। প্রথমে একজন হিন্দু-অফিসার ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারালেন। আমার উপরেও চারবার আক্রমণ করে হত্যার চেষ্টা হয়েছিল। মধ্যে মধ্যে শহরে আমার মৃত্যু-সংবাদ ছড়িয়ে পড়তো। জনৈক ব্যক্তি আমাকেই ফোন করে জিজ্ঞাসা করেছিল : 'হ্যাঁ মশাই, একথা সত্যি মিঃ ঘোষাল নাকি মারা গেছেন ?' ওই সময়ে আমাকে রক্ষাকর্তা বুঝে পল্লীতে গেলে শাঁখ বাজানো হ'ত।

আমার জুনিয়র হক সাহেব গাড়ির মধ্যে স্টেনগানের গুলিতে প্রাণ হারালেন। অথচ এ ব্যক্তিটি অসাম্প্রদায়িক তো ছিলেনই এমন-কি মসজিদের আপত্তি সত্বেও নিজের বাড়িতে রেডিও-র গান বন্ধ করেন নি। তাঁরই শবদেহ বহন করে মুস্লিমরা নতুন করে হত্যাকাণ্ড শুরু করলো। প্রতিবাদে একদল জীপ-আরোহী হিন্দু কিছু পাঠান-কনস্টেবলকে স্টেনগান স্প্রে করে রাজপথে হত্যা করে শোধ নিলো। পরবর্তীকালে মন্ত্রী হয়েছেন এমন কজন ব্যক্তি আমাকে বলেছিলেন, 'পঞ্চাননবাবু দেখবেন, আমাদের ওপর যেন হামলা না হয়।' প্রকৃতপক্ষে আমরাই তখন হিন্দু-দের একমাত্র ভরসাস্থল।

[স্বাধীনতার পর মন্ত্রী হেমচন্দ্র নস্কর ও মন্ত্রী কালীপদ মুখোপাধ্যায় নবীন ডেপুটিদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'তোমরা নবাগত ও বয়সে তরুণ। তোমরা জানো না যে সেদিন সত্যেন মুখার্জি ও পঞ্চানন ঘোষাল জীবন ও চাকুরি বিপন্ন করে কিভাবে নাগরিকদের রক্ষা করেছিলেন।' দৈনিক বসুমতী-সম্পাদক বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকালীন মন্ত্রী কিরণশংকরবাবু ও অন্য বহুজনকে বলেছিলেন, 'ওহে, এই একটি লোকের কর্মতৎপরতার জন্য সেবার আমরা বেঁচে গিয়েছিলাম।'—আজকের কলকাতা সেদিনকার কলকাতাকে ভুলে গিয়েছে। তাই আজ আমরাও শহরবাসীর স্মৃতিপথে সহজে আসি না।]

একদিন কিছু মুস্লিম-অফিসার হিন্দু আসামীদের গ্রেপ্তার করে থানায় আনছিলেন। পথে কজন হিন্দু-ছোকরা বোমা ফাটালে তাঁরা বিহ্বল হয়ে গুলি ছুঁড়ে আসামী-দের একজনের মাথাই উড়িয়ে দিলেন।

আর-একদিন অ্যাংলো-সার্জেন্টরা বোমা ও পিস্তল সমেত এক গাড়ি লোককে

গ্রেপ্তার করলেন। হঠাৎ জীপে করে কজন য়ুনিফর্ম-পরা বাঙালী ইনস্পেক্টর এসে সার্জেণ্টদের ডিউটিতে থাকতে বলে আসামী-সমেত ওই গাড়ি নিয়ে থানার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। কিছু পরে সার্জেণ্টরা থানায় এসে বুঝলো যে ওরা অলীক তথা ভুয়া-পুলিশ। অত্যন্ত আপত্তিজনক বিষয় এই-যে আমাকে ও অন্য কয়েক-জন অফিসারকে সন্দেহ করে সনাক্তির জন্য লালবাজারে আসতে বলা হয়। কিন্তু সার্জেণ্টরা কেউই আমাদের সনাক্ত করতে পারে নি।

উভয়-সম্প্রদায়ের নেতাদের মধ্যে কিন্তু সৌহার্দ্য ও খানাপিনা এবং আলোচনায় তখনও ছেদ পড়ে নি। এবার ইংরাজ-প্রভুরা বুঝলেন যে তাঁদের নিজেদের ঘরেই আগুন লেগেছে। তাঁরা পূর্ব প্রশাসন-ব্যবস্থা পুনরায় প্রবর্তন করতে বদ্ধ পরিকর হলেন। লীগ-মন্ত্রীরা পথেই রায়বাহাদুর সত্যেন্দ্র মুখার্জিকে নর্থ-ডিস্ট্রিক্ট ত্যাগ করে এনফোর্সমেণ্ট-এর ডেপুটি পদে ফিরে যেতে হুকুম দিলেন। ইংরাজ পুলিশ-কমিশনার ফোনে গভর্নরকে তা জানালে তিনি বলেন, 'এ হুকুম আমি বাতিল করে দিলাম।'

হীরেন্দ্র সরকার এবং সত্যেন্দ্র মুখার্জির নেতৃত্বে এবার আমরা সন্দেহজনক গুণ্ডাদের বস্তিগুলি খানা-তল্লাসী শুরু করে দিলাম। বস্তির লোক তাতে অবাক হয়ে বলে-ছিল, 'আরে এ ক্যা বাত ? ইয়ে তো হুকুম নেহী থে।' দশ কোটীর উপর মূল্যের অপহৃত দ্রব্য সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। বড়ো-বড়ো সিন্দুক ও আলমারী ভর্তি হীরা জহরত ও সোনা। পরিত্যক্ত বাড়ির বহু দরজা ও জানলা। সেই সাথে উঠান খুঁড়ে পাওয়া গেল মানুষের হাড়গোড় ও মাথার খুলি। সনাক্তির সুবিধার জন্য সেগুলি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে সাজানো হয়েছিল।

গুণ্ডাদের মূল ঘাঁটি কলাবাগান তখনও বিভীষিকা স্বরূপ। জনৈক চিত্রশিল্পী অন্যমনস্কবশত কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট হতে সর্টকাট কলাবাগানের মধ্য দিয়ে সেণ্ট্রাল এভিনিউ-তে এসেছিলেন। গুণ্ডারা তাঁর লম্বা চুল ও ঝলমলে পাজামা দেখে জাতি-নির্ণয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এবারে এলে তাঁকে দেখে আমি বলেছিলাম, 'আরে করেছো কি ? তুমি কলাবাগানের মধ্য দিয়ে দিব্যি চলে এলে !' চিত্র-শিল্পীটি ওটা কলাবাগান শুনে আঁতকে উঠে অজ্ঞান হয়ে যান আর-কি।

এই কলাবাগানের মোড়ে সত্যেন্দ্র মুখার্জির গাড়ি দুই শতাধিক ব্যক্তি আক্রমণ করে তাঁর মাথা ফাটায। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় আমি টহলে এসে পড়ায় ও প্রতি-আক্রমণ করায় তারা পালিয়ে যায়। রায়বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ অপারেশনের পর বহুদিন ভুগে আরোগ্যলাভ করেন।

মুস্লিম-সম্প্রদায় হতে সদ্য-ধর্মান্তরিত দুজন হিন্দুর দৌরাত্ম্যে চিৎপুরের মুস্লিম-

সমাজ বিপন্ন হয়। শুধু হিন্দু নয় হিন্দু-ব্রাহ্মণ হয়ে এরা অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যাকাণ্ড ও অগ্নিদাহ ঘটাতো। ধর্মান্তরিত ব্যক্তিরা কিরূপ ধর্মবিদ্বেষী হয় তা এদের ব্যবহারে বুঝতে পেরেছিলাম। আমি বাধ্য হয়ে এদের গুলি করে জখম করি দুষ্কর্মের সময়। কোনও এক উগ্র হিন্দু উদর-স্ফীতিরোগে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে বিকারগ্রস্ত হয়ে বলেছিল, 'আমি দশটি মুস্লিম ভক্ষণ করেছি। ডাক্তারবাবুকে চারটে বার করে দিতে বলো।'

সাম্প্রদায়িকতা যে কিরূপ ভীষণ মনোরোগ সৃষ্টি করতে পারে আমি তার ওই কথা থেকে বুঝতে পেরেছিলাম।

মহাদাঙ্গার কারণ নিরূপণের জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এনকোয়ারি-কমিশন বসালেন। আমি ওখানে আমার বক্তব্যে প্রমাণ করেছিলাম যে দাঙ্গার প্রথম দিনে ধর্মতলা স্ট্রীটের মুস্লিম দোকানগুলিতে এক বিশেষ চিহ্ন আঁকা থাকাতে দুয়ার ভেঙে লুণ্ঠন করা হয় নি। প্রতিরোধের জন্য কিছু তদারকি-ব্যবস্থা ওই রাস্তায় মোতায়েন করা হয়। সাক্ষ্যদানকালে জনৈক ব্রিটিশ অফিসারও দেবজ্যোতি বর্মনের জেরায় ওই চিহ্ন দেখেছেন বলে স্বীকার করেন। আমার উপর গভর্নমেণ্টের অভিযোগ: অথবা ট্রানস্‌ফারেন্স অফ পপুলেশন এবং দেবজ্যোতি বর্মনকে জেরার জন্য তথ্য সরবরাহ। অন্যদিকে ওঁরা হীরেন্দ্র সরকার ও সত্যেন্দ্র মুখার্জির উপরও বিরক্ত। এনকোয়ারি-কমিশনের সাক্ষ্যে সত্যেনবাবু বলেছিলেন যে অ্যাংলো-কর্মীরা দাঙ্গাকালে ইন্ধন যুগিয়েছে। সরকার-সাহেবের কিছু অপ্রিয় সাক্ষ্যও তাঁদের মনোমত হয় নি।—সরকার-সাহেব দীর্ঘ ছুটিতে ইংলণ্ড চলে গেলেন। সত্যেন্দ্র মুখার্জি আঠারো মাস ছুটির জন্য আবেদন পাঠালেন। আমাকে ময়ূরভঞ্জ রাজপ্রাসাদে মিলিটারীদের লিয়াঁসো অফিসাররূপে সেখানে আটকানো হ'ল। ময়ূরভঞ্জে গুর্খা-রেজিমেণ্টের কর্তা ইংরাজ-কর্নেল আমাকে বলেছিলেন যে একমাত্র গুর্খা-সৈন্যদের বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু সেখান থেকে হঠাৎ আমাকে ডেকে কাশীপুরের ও চিৎপুরের যুগ্ম ইনচার্জ করায় আমি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠি।

দেশ-বিভাগ ও স্বাধীনতা দুটি ঘটনাই যে অত্যাসন্ন তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। হঠাৎ কড়েয়ার য়ুরোপীয় ব্রথেলগুলির নারীদের জাহাজ ভর্তি করে বিলাতে পাঠাচ্ছে দেখে আমি বুঝেছিলাম যে ওদের কোনও কালিমা ওরা এদেশে রেখে যেতে চায় না। ওদিকে ওয়াকিবহাল মুস্লিম সিভিলিয়ান ও রাজনীতিবিদরা পরিবারবর্গকে ঢাকায় পাঠাতে শুরু করেছেন। ব্রিটিশ রাজত্বের কলিকাতা-পুলিশের শেষ প্যারেড ট্রেনিং ইস্কুলের বদলে লালবাজারে অনুষ্ঠিত হয় গভর্নরের উপস্থিতিতে। কিন্তু ওই প্যারেড কম্যাণ্ড করার জন্য কোনও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ

সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁদের অবর্তমানে ওই প্যারেড আমি কম্যাণ্ড করি। হীরেন্দ্র সরকারের স্থলে প্রণব সেন গোয়েন্দা-বিভাগের ডেপুটি হয়ে আসেন। দোহা সাহেবের স্থলে হরিসাধন ঘোষচৌধুরীকে হেড-কোয়ার্টারের ডেপুটি-কমিশনার করা হয়েছিল।

[হরিসাধন ঘোষচৌধুরী পরবর্তীকালে পুলিশ-কমিশনার হয়েছিলেন। ইনি অধীনস্থ কর্মীদের এলাকায় বসবাসকারী রিটায়ার্ড অফিসারদের খোঁজ-খবর নিতে বলতেন, যাতে তাঁরা ভাবেন যে তখনও তাঁরা পুলিশেরই একজন। তাঁদের পরামর্শ ও অভিজ্ঞতা কার্যে প্রযুক্ত করতে বলতেন। তিনি পুলিশ মেডিকেল ইউনিট ও সংযোগ-ব্যবস্থা প্রভৃতি চালু করা সত্বেও সেগুলি দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। প্রণবকুমার সেনও পরবর্তীকালে পুলিশ-কমিশনার হয়েছিলেন। রাজপথের বর্তমান ট্রাফিক-লাইটগুলির তিনিই প্রবর্তক। লালবাজার কণ্ট্রোল-রুম ও ওয়্যারলেসেরও তিনি উন্নতি-বিধান করেন। বর্তমান স্পেশাল কনস্টেবল-প্রথা তিনিই তৈরি করে গেছেন। কিছু সুন্দর ইংরাজি ফ্রেজ তাঁর সৃষ্টি, যথা: লাইফ অফ ভাল্গারিটি, সেন্স অফ ইনসিকিউরিটি ইত্যাদি।]

চিৎপুর থানার যিনি ইনচার্জ তিনি তুটি বস্তি পুড়িয়ে এবং বহুজনকে হত্যা করে পূর্ববঙ্গে পলাতক। আমি ওখানে ঘাঁটি করে যুগ্ম-ইনচার্জ হলাম। সমগ্র থানা-এলাকা গরম। থানায় আমি একা হিন্দু অফিসার। প্রত্যেক জুনিয়র-অফিসর ও শতকরা আশিজন কনস্টেবল মুস্লিম। অ্যাসিসটেণ্ট ও ডেপুটি-কমিশনারও মুস্লিম, তাঁরা ছুটিতে পূর্ববঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জনাব সুরাওয়ার্দি সাহেব।

মিশ্রপল্লী হতে কোনও হিন্দু ভয়ে অন্যত্র চলে গেলে অন্য হিন্দুদ্বারা ওই বাড়িটি দখল হ'ত। এমনি একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে এক উপনেতা সপরিবারে অধিষ্ঠান করেন। তাঁর তুই পুত্র প্রতিরোধ-দলের শ্রেষ্ঠ ওয়ার্কার ছিল।

পুরুষদের অনুপস্থিতিতে ওদের বাড়ি চড়াও হয়ে গুণ্ডাদল এক চতুর্দশী বালিকাকে টেনে রাস্তায় আনে। সংবাদ পাওয়ামাত্র আমি সেখানে উপস্থিত হই এবং একজনকে পদাঘাতে ও অন্যজনকে ঘুষি মেরে মেয়েটিকে বুকের মধ্যে টেনে নিই। গুণ্ডারা আমাকে দেখে পলায়নোদ্যত হলেও শিকার-ত্যাগের বাসনাও ছাড়তে পারে না। আমি অস্ত্র বার করে ফাঁকা-আওয়াজ করায় ওরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করে।—মেয়েটি স্বভাবতই কৃতজ্ঞতাবশত পরবর্তীকালে রাত্রে ও-অঞ্চলে রাউণ্ডে গেলে চা তৈরি করে খেতে অনুরোধ করতো।

এটা লক্ষ্য করে গুণ্ডাদের কেউ বা অন্য কেউ আমার নামে বেনামী পোস্টকার্ড

পাঠায়। তাতে লেখা : 'মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।' একাধিক চিঠি আসে। আমি সেগুলি লালবাজারে পাঠিয়ে দিলে কমিশনার নর্টনজন মন্তব্য লেখেন : 'হু ইজ দিজ ফ্রেণ্ড ?'—একরাত্রে পাবলিক প্রসিকিউটর রায়বাহাদুর রমণী ব্যানার্জির সংবাদে ছুটে গিয়ে দেখি, ওদের টিনের বাড়িটি জ্বলছে আর দুই ব্যক্তি সাংঘাতিক-ভাবে আহত। কিন্তু ওই মেয়েটিকে জীবিত বা মৃত বহু বস্তি তল্লাসী করেও খুঁজে পাই নি। এখনও বক্ষে তার সেই দিনের নিশ্চিন্ত-নির্ভর কোমল স্পর্শটুকু আমি অনুভব করি।

[ঠিক ও-রকম আমি একদা একটি মুস্লিম-বালিকাকে মেছুয়া-এলাকায় হিন্দু-গুণ্ডাদের কবল হতে রক্ষা করি। তাকে কিন্তু নিরাপদে তার আত্মীয়দের বাড়ি পৌঁছে দিতে পেরেছিলাম।]

দুষ্টলোক রটাতে থাকে যে উক্ত ঘটনাবলীর জন্য প্রতিশোধ নিতে অসম্প্রদায়িক হয়েও কিছু গুলিবর্ষণ করি। কিন্তু তার মধ্যে এতটুকু সত্য ছিল না। অন্যায় প্রতিশোধ বা উৎপীড়নের আমি আদৌ পক্ষপাতী নই।

কিছু লীগ-নেতার মুস্লিম-প্রধান পূর্ব-কলিকাতাকে একটি নগর-রাষ্ট্রে পরিণত করার অভিলাষ। মহাদাঙ্গার সময় পূর্ব-কলিকাতার বহুস্থান হতে হিন্দুরা অন্যত্র চলে গিয়েছে। গঙ্গাকূলবর্তী ফ্রেঞ্চ-চন্দননগরের মতো একটা আউটলেট পেতে ওদের চিৎপুর-এলাকাটি প্রয়োজন। এজন্য পরে একটি প্লেবিসাইট করলে সুবিধা হবে। কিন্তু ওদের এই ষড়যন্ত্র আমি ব্যর্থ করে দিই।

আমি সংবাদ পেলাম একটি বিশেষ তারিখে রাত্রি দুটোর সময় ওরা পাইকপাড়া ও রানী রোড অঞ্চল আক্রমণ করে হিন্দু-বাসিন্দাদের বিতাড়িত করবে। রানী রোডের ওপারে বস্তি-এলাকায় লীগের গাড়ি করে বহু বহিরাগত গুণ্ডাদের আমদানি করা হয়েছে। অস্ত্র হিসাবে স্টেনগান ও ব্রেনগান তুলে দেওয়া হয়েছে ওদের হাতে। এ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন পাঠানো সত্ত্বেও তার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। আমি স্থানীয় হিন্দু ও কিছু মুস্লিমদের সাহায্যে প্রতিরোধে প্রস্তুত হয়েছিলাম।

নির্ধারিত দিন ক্ষণে প্রায় চার হাজার বহিরাগত গুণ্ডাদের আক্রমণ শুরু হ'ল। আমার দেহরক্ষীর উদর ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল গুলি। তাকে ধরাধরি করে হাস-পাতালে পাঠিয়ে দিলাম। উভয় মহল্লার মধ্যস্থলে রানী রোড। আমি সকলকে সীমানা হতে পিছিয়ে আনলাম। এই উদ্দেশ্যে যে আমাদের কেউ যাতে আক্রমণ-কারী বলতে না পারে। উপরন্তু দ্রুতগতিতে ইঁট গেঁথে একটা রক্ষা-পাঁচিলও তৈরি করা হ'ল। প্রায় দু-ঘণ্টা ধরে এই যুদ্ধ চলে। প্রথমে দুজন স্থানীয় তরুণ

আহত হয়, একজনের পুরো ডানহাত উড়ে গিয়েছিল। দুজনকেই হাসপাতালে পাঠালাম তৎক্ষণাৎ। ওদের মধ্যে একজন বর্তমানে এ্যাডভোকেট মদন চক্রবর্তী। একজন গুর্খা সিপাই ঘটনাস্থলেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। শুরু হ'ল আমাদের প্রতি-আক্রমণ। ওরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ওরা হত বা আহত সঙ্গীদের ঘটনাস্থলে ফেলে রেখেই পলায়ন শুরু করলো। ওদের পশ্চাদ্ধাবন করে আমি আর মৃতের সংখ্যা বাড়াই নি।

কিন্তু কিছু বহিরাগত তরুণ মানা সত্ত্বেও সীমানা পেরিয়ে বস্তিতে অগ্নিসংযোগ করেছিল। আমি গুলিবর্ষণ করে ওদের বিতাড়িত করে ফায়ার-ব্রিগেড ডেকে আগুন নেবাই। আমি ডানপায়ে আঘাত পাওয়ায় ওদের রুখতে পারি নি। উভয় সম্প্রদায়ের কিছু লোকক গ্রেপ্তারও করা হয়। ওই এক রাত্রির ব্যবস্থায় কলকাতার দাঙ্গা সম্পূর্ণ থেমে গেল।

থানায় ফিরে দেখি সেখানে ইংরাজ পুলিশ-কমিশনার ও ইংরাজ গভর্নর স্বয়ং উপস্থিত। কলিকাতা-পুলিশের কোনও থানায় সেই প্রথম ও সেই শেষ বাংলার লাট সাহেবের আগমন। ওঁরা ঘটনাস্থলও পরিদর্শন করেছিলেন। স্থানীয় মুস্লিম-অধিবাসীরা তাঁদের বলেছিলেন যে আমিই তাদের রক্ষা করেছি। তবু তাঁরা আমাকে ওই স্থানেই সাসপেণ্ড করেছিলেন। আমিই একমাত্র অফিসার যে ওই মহাদাঙ্গার সময় ওঁদের শিকার হয়েছিলাম। আমার বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের আদেশ হয়। হিন্দু-মুস্লিম উভয়-সম্প্রদায় এবং অ্যাংলো দমকল-কর্মীরা আমার পক্ষে সাক্ষী দেয়। আমি অনারেব্‌লি এবং রি-ইনস্টেটিভ হয়েছিলাম। প্রণব সেন, আই-পি সক্রিয়-ভাবে আমার পক্ষ না-নিলে আমার খুব অসুবিধা হ'ত।

তাছাড়া বসুমতী আনন্দবাজার অমৃতবাজার প্রভৃতি বহু পত্র-পত্রিকায় আমার পক্ষে সম্পাদকীয় লেখা হয়। নাগরিকগণ ও মান্যগণ্য ব্যক্তিগণ ইংরাজ-সরকার বরাবর গণ-দরখাস্তও পাঠিয়েছিলেন। আমার পক্ষে শ্লোগান-সহ কয়েকটি মিছিল ও ডেপুটেশনের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে আমার অব্যাহতি-লাভ ত্বরান্বিত হয়।

এই সময়ে বহুবাজারের নিকট সেণ্ট্রাল এভেনিউ-এ এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে। একটি জীপ-গাড়ির মধ্যে দুটি স্টেনগান ও বহু বোমা-সহ দুই ব্যক্তিকে কজন অ্যাংলো সার্জেণ্ট ধরে ফেলে। কিন্তু পথেই দুজন য়ুনিফর্ম-পরা ব্যক্তি থানার ইনচার্জ-অফিসার ও সেকেণ্ড অফিসার-রূপে পরিচয় দেয় এবং বামাল-সমেত আসামীদ্বয়কে-নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তাঁদের ডিউটিতে ফিরে যেতে বলে। ওই সার্জেণ্টরা পরে থানায় এসে জানতে পারে যে ও-রকম কোনো আসামী বা অস্ত্রশস্ত্র কেউ থানায় আনে নি।

পরদিন ইংরাজ-কর্তৃপক্ষ কজন হিন্দু-অফিসারকে লালবাজারে ডেকে পাঠান। আমাকে বিশেষ করে সেখানে আসতে বলা হয়। আমাদের সকলকে সনাক্তকরণের জন্য একে-একে ওই সার্জেণ্টদের সম্মুখে আনা হ'ল। কিন্তু ওরা আমাদের কাউকেই সনাক্ত করতে পারে নি। এই অপমানজনক ব্যবহারে আমরা প্রতিবাদ করে-ছিলাম।

মহাত্মা গান্ধী

গান্ধীজী বেলেঘাটায় এক মুস্লিমের বাগান-বাড়িতে এলেন। তাঁর উপস্থিতির ফলে শহরের পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। গতকাল যারা হানাহানি করেছে আজ তারা গলাগলি করে শান্তি-মিছিলে সামিল। হিন্দু-মুস্লিম আবার ভাই-ভাই হয়ে যায়। (তাহলে—বাংলা দেশ-বিভাগের প্রয়োজন কী ছিল?)

[বিঃ দ্রঃ—গান্ধীজী শীতের রাত্রে এক বারান্দায় নগ্নগাত্রে বসেছিলেন। এক পুলিশ-কর্মী, যার সর্বাঙ্গ মোটা বনাতের ওভারকোট দ্বারা আবৃত, সলজ্জভাবে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, 'বাপুজি, আপনার শীত করছে না।'

গান্ধীজী তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তারপর মৃদু হেসে পাল্টা প্রশ্ন কর-লেন, 'আচ্ছা তোমার নাকটা তো ঢাকা নেই, ওখানে ঠাণ্ডা লাগে না।'

পুলিশ-অফিসার উত্তরে 'অভ্যাস' বলায় তিনিও জানান যে খালি-গায়ে থাকা তাঁর অভ্যাস।]

আমাকে গান্ধীজীর নিকট উপস্থিত করা হয়েছিল। জনাব সুরাওয়ার্দি সাহেব তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি গান্ধীজীকে বলেন যে আমার চিৎপুরের এপি-সোডে খুব একটা দোষ নেই। গান্ধীজী আমাকে মুস্লিমদের সেবা করার উপদেশ দিয়েছিলেন।

[গান্ধীজীর নিহত হওয়ার সংবাদে মুস্লিম দোকানীরা কাঁদতে-কাঁদতে আমাকে বলেছিল, 'বাবুজি, আপলোক-কো তো বহুত নেতা আছে; লেকেন হামলোক-কো ওহী এক-ই নেতা হ্যায়।']

আমি এই সময় কংগ্রেসী-বন্ধুদের ডিপ্লোম্যাটিক হতে বলি। পাকিস্তান হিন্দুস্থান-বহির্ভূত স্বাধীন পশ্চিমবাংলা চাইলে স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য বাংলার অর্ধেকের উপর পাওয়া যেতো। তারপর ভারত-রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যরূপে যুক্ত হ'ত। তাহলে বাস্তু-হারা-রূপ কোনো সমস্যা বাঙালীদের থাকতো না। কিন্তু ওঁরা কেউই বাঙালী-রূপে ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন না।

সৌভাগ্য এই-যে ঠিক সময়ে গান্ধীজী কলকাতায় এসেছিলেন। নইলে, পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গ হয়তো উভয়-পাঞ্জাবের মতো যথাক্রমে মুস্লিম ও হিন্দুশূন্য হ'ত। এতে বাস্তুহারা সমস্যা পাঞ্জাবের মতো অতি সহজে মীমাংসা করা যেত। বাঙালীদের ভিটামাটির প্রতি অনন্য মমতা, তবু তাঁরা অন্য বাঙালীদের মতো স্বাধীন বাংলা দেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত কোনরূপে টিকে থাকলে ভালো হ'ত। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ অফিসারদের অদল-বদল ব্যবস্থা গ্রহণ না-করলে বাংলার হিন্দু মুস্লিমরা স্ব-স্ব স্থানে হয়তো টিকে থাকতেন। হঠাৎ পশ্চিম বাংলা হতে মুস্লিম-পুলিশ এবং পূর্ববাংলা হতে হিন্দু-পুলিশ চলে আসার ফলে জনগণের মনোবল ভেঙে পড়ে। নচেৎ বাঙালী মুস্লিম ও হিন্দু ভিটাত্যাগের এতটুকু চিন্তাও করতো না। তা না-হওয়ায় পশ্চিম বাংলায় একমুখী বাস্তুহারার আগমনে মহাসমস্যার সৃষ্টি হয়। ব্রিটিশরা দেশ-বিভাগের পরও কিছুকাল থাকলে ভালো হ'ত। তাড়াহুড়া করে জীবদ্দশাতেই স্বাধীনতা ও ক্ষমতা-ভোগে লিপ্সু নেতারা এ বিষয়ে এতটুকু দেরি করতে রাজী নন। তাঁরা সম্ভাব্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার বিষয় একটুও চিন্তা করলেন না।

দেশবিভাগজনিত পাঞ্জাবের রক্তক্ষয়ী হাঙ্গামার পর দ্বিমুখী বাস্তুত্যাগ ও নির্বিচার গণহত্যা এবং বাংলার একমুখী উৎপীড়িত বাস্তুহারাদের সম্পর্কে কলকাতার এক জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখা হয় : 'ঈশ্বর ওদেরকে ক্ষমা করো। ওরা জানে না ওরা কি করেছে।'

[আশ্চর্য এই-যে মুস্লিম-নেতারা পাকিস্তানে পাড়ি দেবার কালে মুস্লিম-জনগণের দিকে তাকিয়েও দেখলেন না। বাস্তুত্যাগে অক্ষম মুস্লিম-সমাজ নেতাদের ধোঁকাবাজি বুঝে অবাক হয়ে ভাবে যে এ-সবের প্রয়োজন কি ছিল। নিরাপত্তার অভাব না-থাকায় তারা বাস্তুত্যাগ করে নি।

কিন্তু বিহারী নিম্নপদস্থ মুস্লিম-সিপাহী পূব-পাকিস্তানে চলে গিয়ে পরে মোহভঙ্গ হওয়ায় আবার ফিরে আসে। আমাদের চেষ্টায় তারা কলিকাতা-পুলিশে পুনর্বহাল হয়।

অন্যদিকে যে-সব সিডিউল কাস্ট মেম্বাররা লীগ-গভর্নমেণ্টের বিশিষ্ট সহায়ক-রূপে পার্টিশনের বিকল্প-ব্যবস্থার পরিপন্থী হন তাঁরাও শেষ অবধি পাকিস্তান হতে বিতাড়িত হয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন।]

ওই সময় কলিকাতা-পুলিশের এক মহা-দুঃখবহ দিবস। বহুদিনের বন্ধু মুস্লিম-সহকর্মীরা পূর্ব-পাকিস্তানে চলে গেলেন। সহকর্মীদের নিকট হতে বিদায় নেবার সময়টুকুও তাঁরা পান না। য়ুরোপীয় ও মুস্লিম ঊর্ধ্বতন অফিসররা তখন পোঁটলা-

বেঁধে তৈরি। লালবাজারে আমার কম্যাণ্ডে শেষ পুলিশ-প্যারেড অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় লীগ-মন্ত্রীরা শেষবারের মতো বিষোদ্গার করলেন। গভর্নর কয়েকজন কর্মীকে পদক দিলেন এবং বিগত দিনের স্মৃতি ভুলে যেতে বললেন।

পুলিশ-কমিশনার হার্ডিক-সাহেব নর্টনজনকে চার্জ বুঝিয়ে য়ুরোপে পাড়ি দিলেন। নর্টনজনই কলিকাতা-পুলিশের শেষ কমিশনার। প্রথম ভারতীয় পুলিশ-কমিশনার সুরেন্দ্র চ্যাটার্জিকে চার্জ বুঝিয়ে তিনি পূর্ব-পাকিস্তানে প্রস্থান করেন। তখনও পশ্চিম বাংলায় ছায়ামন্ত্রী তথা আণ্ডার-ট্রেনিং মন্ত্রী ও প্রকৃত মন্ত্রীর দ্বৈত-শাসন অব্যাহত।

লালবাজারে ড্রিলের দিন পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা দিতে আসেন। সেইদিনই ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা-লাভ করেছিল। মুখ্যমন্ত্রী সেদিন উপস্থিত অফি-সারদের বলেন যে পুলিশ হ'ল দৌবারিক, তারা যেন কারো কাছে হাতজোড় না করে। দুয়ার রক্ষার্থে তাকে উচিত-মতো কঠোর হতেই হবে। তাঁর এই বক্তৃতা আমাদের সকলেরই ভালো লাগে। তিনি আরও বলেন যে আনুগত্যহীন অফিসারদের সহ্য করা হবে না।

সদ্যোস্বাধীন দেশের মুখ্যমন্ত্রী অতঃপর ড্রিল হল-এ প্রবেশ করলে অফিসররা তাঁকে সম্মান দিতে দাঁড়াবে কি-দাঁড়াবে না তা ঠিক করতে পারেন না। তাঁরা উঠি-উঠি করেও বসে পড়েন। বহুদিনের পুরানো অভ্যাস ত্যাগ করা কঠিন। ইংরাজ পুলিশ-কমিশনার নর্টনজন তখনও সুরেন্দ্র চ্যাটার্জিকে চার্জ বুঝিয়ে দেন নি। মিঃ নর্টনজন অফিসারদের দোদুল-মনোভাব দেখে নিজেই হাতের ইশারায় মৃদুস্বরে বলে উঠলেন, 'আপ্ (up)।' পরাধীনতা ও স্বাধীনতার সন্ধি-সীমায় দাঁড়িয়ে অফি-সাররা কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তাই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

[সুরেন্দ্র চ্যাটার্জি কলিকাতা-পুলিশের প্রথম ভারতীয় কমিশনার। তিনি পল্লীতে-পল্লীতে হিন্দু-মুস্লিমের যুক্ত মিটিং করে প্রতি জায়গায় নিজে বক্তৃতা দিতেন। আমি এরূপ বহু সভা সংগঠন করে তাঁর কাজে সাহায্য করেছিলাম। সুবক্তা কমিশনার-সাহেব এভাবে হিন্দু-মুস্লিম সম্প্রতি ফিরিয়ে এনেছিলেন। এই তেজস্বী ভদ্রলোক ব্যক্তিত্বে ও কর্ম-দক্ষতায় অনন্য ছিলেন।]

বাংলার প্রশাসন ও পুলিশের ইতিহাস এক ও অবিভাজ্য ছিল। এবার তা দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। এপার বাংলা এপারের এবং ওপার বাংলা ওপারের ইতিহাস পড়বে। তবু পিছন ফিরে তাকালে দেখতে পাবে মূল-ইতিহাস একটাই। আমার মাত্র পনেরো বছরের চাকুরি-জীবনের মধ্যে এক মহা-অঘটন ঘটে গেল সেদিন। সেই কলকাতাকে আজও আমি স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পাই।

বাংলা-বিভাগের পরই বোঝা গেল যে এর জন্য বাঙালী-মাত্রই অনুতপ্ত। সেই মুহূর্তে কোনও নেতা সংযুক্ত বাংলার কথা বললে জনগণ তাঁকে স্বাগত জানাতো। কিন্তু সেইরূপ ব্যক্তিত্বপূর্ণ সাহসী নেতা একমাত্র সুভাষচন্দ্র ছাড়া আর কারই-বা নাম করা যায়। সুভাষচন্দ্র এই সময় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে প্রতিটি সমস্যার পূর্ণ মীমাংসা হ'ত। তাঁর প্রত্যাবর্তন যতই বিলম্বিত হবে এই-সব সমস্যা ততই সুদূরপরাহত হতে বাধ্য। নতুন বংশধরদের পুরনো ঐতিহ্যের প্রতি মমতা বিশেষ থাকবে না। সমগ্র প্রদেশ কেবল কাজী নজরুল এবং নদীর জল-মাছ ও পাখি ছাড়া বিলকুল সব ভাগ হয়ে গেল।

প্রথম প্রথম জনগণ পূর্বের মতো কিছুকাল বিনা পাশপোর্ট ও ভিসায় উভয়বঙ্গে যাতায়াত করছিল। দেশ যে বিভক্ত তা অন্তত সাধারণ বাঙালী কিছুতে বুঝতেই চায় নি। উভয় বঙ্গের পুলিশও পরস্পরকে মদত দিতো এবং পরস্পরের এন-কোয়ারি-স্লিপের উত্তর আদান-প্রদান করতো। এমন-কি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ওপার বাংলার স্কুল-কলেজের পরীক্ষাও গ্রহণ করেছে। এদিক থেকে ওদিকে নোট ও টাকা-পয়সা পাঠানোও হয়। এই ব্যবস্থা আরও কিছুকাল স্থায়ী করা যেতো। কিন্তু শীঘ্রই উভয়-দেশের সরকারী ব্যবস্থাপনায় এই সহজ সংযোগ-সূত্র-গুলি বিচ্ছিন্ন করা হ'ল।

হিন্দু-মুস্লিমের মিলিত শহর কলকাতা আজ অতীতের বস্তু। সিটি অফ প্যালেসের বদলে কলকাতা আজ সিটি অফ হকার্স। শহর-কলকাতাকে যদি আজ জিজ্ঞাসা করা যায়, তুমি কার? তাহলে সে ওপার-বাংলার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বলবে, অন্তত তোমাদের নই।

অঙ্গচ্ছেদের ফলে আমরা যা হারিয়েছি তা আর ফিরে পাওয়া যাবে না। কিন্তু উত্তরাধিকার-সূত্রে আমরা যে মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক তা রক্ষা করা প্রত্যেক বাঙালীর পবিত্র কর্তব্য।

পরিশিষ্ট

দেশ স্বাধীন হলে পুলিশ-কর্মীরা নতুন করে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছিলেন। মহাদাঙ্গার সময় যে শহরকে তাঁরা রক্ষা করেন সেই শহরে পুলিশের মর্যাদা রাখতে তাঁরা তখন ব্যস্ত। এঁদের প্রত্যেকের গঠনমূলক মনোভাব, সততা ও দক্ষতা তুলনাহীন। ইতিমধ্যে তাঁদের প্রভূত স্বদেশ-প্রেম ও ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে।

মুস্লিম ও ইংরাজ-কর্মীরা চলে যাওয়ায় কর্মক্ষেত্রে বিরাট ভ্যাকুয়ামের সৃষ্টি হয়। কলিকাতা-পুলিশকর্মীদের আশা, শহর-রক্ষার পুরস্কার-স্বরূপ ওই-সব শূন্যপদে

তাদের উন্নীত করা হবে। শিক্ষাদীক্ষা ও বংশগরিমায় তাঁরা কেউই কম নন। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল যে পুলিশ-পদগুলিকে শ্রেণীহীন না-করে শ্রেণীযুক্ত করা হ'ল। সর্বভারতীয় সার্ভিসের জন্য (আই. পি. এস্.) তরুণদের ভর্তি করে অভিজ্ঞ প্রবীণদের উপর-ওয়ালা করা হ'ল। একজন ইংরাজ-কর্মীকে যে পদে পৌঁছতে বিশ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়েছে সেই-সব গুরুত্বপূর্ণ পদে মাত্র দুই বৎসর অভিজ্ঞ তরুণদের বসানো হ'ল। এঁদের ঠাট্টা করে বলা হ'ত: 'পার্টিশন প্রোডাক্‌টস্।' ফলে অভিজ্ঞ ব্যক্তির অভাবে পুলিশের দক্ষতা ম্লান হয়। প্রবীণ কর্মীরা তাঁদের দীর্ঘদিনের অর্জিত ব্যক্তিত্ব একটু-একটু করে হারিয়ে এক অদ্ভুত নির্লিপ্ততার শিকার হয়ে যান। আশাভঙ্গ হওয়ায় ওদের কেউ-কেউ আগের মতো আখের গুছাতে মন দেন। পরবর্তীকালে অভূতপূর্ব পুলিশ-স্ট্রাইক তার ফলশ্রুতি। সেই সময় কিছু ডিপার্টমেণ্টাল পোস্ট সৃষ্টি না-হলে বিপর্যয় ঘটতো। প্রমোটেড্ অফিসররা ডিরেক্‌ট রিক্রুট উর্ধ্বতন অপেক্ষা প্রায়শঃ ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করেছেন। তবে সুষ্ঠু প্রশাসনের জন্য কিছু-সংখ্যক তরুণ-উর্ধ্বতনদের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাঁদের ইংরাজ-উর্ধ্বতনদের মতো নম্র অথচ কঠোর এবং ট্যাক্‌টফুল নিশ্চয় হতে হবে।

আমি বহু দুরূহ মামলা তদন্ত করে হাইকোর্টে বারে বারে প্রশংসিত হই। এক অনভিজ্ঞ তরুণ-উর্ধ্বতনকে একটি মামলায় আমাকে অবান্তর উপদেশ দেবার স্পর্ধা দেখে অবাক হয়ে যাই। পুঁথিগত অধীত বিদ্যায় যে শেষ-কথা লেখা নেই তা তারা জানেন না। এতে পুলিশী তদন্তের মানের দ্রুত অবনতি ঘটেছিল। আমার সৌভাগ্য এই-যে আমার পূর্বতন পুলিশী গুরু রায়বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথের বিভাগ থেকে উন্নীত হয়ে পরে ওঁদের মতোই উর্ধ্বতন অফিসার হতে পেরেছিলাম। তাই অপমানের বোঝা আমাকে কিছুমাত্র বইতে হয় নি।

স্বাধীনতার পর প্রকৃত কংগ্রেসীরা খদ্দর ও গান্ধীটুপি পরিত্যাগ করেন। তাঁদের স্থলে হঠাৎ একদল দালাল-শ্রেণীর লোক খদ্দর ও গান্ধীটুপি পরে থানাদের উত্যক্ত করতে থাকে। এই ভুয়া-কংগ্রেসীদের বক্তব্য এই-যে তারা মন্ত্রীদের প্রিয়পাত্র হওয়ায় কর্মীদের উপকার করতে অক্ষম। স্বাধীনতার পূর্বেই আমি অ্যাসিসটেণ্ট কমিশনার হয়েছি। এই দলটিকে আমার অধীন-থানাগুলি থেকে উৎখাত করতে বেগ পেতে হয়েছিল। বহু মন্ত্রী দীর্ঘকাল জেল খাটায় জনগণকে ঠিকমতো চিন-তেন না। উপরন্তু স্বাধীনতা-উত্তর জনগণের রূপ ছিল ভিন্ন। তাই এই সব-দালাল ভুয়া-জননেতার দাবী মন্ত্রীদেরও বিভ্রান্ত করতো। কিছু উর্ধ্বতন-কর্মীরাও এদের প্রকৃত-নেতাভ্রমে খুশি করতে অধীনস্থ কর্মীদের হুকুম দিতেন।

মহাদাঙ্গার সময় কোনও শান্তিসেনা না-থাকলেও দাঙ্গাশেষে হঠাৎ বহু পল্লীতে শান্তিসেনা সংগঠিত হয়েছিল। সৎলোকের সংখ্যা সর্বদেশে কম। জনসংখ্যা বেশি হলে মন্দলোক আসবেই। তাছাড়া, নবগঠিত শান্তিসেনার প্রত্যেকে ট্রেনিংহীন অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি। শ্রীপ্রণব সেন প্রতি থানায় অনুরূপ একটি ছোট সংস্থা গড়ে নাম-রেজিস্টারের অজুহাতে ওদের হাটিয়ে একটি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করেছিলেন। এইরূপ ট্যাক্‌ট তথা কায়দার জন্য তিনি প্রখ্যাত ছিলেন।

বিঃ দ্রঃ—স্বাধীনতার পর আমার অধীন থানাগুলিতে আমি সম্পূর্ণ বাংলা ভাষার মাধ্যমে কাজকর্মের প্রবর্তন করেছিলাম। প্রয়োজনীয় পরিভাষা তৈরি করে কর্মীদের লিখন-ব্যাপারে শিক্ষা দিই। এমন-কি ডিসট্রিক্ট প্যারেডে বাংলা-ভাষায় কম্যাণ্ডেরও প্রচলন করি। যেমন: অ্যাটেনশন = প্রস্তুত, স্ট্যাণ্ড অ্যাট ইজ = আরাম, রাইট টার্ণ = ডানে ফ্রো, লেফট হুইল = বামে বৃত ইত্যাদি। কিন্তু আদালতের ভাষা ইংরাজি এই ওজুহাতে কর্তৃপক্ষ পরে তা বন্ধ করে দেন।

যুদ্ধ ও দাঙ্গা থামার আগেই, পরে কি করা হবে তার পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল—অথচ দেশবিভাগের মতো এত বড়ো ঘটনার-পরে কি ঘটতে পারে কেউ তার পরিকল্পনা রচনা করলেন না। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বোঝা উচিত ছিল এ-বিষয়ে প্রস্তুত না-হয়ে দেশ-বিভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করা যায় না। তারই ফলস্বরূপ পার্টি-শনের পর হাজার-হাজার ব্যক্তি উৎপীড়িত হয়ে দেশত্যাগে বাধ্য হ'ল। তখনই, এই একমুখী বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের জন্য কিছু জমি হুকুম-দখল না-করায় এদেরকে বরং জমি-দখলে উৎসাহিত করে স্থানীয় লোকেদের মনে বিরূপতা এবং এদের মনে অপরাধপ্রবণতার বীজ বপন করা হ'ল। স্থানীয় ব্যক্তিদের ওদের প্রতি পূর্ব-সহানুভূতি হারানোর ফল শুভ হয় নি। অথচ বাস্তুহারারাও খুশি নয়। ফলে উভয়-শ্রেণীর জনগণ ধীরে-ধীরে সরকার-বিরোধী হতে থাকে। কিছু রাজ-নীতিবিদেরা এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিল। কংগ্রেসকে গদী হতে হটাবার জন্য হাঙ্গামার সৃষ্টি করা ওদের পক্ষে সহজ হয়।

[কিন্তু—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে গেলে রাজনৈতিক দাঙ্গা বন্ধ হয়ে যায়। স্বাধীনতার পর জনৈক বাঙালী শিখের হত্যা-উপলক্ষে স্থানীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আমি নিমেষে দমন করেছিলাম। নাড়ীর টান এমনই যে এ-বঙ্গে কিছু ঘটলে ও-বঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া হবেই। ১৯৫২ খ্রীঃ বরিশালে ও পূর্ববঙ্গের অন্যত্র হিন্দু-নিধন শুরু হয়েছিল। বহু হিন্দুনারী অপহৃতা হন। পূর্ববঙ্গ থেকে আসা শূন্য ট্রেনগুলিতে শুধু ভাঙা কাচের চুড়ি ও রক্তের দাগ। আমার একদা-অনুগত পূর্ববঙ্গের পূর্বতন কলিকাতা-পুলিশের কর্মীদের পত্র লিখে আমি বিভিন্ন এলাকার বহু পরিবার ও

অপহৃতা কন্যাদের উদ্ধারে সাহায্য করেছিলাম। এদিকে তার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ মধ্য-কলকাতা অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে আমি ও সত্যেন্দ্রবাবু তা কঠোরহস্তে দমন করে স্থানীয় মুস্লিমদের রক্ষা করেছিলাম।]

এর মধ্যে মুল্লুকী আইনে অন্য প্রদেশে-বাঙালীদের চাকুরি বন্ধ। গভর্নমেণ্টে সাম্প্রদায়িক নিয়োগ হলেও, কলকাতার-ইংরাজ-সওদাগরী অফিসগুলিতে বাঙালী মাত্রেই চাকুরি হ'ত। কেউ মারা গেলে ওরা গ্রামে লোক পাঠিয়ে তার পুত্র বা স্বজনকে ডেকে এনে চাকুরি দিতেন। কলকাতার ব্যবসায়ী-সম্প্রদায় বিদেশী কোম্পানীগুলি ক্রয় করায় এখানেও বাঙালীদের চাকুরি বন্ধ হ'ল। এদিকে মহিলারাও তরুণদের অবশিষ্ট চাকুরিতে ভাগ বসাতে শুরু করেছেন। বহিরাগত কর্মীরা নিজদেশের খাদ্যের চাপ কমিয়ে এই প্রদেশে খাদ্য ভাগ নেওয়ায় এবং মনি-অর্ডারে মুল্লুকে প্রতি-সপ্তাহে অর্থ পাঠানোয় এখানে খাদ্য ও অর্থের যথেষ্ট অভাব হ'ল।

ফলে এক বিরাট খাদ্য ও অর্থহীন বাঙালী বেকার চমূ বিরোধী-রাজনীতিবিদের অফুরন্ত রিক্রুটিং গ্রাউণ্ড তৈরি করেছিল। তৎসহ ছিনতাই ও অন্যান্য অপরাধ-কর্মও এরা বৃত্তিরূপে গ্রহণ করে। এদের মধ্যে মাত্র দুই বা চারজন বেপরোয়া তরুণই সমাজ-ব্যবস্থা বিপন্ন করে তোলে। এতে রাজনৈতিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রয়াসীদের যথেষ্ট সুবিধা হয়। কোনো বেকার-যুবক কৃষিকাজ কিংবা ছোট শিল্প বা দোকান করলে তার ফসল বা দ্রব্যগুলি অন্য বেকার-যুবকেরা লুঠ করতো। এই ছোট্ট দেশে সমগ্র ভারতের লোকেদের চাকুরি ও ব্যবসাস্থল কোনোমতেই সংকুলান-সাধ্য নয়। অথচ স্থানীয় তরুণদের জন্য কোনও রক্ষাকবচের বা অগ্রাধিকারের ব্যবস্থা নেই।

[বাঙালীর ব্যবসা সাম্প্রতিক ঘেরাও-নীতির ফলে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কোনও এক মাড়োয়ারী শিল্পপতি আমাকে বলেছিল : 'সাময়িক অসুবিধা সত্ত্বেও এতে আমাদের যথেষ্ট লাভ হয়েছে। বহু ছোট ছোট বাঙালী ব্যবসায়ী একত্রে আমাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় উদ্যোগী হচ্ছিল। আমরা অর্থের জোরে টিকে গিয়েছি, কিন্তু ঘেরাও ও কারবার বন্ধের ফলে এখন আমাদের আর কোনো প্রতিযোগী নেই।'

এইরূপ এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে জল-সিঞ্চনের ব্যবস্থা না-করে আমরা ওদের দমনে ব্যাপৃত হলাম। আমরা কেউ বুঝলাম না যে অন্য কোনো কাজ না-থাকায় ওরা বিক্ষোভে ও মিছিলে যোগদান করতে বাধ্য হয়। আমি আমার কংগ্রেসী বন্ধুদের বলেছিলাম যে আপাতত পথ-ঘাট তৈরি বন্ধ রেখে ওই টাকায় ওদের

জন্য ফ্যাক্টরি ও ব্যবসার ক্ষেত্র তৈরি করো, ওরা জল-কাদা ভেঙে অফিস-কাছারী না-করলে ক্ষতি নেই।

এই-সব আন্দোলন মধ্যে-মধ্যে ভীষণ আকার ধারণ করতো। পলায়ন-বিশারদরা শাস্ত্রবাক্য অনুসরণ করে আত্মরক্ষা করলে, পুলিশের প্রতি-আক্রমণে নিরীহ পথচারী বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতো। ফলে সরকার-বিরোধীদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যায়। এজন্য আমি ঠিক-ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে অধীনদের উৎসাহিত করি।

ট্রাম ও বাস পোড়ানো দুষ্কর্ম বন্ধের জন্য ট্রাম ও বাসের মধ্যে সশস্ত্র ছদ্মবেশী পুলিশ থাকতো। কেউ দুষ্কর্ম করতে আসামাত্র ওঁরা ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। দুষ্কৃতকারীদের মধ্য হতে গুপ্তচর সংগ্রহ করে ক্ষেত্রবিশেষে আমরা প্রকৃত-অপরাধীদের গ্রেপ্তার করেছি। ওদের গোপন-সভায় ছদ্মবেশী পুলিশ পাঠিয়ে নাটের গুরু ও তার চেলাদের আমরা গ্রেপ্তার করতাম।

একবার লক্ষ্য করলাম রাত্রিকালে সাংবাদিকদের গাড়ি দেখলে গলি থেকে বেরিয়ে ওরা গাড়ি থামায় ও নিজেদের বক্তব্য রাখে। সাংবাদিকরা সেইমতো পুলিশ-বিরোধী রিপোর্ট পত্রিকাতে বাহির করেন। আমি সাংবাদিকদের সঙ্গে বিরোধের পক্ষপাতী না থাকায় অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলাম। অন্ধকারে একটি সাদা-জীপগাড়িতে 'রিপোর্টার' লিখে ওদের ঘাঁটিতে গেলে ওরা পূর্বের মতো ছুটে আসে এবং বোমা-সহ ওদের আমরা গ্রেপ্তার করি। পরদিন রাত্রে প্রকৃত-সাংবাদিকরা ওখানে গেলে ওরা তাদের পুলিশ মনে করে যথেচ্ছ পিটোয়। প্রভাতী পত্রিকার সাংবাদিকরা ওই গুণ্ডাদের দমন না-করার জন্য উলটো অভিযোগ করেন।

একবার বহুবাজার স্ট্রীটের দুপাশে দুটি বাড়ি দখল করে কিছু লোক বোমা-বর্ষণে পথ-চলা অসম্ভব করে তোলে। আমরা বোমা-বর্ষণের মধ্যেই ছুটে গিয়ে ওদের বার করে আনার সময় বোমার স্পিলিণ্টার আমাদের শরীরে ঢুকে যায়। আমি রক্তাপ্লুত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হই এবং অজ্ঞান করে দুবার অস্ত্রোপচার করে। তা সত্বেও কিছু স্পিলিণ্টার শরীরের ভিতরে রয়ে যায়! আমার কানটি সেলাই করে আগের মতো করা হয়।

স্বর্গত ডঃ বিধানচন্দ্র রায় আমাকে দেখতে এলেন রাজ্যপালকে সঙ্গে নিয়ে। তিনি আমাকে সাহস দিয়ে বলেছিলেন, 'আরে, তোমাকে তো কেউ দুকান-কাটা বলবে না!' জনৈক ডাক্তার বাকী স্পিলিণ্টারগুলি বার করবার জন্য পুনর্বার অস্ত্রোপচারের কথা বললে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'পরের দেহে সবাই ছুরি চালাতে চায়। এর কোনও প্রয়োজনই নেই।' তারপর তিনি সস্নেহে বলেন, 'তুমি তো

লৌহ-মানব হে। এতো বড়ো শরীরে একটু স্পিলিন্টার থাকলে ক্ষতি নেই। ছত্রপতি শিবাজী, রাণা প্রতাপ ও মহারাজ রণজিৎ সিংহের শরীরে এমন কতো গোলা-গুলির টুকরো ছিল। কই তাঁদের কাজে-কর্মে তো কোনো ক্ষতি হয় নি। ওহে, তুমি জলদি উঠে পড়ো, কাজ-কর্ম আরম্ভ করে দাও।' আমাকে ভড়কে যেতে দেখে তিনি বুঝিয়ে বলেন, 'বাড়িতে অবাঞ্ছিত কেউ ঢুকে পড়লে তোমরা কি করো ?—সবাই মিলে ঘিরে ধরো তো। সেই রকম মানুষের শরীরে অবাঞ্ছিত কিছু প্রবেশ করলে চতুর্দিকের সেল (Cell)-গুলি তাকে ঘিরে ধরে শক্ত হয়ে যায়। তারপর ক্রমে ক্রমে অবাঞ্ছিত বস্তু গ'লে রক্তের সঙ্গে মিশে শরীরের মধ্যেই লীন হয়।'
[কখনও খুনে-গুণ্ডা ধরতে গিয়ে, কোনোদিন দাঙ্গা থামাতে, কখনও-বা রাজনৈতিক হাঙ্গামা থামাতে গিয়ে আমি বহুবার আহত হয়েছি। আমার অভিজ্ঞতা এই-যে সামান্য আঘাতে ব্যথা পেলেও, বড়ো আঘাতে শক-এর দরুন ব্যথা কম হয়। আমার আঘাত-প্রাপ্ত ঘটনাগুলি আর উল্লেখ করলাম না।]

আমি ক্রিমিন্যাল সাইকোলজি বিষয়ে গবেষণা করে বহুদূর এগিয়েছিলাম। এ বিষয়ে দুটি পুরনো থিওরী বাতিল করে নতুন থিওরী রচনা করি। সেগুলি একাধিক বিজ্ঞানী স্বীকার করেছেন। এ সম্পর্কে পিওর-লাইন ক্রিমিন্যাল হেরিডিটি গবেষণার জন্য আমি ছুটি নিয়ে আন্দামানে কিছুদিন ছিলাম। সেখানে পিতা-মাতা উভয়-পক্ষই অপরাধী এমন কেস পাওয়ায় ওই বিষয়ে গবেষণার কাজে সুবিধা হয়। আমি ফিরে এসে আন্দামানে বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের সুবিধার কথা রায়বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জিকে বলি। তিনি নিজে তারপর আন্দামান ঘুরে এসে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে বুঝিয়ে বলেন। কিছুদিন পরে কাগজে দেখলাম যে আন্দামানে বাস্তুহারাদের পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে। গবেষণার জন্য দ্বিতীয়বার ওখানে গিয়ে বাস্তুহারাদের বসবাসে উৎসাহিত করে এসেছিলাম। আমি ও সত্যেন্দ্রবাবু ওদের বসবাসের ব্যাপারে কিছু অসুবিধার কথা ডঃ রায়কে জানালে তিনি তার বিহিত করেছিলেন।

এ সময়ে শিল্পক্ষেত্রেও অশান্তির সৃষ্টি করা হয়। বিখ্যাত জোসেফ কোম্পানি এবং অন্য-এক কোম্পানির ইংরাজ ও দেশীয় ম্যানেজারদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। আমি মধ্য-কলকাতার এক কারখানায় খণ্ডযুদ্ধ করে আহত হলেও, অসহায় ম্যানেজারকে ফারনেস-এ ঢোকাবার পূর্বে উদ্ধার করতে সক্ষম হই। প্রতিটি ধর্মঘট ভাঙার পর আমি সেই-সব কারখানায় স্থানীয় বেকারদের চাকুরির ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু ওদের কেউ-কেউ অনুগত না-থেকে চাকুরিক্ষেত্রে উৎপাত শুরু করে দেয়।

কলকাতা কর্পোরেশনের সামগ্রিক ধর্মঘটের কালে আমি মধ্য-কলকাতায় পুলিশ ও জনগণকে সমবেত করে থানা-ভিত্তিক বিকেন্দ্রিক পৌর-কর্মের ব্যবস্থা করি। কর্পোরেশনের কিছু ময়লা-ফেলা লরী প্রতি-থানায় রেখে ময়লা সাফ করাই। উপরন্তু, ওদের কাছ থেকে চাবি সংগ্রহ করে প্রতি রাত্রে বিভিন্ন পথের বাতি জ্বালাতে সক্ষম হই।

কিছু উর্ধ্বতন-কর্মীর সৎ-ব্যবহার বারে বারে আমার মনে পড়ে। হঠাৎ একদিন আমার ৩১ নং জীপগাড়িটির বদলে অন্য একটি গাড়ি আমাকে দেওয়া হ'ল। ৩১ নং জীপগাড়িটি বোমার আঘাতে বিক্ষত-শরীর হলেও আমি বহুবার ওতে চড়ে নিরাপদে দূরে চলে এসেছি। এই সেন্টিমেন্টের কথা বলে হেড কোয়ার্টারস-এ ডেপুটি রঞ্জিৎ গুপ্তের নিকট আর্জি পেশ করে ওটা ফেরত চাইলাম। উনি আর্জি প্রত্যাখ্যান করে বললেন যে মানুষের মতো কোনো বস্তুও অপরিহার্য নয়। কিন্তু রাত্রি দশটার সময় তিনিই আবার ফোন করে বললেন যে আমি ওটা ফেরত পেতে পারি।

সাউথের ডেপুটি কমিশনার চন্দ্রশেখর বর্মন হল্লা-ডিউটির শেষে সারাক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজে প্রতিটি সিপাহীকে ট্রাকে তুলে দিয়ে তবে নিজের গাড়িতে উঠে বাড়ি ফিরে ছিলেন, মনে পড়ে।

পুলিশ-কমিশনার উপানন্দ মুখার্জি তাঁর ডেপুটি-কমিশনারদের কাছে একবার বলেছিলেন, 'অধীনস্থ কর্মীদের প্রতি বিরূপতা দেখানো তোমাদের পক্ষে সামান্য ব্যাপার হলেও ওদের পক্ষে যথেষ্ট উৎকণ্ঠা ও ক্ষতির কারণ হয়। ওদের প্রতি অকারণে রূঢ় হলে সমগ্র বাহিনী বানচাল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।'

পুলিশ-কমিশনার হরিসাধন চৌধুরী তাঁর ডেপুটিদের প্রায়ই বলতেন যে অধীনস্থ কর্মীদের পারিবারিক অসুবিধা ও অসুখ-বিসুখের ক্ষেত্রে ওদের সাহায্য করবে।

রায়বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জির মতে সাধারণ সিপাহীদের কাছেও পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।

ডেপুটি-কমিশনার খোন্দকার হোসেন রেজা অতিথিদের খাওয়ানোর পর নিজে মুস্লিম সিপাহীদের সঙ্গে একত্রে ভোজনে বসতেন।

কমিশনার সুরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি তাঁর ডেপুটিদের বলেছিলেন, 'আমার কাছে তোমরা যে রকম ব্যবহার প্রত্যাশা করো, তোমাদের অধীনস্থ কর্মীদের প্রতি সেই রকম ব্যবহার করবে।'

আমি থানা-বিভাগ থেকে বদলি হয়ে তারপর এনফোর্সমেন্ট তথা আরোপক বিভাগে এলাম। ব্রিটিশ শাসনে দ্বিতীয় যুদ্ধকালে এই বিভাগ সৃষ্টি হয়। তখন সিভিল

সাপ্লাই থেকে আসা নতুন রিক্রুট দ্বারা ভর্তি অফিসারদের প্রশিক্ষণের ভার আমি নিই। এতদিন পরে উচ্চপদী হয়ে এই বিভাগে যোগ দিলাম।

এইখানে আমি ভেজাল-নিবারণে ও মুনাফা রোধে কিছু ব্যবসায়ীর কাছে বিভীষিকাস্বরূপ হয়েছিলাম। কিছু ব্যবসায়ী নির্লজ্জের মতো সরকারকে ভেজাল দেওয়ার পরিমাপ বেঁধে দিতে অনুরোধ করে এবং আমাকে লক্ষ লক্ষ মুদ্রার বৃথা প্রলোভন দেখায়। আমি বহুদ্রব্যের কৃত্রিম ঘাটতি প্রমাণ করার ফলে কয়েকবার কণ্ট্রোল বাতিল করা হয়। আমরা নিজেরাই অফিসে ভেজাল নিরূপণের যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করি। বহুস্থানে প্রদর্শনী খুলে জনগণকে ভেজাল ঔষধ ও পণ্যদ্রব্য চিনতে সাহায্য করি। এই সময় আমাদের সাহায্যে শহরে জনসংযোগেরও ব্যবস্থা করা হয়। শহরের মেসেজ হোম ও নাইট ক্লাবগুলি বন্ধেরও আমরা পথপ্রদর্শক হয়েছিলাম। (টালিগঞ্জ মেডিকেল ইউনিটেরও আমি তখন সেক্রেটারি।)

ভারত-সরকারের অধীন কলকাতার ডিটেকটিভ ট্রেনিং কলেজে আমার সংগৃহীত দুইশত প্রদর্শনী-দ্রব্য সহ ক্রাইম-মিউজিয়মটি স্থাপন করা হয়। আমারই পরিকল্পিত স্ট্যাণ্ড তৈরি করে সাজানোর কায়দায় সেটি বেশ শিক্ষাপ্রদ হয়েছিল। ক্রিমিন্যাল সাইকোলজি, অ্যাপ্লায়েড ক্রিমিনোলজি, ফরেনসিক সায়ান্স, কমার্শিয়াল ক্রাইম এবং নিষিদ্ধ পণ্য, ভেজাল ও আবগারী বিভাগসমূহে ওগুলি বিভক্ত করা হয়। প্রাচ্য, পাশ্চাত্য এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অপরাধীদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সমূহের একটি কমপারেটিভ স্টাডির ব্যবস্থা আমি ওখানে করেছিলাম। তাছাড়া, ব্যারাকপুর ট্রেনিং কলেজ এবং মাউণ্ট আবু কেন্দ্রিয় পুলিশ-ট্রেনিং কলেজের মিউজিয়মে বহু মডেল, চার্ট ও যন্ত্রপাতি আধার-সহ আমি দান করি।

উপরোক্ত তিনটি সংস্থাতেই বহুবার মধ্যে মধ্যে অধ্যাপনার কাজও আমাকে করতে হয়। পাবলিক সার্ভিস-কমিশনও কয়েকবার আমাকে পেপার-সেটার ও পরীক্ষকরূপে নিয়োগ করে। এই সময় সরকারের অনুমতি নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজি বিভাগে কয়েকটি পর্যায়ে বক্তৃতা দিই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আমার অধীনে কিছুকাল গবেষণাও করে। শিবপুর কলেজ থেকে এনভারবমেণ্টাল ইঞ্জিনীয়ারিং গবেষণার জন্যও আমার কাছে ছাত্র পাঠানো হয়। বহুস্থানে গভর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে পাবলিক প্রদর্শনী করা হলে আমার সংগৃহীত দ্রব্য ও মডেলাদি সংবাদপত্র ও জনগণ কর্তৃক বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়।

সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা রাইফেল-ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্যের মধ্যে আমি ও সত্যেন্দ্র মুখার্জি অন্যতম ছিলাম।

আমি কলিকাতা-পুলিশের স্পেশাল-ব্রাঞ্চের ডেপুটি পুলিশ-কমিশনার (আই. পি. এস.) হয়ে এলাম। তার পরদিনই খবর পেলাম যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে ক্রিমিন্যাল সাইকোলজিতে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করেছেন। আমি দীর্ঘকাল নীরবে গবেষণা করে গোপনে থিসিস সাবমিট করেছিলাম।

কিছুকাল পরে এনফোর্সমেণ্ট ও অ্যান্টিরাউডির ডেপুটি-কমিশনার পদে আমি বহাল হলাম। ততদিনে শহরের উঠতি-গুণ্ডা ও মস্তানদের উপদ্রব বন্ধ করে দিয়েছি। পরে ই. বি. (হোম) অ্যান্টিকরাপশনের স্পেশাল-অফিসার হয়েছিলাম। উল্লেখ্য এই-যে গভর্নমেণ্ট আমাকে প্রথম কলিকাতা সহ চব্বিশ পরগণা, হাওড়াও হুগলী জেলাতেও জুরিসডিকশন প্রদান করেন। বহু উচ্চপদী ও নিম্নপদী কর্মীর উৎকোচ-গ্রহণ বন্ধ করেও যোগ্যতা দেখিয়েছিলাম। কিছুকাল পরে অলক্ষ্যে আমি অবসর-গ্রহণ করে জনগণের সঙ্গে মিশে গেলাম। কেউ জানতেও পারলো না যে কলিকাতা-পুলিশে আমি আর নেই।

কিন্তু যাকে বলে অলস জীবন-যাপন তা আমার দ্বারা সম্ভরপর হয় নি। অবসর-গ্রহণের পরেও অনেক বড়ো-বড়ো মিল, ফ্যাকটরি ও কোম্পানিতে জেনারেল-ম্যানেজার বা অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল থেকে সুনাম অর্জন করেছি। প্রকৃতপক্ষে আমি ইউনিফর্মড ডিউটির পক্ষপাতী।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, টাটা স্টাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ইণ্ডিয়ান ল' ইনস্টিটিউট, কলিকাতা ডেফ এণ্ড ডাম্ফ স্কুলের সর্বভারতীয় ট্রেনিং সেণ্টার, মাউণ্ট আবুর কেন্দ্রীয় পুলিশ ও ব্যারাকপুর ট্রেনিং কলেজে আমি ভিজিটিং লেকচারার-এর কাজ করেছি। অল-ইণ্ডিয়া ইনডাসট্রিয়াল সাইকোলজিস্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হই। গভর্নমেণ্ট আমাকে স্থানীয় 'জাস্টিস অফ পীস'ও করেছিলেন। হাওড়া হনুমান হাসপাতালের একজিকিউটিভ মেম্বাররূপে ওখানে মনোরোগের একটি কেন্দ্র স্থাপন করেছিলাম।

সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও আমার কিছু অবদান আছে। আট খণ্ড অপরাধ-বিজ্ঞান, এক-এক খণ্ড হিন্দু প্রাণীবিজ্ঞান ও শ্রমিক-বিজ্ঞান, কিশোর-অপরাধী, পুলিশ-কাহিনী (প্রথম খণ্ড) এবং চল্লিশটি উপন্যাস ও রম্যরচনা ইত্যাদি যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছে।

বর্তমানে একটি জেনারেল কলেজ ও এগ্রিকালচারাল স্কুল এবং বেকারদের জন্য কিছু শিল্প-কেন্দ্র স্থাপনের চেষ্টা করছি। এজন্য আরও কয় বৎসর জীবিত থাকা আমার প্রয়োজন।

[আমি পূর্বে সরকারের নিকট হতে পারমিট গ্রহণ করে একটি টেপ-লুম্ কার-

খানা স্থাপন করে পঞ্চাশ জন বেকারের অন্নসংস্থান করেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সম্প্রতিক মার-দাঙ্গাকালে বিবিধ উৎপীড়নে সেটি বন্ধ হয়ে যায়।
তবু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত-সম্প্রদায় দ্বারা কৃষি-ব্যবস্থাটি এখনও চালু রয়ে গেছে। এখানে উচ্চবর্ণের তরুণেরাও কৃষিকাজ ও পশুপালন করে থাকে।]

প্রত্যেক মানুষ বেশি উঁচুতে উঠলে সমাজের ক্ষতিসাধন হয়। তাতে মূল সমাজ-বন্ধন হতে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আমার জীবনের লক্ষ্যস্থল ছিল খুব উঁচুও নয় খুব নিচুও নয়। তাই জীবনের সীমিত ক্ষেত্রে আমি সফল হয়েছি বলে মনে করি।

পরবর্তী প্রকাশন

বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু